বিষয় সূচী

কুপন

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

নাম—

ঠিকানা ....

....

তারিখ— বয়স—

প্রতিযোগিতার বিবরণ ধাঁধাঁর নিম্নে দেখুন।

মুকুলের নিবেদন।

১। 'মুকুলের' অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র দেড়টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা মাত্র; কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া সম্ভবপর নহে, আশা করি কেহ উহার জন্য আমাদের অনুরোধ করিবেন না। দশ পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা পাঠানো হয়।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে 'মুকুল' বাহির হইবে। গ্রাহকগণ কোন মাসের কাগজ যথাসময়ে না পাইলে, ডাকঘরে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না। প্রত্যেক পত্রিকার মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে, তাহাই গ্রাহক নম্বর। রিপ্লাইকার্ড কিংবা ডাকটিকিট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাংলা মাসের ২৫শে তারিখের ভিতর কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইবেন।

৪। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে। শ্রাবণ মাস হইতে 'মুকুলের' বর্ষারম্ভ।

৫। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া সম্পাদকের নামে ও টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে 'মুকুল কার্য্যালয়' ৩৮।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি লেখক লেখিকাদের ফেরত দেওয়া হয় ও মনোনীত হইলে তাহা ও জানানো হয়। উত্তর সহ ধাঁধাঁ না পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। ধাঁধার উত্তর বাংলা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌছানো চাই, যাঁহারা ঠিক্ উত্তর দিবেন তাঁহাদের নাম পরবর্ত্তী সংখ্যায় বাহির হইবে।

বিষয় সূচী

মুকুলের নিবেদন

১। ছেলেমেয়েদের প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে; মুকুল ছেলেমেয়েদের কাগজ, তাহাদের উৎসাহ দেওয়া মুকুলের বিশেষত্ব।

২। বাঙলা দেশের কথা ছাড়িয়া দিন,———সারা ভারতবর্ষে এত সুলভে এরূপ সুন্দর কাগজ, এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্রসহ এবং এরূপ প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী লেখকগণের প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ ছেলেমেয়েদের কাগজ বাহির হয় নাই।

৩। মুকুলের বিজ্ঞাপনের হার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পত্রিকার বিজ্ঞাপনের তুলনায় অতি সুলভ। ছয়মাস বা এক বৎসরের চুক্তিতে বিজ্ঞাপন দিলে, দর স্বতন্ত্র; কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে পত্রদ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে, পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সে সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। মফঃস্বল ও সহরের সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশনের বন্দোবস্ত হইয়াছে; কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিয়া জানিতে হইবে।

"মুকুল" কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীআদিত্যকুমার গুপ্ত।
৫৮।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

বিষয়-সূচী

মুকুলের নিবেদন।

১। "মুকুলের" সডাক বার্ষিক ১৷৷০, যাণ্মাসিক ৸৵০ প্রতি সংখ্যা দুই আনা। দশ পয়সার ডাক টিকিট পাঠালে একখানি নমুনা দেওয়া হয়। শ্রাবণ হইতে বর্ষারম্ভ। যে কোন সময়ে গ্রাহক হলেও পত্রিকা প্রথম থেকে নিতে হবে।

২। টাকা কড়ি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে ও গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ডাক টিকিট দিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হবে ও মনোনীত হলে জানানো হবে।

৩। প্রতি মাসে মুকুল মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। চিঠি পত্রের সঙ্গে ডাক টিকিট না থাকলে আমরা কোন চিঠির জবাব দিতে পারবো না।

৪। মুকুলের **বিজ্ঞাপনের হার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পত্রিকার বিজ্ঞাপনের তুলনায় অতি সুলভ।** ছয়মাস বা এক বৎসরের চুক্তিতে বিজ্ঞাপন দিলে, দর স্বতন্ত্র; কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে পত্রদ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

৫। কোন মাসে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে, পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সে সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। **মফঃস্বল ও সহরের সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশনের** বন্দোবস্ত হইয়াছে; কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিয়া জানিতে হইবে।

"মুকুল" কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীআদিত্যকুমার গুপ্ত।
৫৮।১, আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুপন (পুরস্কার প্রতিযোগিতা) (অগ্রহায়ণ)

নাম

ঠিকানা

তারিখ বয়স

পুরস্কার প্রতিযোগিতার বিবরণ সম্পাদকের চিঠিতে দেখুন।

মুকুল

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

আমি মুকুল ভবিষ্যতের ফুল,
অনাগত পরিমলের বাসা
আমি ভাবী নির্ম্মাল্য অতুল
বনস্থলীর আশীর্ব্বাদ ও আশা।

২

গুঞ্জে অলি চেয়ে আমার পানে,
প্রভাত সমীর নিতুই মোরে ডাকে
আমার কথাই বিহগ গাহে গানে,
শিশির আমার মুখ তাকায়ে থাকে।

৩

আমি অরুণ চালাই রবির রথ
আমি কবি বালক কালিদাস,
আনন্দ যে দেখায় আমার পথ
অমৃতেরি পুরে আমার বাস।

৪

প্রণব আমি সৃষ্টি আমার বুকে,
কোরক—ভাবী পূজার সাজি ভরি
আমি গোপাল, ব্রহ্মাণ্ড মোর মুখে
প্রাচীন ধরা আমিই নূতন করি।

দেশবন্ধু

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

জাগো আমার বাংলা মা গো, ওঠো চোখের জল মুছে
যায়নি তোমার অমর ছেলে, যায়নি সমর-সাধ ঘুচে
তোমার কোলের নিধি কি মা এমন বিধি গ'ড়লো, যে
মরণ তারে ক'র্‌বে হরণ, তার আঘাতে পড়্‌'লো সে।

আট কোটি এই বুকের মাঝে বাণী যাহার বাজ্‌ছে মা
কণ্ঠ তাহার থাম্‌লো হঠাৎ এ কথা যে সাজ্‌চে না
দেশের প্রাণের আশার কমল পায়ের রেণু যার যাচে
সে যদি মা নাই থাকে তো কেমন ক'রে দেশ বাঁচে!

কাঁদিস্‌নি মা, কাঁদিস্‌নি আর——শোকের সময় নয় এযে
জ্বাল্‌লো যে তোর ভক্তি-শিখায় প্রেমের আগুন সবত্তেজে
ঢাক্‌বে কে তার দীপ্তি অটুট্‌, স্নেহের কিরণ তুই দিলে
মায়ের বুকের থাক্‌লে সাহস, ছেলের প্রাণের জোর মিলে।

বাংলা দেশের ছেলে মেয়ে ক'র্‌ছি কঠিন পণ আজি
ভ'র্‌বো তাহার পুণ্য পূজার ফুল দিয়ে এই মন্‌-সাজি
বইব' মোরা নিশান তারি "দেশ'বন্ধু-জয়" বলি
তারি চরণ-চিহ্ন ধরি চল্‌বো মোরা ভয় দলি।

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন

[শ্রীসরোজবাসিনী দেবী]

১

বিষাদে শিহরি স্মরি
এ বঙ্গ আঁধার করি
গিয়াছ চলিয়া তুমি বঙ্গের রতন
কি রোদন বাজে কানে
কি নিরাশা জাগে প্রাণে
কোটি অন্তরের মাঝে অসহ বেদন।
অমর আলয় হ'তে
ঢালিও অযুত স্রোতে
তোমার আশিস্-ধারা, শান্তি-প্রস্রবন।

স্বদেশের লাগি হ'লে কত দুখভাগী
আমাদের তরে ব্যথা পেলে, অনুরাগী!
মানবের সুকল্যাণে সদা ছিলে রত
ত্যাগে দেব পালিয়াছ পরহিত-ব্রত।
যশের পতাকা রেখে
বিজয়ের সুধা মেখে
উজলিতে গেছ তুমি কি অমর-ধাম
দেব-রুচি দেহে রাজে
এসেছিলে ধরা-মাঝে
দেবের কুমার, ল'য়ে মানবের নাম।

২

অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে
মায়ের কোলেতে র'য়ে
শান্তিতে ঘূমায় শিশু, চেয়ে দেখ অই
যা আছে, থাকুক্ বাকি
মিছে কর ডাকাডাকি
তোমাদের হবে খেলা, স্মৃতি তার লই
কত ঘাত প্রতিঘাত
সয়েছে সে দিনরাত
কোমল পরাণে তার, অবিচল রই।

কত কাঁটা ফুটিয়াছে কণ্টকের বনে
কত তীর বিঁধিয়াছে জীবনের রণে
হয়নিতো সাধনায় তবু সে কাতর
যুঝিয়াছে প্রাণপণে মহা শক্তিধর
সুখের আলয় নয়
এ মরত মরুময়
হেথায় মিটেনা আশা, তৃষা নাহি চুকে
যাও চলি পুণ্যালোকে
মধুময় শান্তি-লোকে
মর্ত্ত্যের কৌস্তুভ যাও স্বরগের বুকে।

ষড়যন্ত্রের ফল

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি]

বিহারের একটী প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার আপনার বাসার বারান্দায় ঈজি চেয়ারে হেলান দিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানা বই পড়িতেছিলেন এমন সময় এক বৃদ্ধ কৃষক ডাক্তারের সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তারের মন তখন অনেক দূরে ছিল। তিনি হাঁসপাতালের কার্য্যে তখন সম্পূর্ণভাবে শেষ করিয়া পুস্তক সমুদ্রে ডুব দিয়াছেন। তাঁহার মন তখন সম্মুখের প্রান্তর, প্রান্তরের প্রান্তস্থিত বৃক্ষশ্রেণী রাজপথের অনুচ্চ জনকোলাহল, যানাদির ঘর্ঘর ধ্বনি, রোগের বিবরণ, রোগীর আত্মীয়াদির নিবেদন এসমস্ত অতিক্রম করিয়া ডিকেন্সের সৃষ্ট নরনারীর মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

আকাশে মেঘ দেখা দিল। রৌদ্র পড়িয়া গেল। একটা দমকা হাওয়া চারিদিকের গাছপালা কাঁপাইয়া বহিয়া গেল। গাছ হইতে কতকগুলি শুষ্ক ও জীর্ণপত্র ও সেই সঙ্গে ২।১টী সবুজ পত্রও ঝরিয়া পড়িল। নীচেকার শুষ্কপত্রের রাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া গেল।

ঝটিকার বর্ণনা ডাক্তারকে মোহিত করিয়াছিল। সেই দুরন্ত ঝটিকা একবার মনে মনে কল্পনা করিবার জন্য পুস্তকখানি বন্ধ করিতেই বাহিরের ঝড় ও মেঘের সাড়া চোখে পড়িয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য পাঠকের মনে হইল এ যেন সেই ঝটিকারই পূর্ব্ব সূচনা। পরক্ষণে কৃষকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কি দরকার?

লোকটী বলিল তাহার ছোট ভাইয়ের ছেলের কদিন হইতে জ্বর হইয়াছে। কাল হইতে আর কথা কহিতে পারিতেছে না। তাই ডাক্তারকে ডাকিতে আসিয়াছে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন---এতদিন কি চিকিৎসা হইতেছিল ? লোকটী বলিল—এতদিন ঝাড় ফুক চলিতেছিল। ভিন্ন গ্রামের ২।৩ জন ভাল ওঝা ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতে ফল হয় নাই।

ঝাড় ফুক কেন হইয়াছিল জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, কারণ ভূতের কৃপা ব্যতীত জ্বর বিশেষতঃ বেশী জ্বর হয় না ইহা কে না জানে ?

ডাক্তার বুঝিলেন বোধ হয় জ্বর বেশী হওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। তিনি লোক-টীকে টম্‌টম্ আনিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। টম্‌টম্ আসিতেই তিনি প্রস্তুত হইয়া টম্‌টমে চড়িতে যাইবেন এমন সময় একটী লোক একখানি চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। ডাক্তার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। সেকানকার রায় সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্রের শরীর অসুস্থ—একবার যাইতে হইবে।

ডাক্তার সেই পত্রেরই একপৃষ্ঠে লিখিয়া দিলেন—১ ক্রোশ দূরে একটা বিশেষ শক্ত অসুখ দেখিতে যাইতেছেন। ফিরিয়া তাঁহার ওখানে যাইবেন। যদি দেরীতে কোন অসুবিধা হয় অন্য কাহাকেও ডাকাইতে পারেন।

চিঠি লোকটীর হাতে দিতে সে বলিল - 'আপনি যাবেন না ?'

'ওতে সব লেখা আছে' বলিয়া ডাক্তার কৃষকটীকে গাড়ীতে বসাইয়া লইয়া গাড়ী চালাইলেন।

(২)

ডাক্তার যখন ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাসায় আসিতেই হাঁসপাতাল কমিটির প্রেসিডেন্টের একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে এই ইঙ্গিতটা আছে যে তিনি নাকি হাঁসপাতালের কাজ ফেলিয়া এবং সহরের একটী বিশেষ শক্ত রোগী ফেলিয়া বেশী ফির জন্য দূরে গিয়াছিলেন।

একেতো দূরে পাড়াগাঁয়ের রোগীটির অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহার উপর বাসায় ফিরিয়া এই নিতান্ত মিথ্যা অভিযোগপূর্ণ পত্র পাইয়া তাঁহার বিরক্তির আর অবধি রহিল না।

এই দেশ ! একটা আট বছরের ছেলেকে আলোক বায়ু বিহীন ঘরের মেঝেতে চটের শয্যায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে এবং যখন সে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান তখন রোগীর আত্মীয়েরা রোগীর মাথার অগ্রভাগ তেলে ভিজাইয়া তাহার হাত ও পা তেল দিয়া ঘন ঘন মালিস করিয়া রোগীকে আরও পরিশ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে ও দুয়ারের গোড়ায় আর দুজন জোয়ান মুসলমান বসিয়া আছে ; তাহারা নাকি 'ওঝা 'ও রোগী নড়িয়া উঠিতেই দুই লম্ফে ভিতরে গিয়া তাহার মাথার কাছে শপাশপ্ ঝাঁটার শব্দ করিতেছে। ডাক্তার সেই রোগীকে বাহিরের বারান্দায় নিজের গায়ের একটা ফরসা চাদর বিছাইয়া শোয়াইয়া তাহার মালিশ বন্ধ করিয়া ওঝাদিগকে অতি কষ্টে বিদায় করিয়াছেন। তৎপরে পরিচর্য্যা করিয়া তাহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া দিয়া তবে ফিরিয়াছেন। ফিরিয়া আসিতেই আবার এই কৈফিয়ৎ তলব।

বাসায় না গিয়া বরাবর হাঁসপাতালে আসিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কৈফিয়তের জবাব দিলেন। লিখিলেন—দূরের রোগীটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাহার জীবন সংশয়াপন্ন ছিল সেই জন্য তিনি যখন যাইবার জন্য টম্‌টমে উঠিবেন এমন সময় গ্রামস্থ এক ভদ্রলোকের ভৃত্য ডাকিতে আসে ; সেখানে রোগীর শুধু জ্বর এছাড়া সেখানে আর কিছু সাংঘাতিক ছিল না। কাজেই কর্ত্তব্য বোধে তিনি দূরের রোগীর কাছেই যান। তখন অপরাহ্ণ ৬টা—হাঁসপাতালের সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর যেখানে তিনি গিয়াছিলেন--ফিয়ের লোভে যান নাই। বরং তাঁহার পকেট হইতে কিছু দিয়া আসিতে হইয়াছে ; কারণ তাহাদের অবস্থা দেখিলে মানুষের পক্ষে ফি চাওয়া অসম্ভব। রোগীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিলেন—যদি প্রয়োজন হয় রোগী সম্বন্ধে সংবাদ লওয়া চলিতে পারে।

হাঁসপাতালের লোক দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিয়া ডাক্তার বাসায় ফিরিলেন।

হাতমুখ ধুইয়া জলযোগান্তে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ডাক্তার পুস্তকখানি হাতে লইয়া গল্পের ছিন্ন সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন এমন সময় ডেপুটীর চাপরাশী সেখানে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"কি খবর কৈলাস সিং ?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সাহেবের দাওয়াই (ঔষধ)।"

"দাওয়াই ! কিসের ?"

"সে যে লিখে দিইছিলেন।"

"সেই যে দশটার সময় লিখে দিইছিলাম, সেই ঔষধটা ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"আমি যে বলেছিলাম ৩টার সময় এসে নিয়ে যাবে।"

"আমাদের কি এক কাজ বাবু, যে ঐটা মনে করে থাক্‌ব।"

"ওঃ তাহলে ভাল। কাল সকালে হাঁসপাতাল খুল্লে এস। ৫টার পর হাঁস-পাতাল বন্ধ হয়ে গেছে।"

"আজ তা'হলে ঔষধ পাওয়া যাবেনা তো ?"

"না।"

"ডেপুটী বাবুকে একথা গিয়ে বল্‌ব ত ?"

হ্যাঁ বল্‌বে বৈকি।

ডাক্তারের সম্মুখে কিছু না বলিয়া কিছু দূর গিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে লোকটা চলিয়া গেল।

সেই রাত্রেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা দলের সৃষ্টি হইল। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন কি করিয়া ডাক্তারকে জব্দ করা যায়।

ইহার পর হইতে ডাক্তারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সিভিল সার্জ্জেনের নিকট পৌঁছিতে লাগিল।

(৩)

দিন ১৫ পরে একদিন রাত্রে ১০টার পর হাঁসপাতালের চৌকিদার ডাক্তারকে ডাকিল। বলিল—'এক কাবুলিওয়ালার পেটের যন্ত্রণা হয়েছে। রাত্রে সে হাঁসপাতালে আশ্রয় চায়।"

একটা বিছানা তাকে দাওগে, আমি গিয়ে ঔষধের ব্যবস্থা কচ্চি। কম্পাউণ্ডারকে খবর দাওগে।

চৌকিদার ডাক্তারের আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার তখন সেই মাসের স্বাস্থ্য-পত্রিকায় আমাশয় সম্বন্ধে নূতন চিকিৎসার প্রবন্ধটী শেষ করিয়া তাঁহার পকেট বইতে গোটাকতক বিষয় টুকিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন।

হাঁসপাতালে আসিয়া দেখিলেন কম্পাউণ্ডার আসিয়াছেন; কাবুলিওয়ালা

একটা বিছানায় শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কম্পাউণ্ডার একটা কারমিনেটিভ মিকশ্চার তৈয়ারি করিয়া বলিতেছিলেন—খাঁ সাহেব, এটা খাইয়া শুইয়া পড়—সারিয়া যাইবে। বেশী মাংস খাইয়াছ তাই গরহজম হইয়াছে—ভয় নাই।

খাঁ সাহেব সেই আর্ত্তনাদের মধ্যেই বলিতেছে—ঔষধ যদি খায় তো ডাক্তার আসিলে খাইবে, নহিলে এমনিই শুইয়া থাকিবে।

ডাক্তার আসিয়া কাবুলিয়য়ালাকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে যেন করাত দিয়া পেটেরভিতরকার একটা অংশ কে কাটিতেছে। আহারাদির অত্যাচার সে কিছুই করে নাই কেবল দিবাভাগে তাহার এক দোস্তের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া মাত্র দুই সের খাসির মাংস খাইয়াছে।

তারপর কাবুলিওয়ালা হাতযোড় করিয়া বলিল—ডাক্তার সাহেব আমাকে বাঁচান—আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার কাছে ৫০৲ টাকা আছে, তাই আমি দিতেছি; আমি ভাল হইয়া আরও ৫০৲ টাকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

ডাক্তার বলিলেন—হাঁসপাতালে আসিলে টাকা দিতে হয় না। তোমার কিছু খরচ করিতে হইবে না। আমি ঔষধ দিতেছি, এখনি ভাল হইয়া যাইবে।

ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত কম্পাউণ্ডার এক ডোজ্ ঔষধ তৈয়ারী করিয়া আনিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিল। খানিকক্ষণ পরে রোগী বলিল—যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইয়াছে। আর কিছু পরে সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

ডাক্তার তখন বাড়ী চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে ডাক্তার হাঁসপাতালে গিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই কাবুলিওয়ালার খোঁজ করিতে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্যান্য রোগী দেখিয়া নিজের ঘরে গিয়া দেখেন কম্পাউণ্ডার হাসিমুখে আগুন্তুকদের নাম-লেখা খাতায় মন্তব্য পড়িতেছে।

তাঁহাকে দেখিয়াই কম্পাউণ্ডার বইখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিল। তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

"এই হাঁসপাতাল ও এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে কতকগুলি নামযুক্ত ও কতকগুলি বেনামী অভিযোগ শুনিয়া আমি কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে গত্যকল্য রাত্রে ১১টার সময় আসিয়া উপস্থিত হই। ডাক্তার অন্যায় ভাবে টাকা নেন বা নিয়মমত হাঁসপাতালে আসেন না—এ সমস্ত অভিযোগ একেবারে মিথ্যা। আমি ডাক্তারের ব্যবহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এরূপ ডাক্তার পাওয়া গবর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীর গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আজ যাইবার সময় আমার প্রকৃত পরিচয়ে ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। বারান্তরে আসিয়া দেখা করিব।

শক্ত শক্ত রোগের ইন্‌জেকসেনের ঔষধ ক্রয়ের জন্য আমি ডাক্তারের হাতে দিবার জন্য কম্পাউণ্ডারের কাছে এক শত টাকা রাখিয়া গেলাম।

সবিস্ময়ে ডাক্তার দেখিলেন—লেখার নীচে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম সহি।

নিবেদন

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দেশের একমাত্র ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল,—দেশের সুখ-দুঃখ তাদেরই উপর নির্ভর করে। তারা যদি ঠিক দেশের ছেলে মেয়েটীর মত গড়ে উঠে, তা'হলে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় বোধ করি আর কিছুই নেই; কিন্তু এ সমস্ত নির্ভর করে একমাত্র শিক্ষার উপর।

তরল সরল মনগুলির মধ্যে ছোটবেলা থেকেই সুশিক্ষার পবিত্র কিরণ যদি ভরে দেওয়া যায়, তা'হলে সেই ছেলে-মেয়েরা একসময়ে যে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌বে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই,—কিন্তু এই সুশিক্ষা দানই হচ্ছে কঠিন ব্যাপার।

আনন্দের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষাটা দেওয়া যায়, সেইটাই দেখা যায় কার্য্যক্ষেত্রে অধিক কার্য্যকরী হয় এবং এ কথা শিক্ষা-পথের বিশেষজ্ঞরাও সকলে এক বাক্যে বলে থাকেন।

সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'মুকুল' ছোট ছোট ভাই বোন্‌দের সামনে দাঁড় করালাম্—আমাদের এই ঐকান্তিক চেষ্টা কতদূর সফল হবে, তা জানি না; তবে আমাদের যথাসাধ্য অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হব না। আশা করি জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের এই চেষ্টা ভবিষ্যতে জয়োযুক্ত হবে।...এই দিনে কেবলই মনে করিয়ে দিচ্ছে বাংলার সেই সর্ব্বনাশের দিন, যে দিন বাঙ্গালী জাত একজনের মহাপ্রয়াণে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে গেছে। বাংলা মায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান দেশবন্ধুর আকস্মিক অকাল-বিয়োগে যে ব্যথা দেশবাসীর অন্তরাত্মাকে উদ্বেলিত করেছে, তা' জগতের ইতিহাসে প্রথম।

অমর দেশবন্ধু যে-পথ দিয়ে চলে মৃত্যুকে জয় করেছেন, যে-পথে যেতে তিনি

তাঁর দেশবাসীদের আহ্বান করেছিলেন, সে-পথে চল্‌তে আমরা যদি চেষ্টা করি, তা'হলে তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে,—তিনি পরলোক থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। তাঁর যে কার্য্যগুলি প্রিয় ছিল, যে-গুলি তিনি অসমাপ্ত করে রেখে গেছেন, সেই গুলি আমাদের সাধ্যমত যদি সমাধা কর্‌বার চেষ্টা করি, তা'হলে সেই পরলোকগত পুরুষসিংহের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

এসো ! বাংলার ভাই-বোন্‌রা সকলে সমস্বরে বলি—

"তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ
চলিব তোমারি পথে।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

[শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে
আমরা ও হব বরণীয় !" (হেমচন্দ্র)

১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক, ইংরাজী ১৮৭০ ৫ই নভেম্বর বঙ্গের,—তথা ভারতের এক মহা সৌভাগ্যের দিন। ঐ স্মরণীয় শুভদিনে শুভক্ষণে বাংলার গৌরব বাঙ্গালীর আদরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম হয়।

তখন কে জান্‌তো ঐ শিশু একদিন সর্ব্বপ্রথম দেশবাসীর অন্তরের যথার্থ

দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুল্‌বে ! তখন কে জান্‌তো একদিন ঐ শিশু রাজার ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলে দিয়ে, ত্যাগে বুদ্ধদেব হয়ে, সারা ভারতে স্বদেশ-প্রীতি প্রচার করে বেড়াবে !

কোন্ পুণ্যক্ষণে বাঙ্গালী এমন জননায়ক পেয়েছে ! কোন্ অশুভক্ষণে সে এমন জননায়ক হারিয়েছে ।

চঞ্চলা পদ্মার ওপারে বিক্রমপুর,—সেই বিক্রমপুর পরগণায় তেলিরবাগ গ্রামে চিত্তরঞ্জনের পিতৃপিতামহগণের বাসভূমি ; কল্‌কাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাসা-বাটীতে ভূমিষ্ঠ হলেও উহাই চিত্তরঞ্জনের প্রকৃত জন্মভূমি ।

সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জন্ম । চিত্তরঞ্জনের পিতামহ জগদ্বন্ধু দাশের মন করুণায় ও সহানুভূতিতে ভরা ছিল ; দুঃস্থ ব্যক্তি দেখ্‌লেই তিনি তার দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা কর্‌তেন । তাঁর রোজগারের বেশীর ভাগ ব্যয় হত নিজগ্রামের অতিথিশালায় ও দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণে ।

এই দাশ বংশে দান করাটা ছিল মজ্জাগত অভ্যাস ; এই মহৎ গুণ পরে চিত্তরঞ্জনের মধ্যে সব চেয়ে ফুটে উঠে ছিল । তাঁর অসাধারণ দানশীলতা ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না ; সে-সব কথা তোমাদের পরে বল্‌বো ।

জগদ্বন্ধুর পুত্র ভুবনমোহন দাশের তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা ; তার মধ্যে চিত্তরঞ্জন হচ্ছেন পিতার দ্বিতীয় সন্তান । ভুবনমোহন দাশ কল্‌কাতা হাইকোর্টের নামজাদা এটর্ণি ছিলেন,—নিজের ব্যবসায়ে যদিও তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন, কিন্তু বংশের অস্থিমজ্জাগত দানশীলতার গুণে জমানো তো দূরের কথা, ঋণভারে শেষকালে দেউলিয়া খাতায় নাম লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন ।

আইনেতে বাধ্য না হলেও পিতার ধার চিত্তরঞ্জন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, প্রত্যেক পাইপয়সাটি সুদের সঙ্গে শোধ করে দিয়েছিলেন । তাঁর এই পিতৃঋণ

পরিশোধ কর্‌বার সময়, হাইকোর্টের জজ অর্থাৎ বিচারপতি, ফ্লেচার সাহেব কি বলেছিলেন জান? তিনি বলেছিলেন "দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়া কেহ আবার পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধ করে, এমন দৃষ্টান্ত আমি কখনও দেখি নাই। ইহাই প্রথম।"

তখনকার কালে যাঁরা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক পূজা ও কতকগুলি আচার ব্যবহার কুসংস্কারপূর্ণ ভেবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, ভুবনমোহন দাশ তাঁদের মধ্যে একজন।

পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে বাসাবাটীতে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের জন্মগ্রহণ কর্‌বার কয়েক বৎসর পরে, ভুবনমোহন দাশ ভবানীপুরে এসে বাস কর্‌তে আরম্ভ করেন,—সুতরাং চিত্তরঞ্জনের বাল্যশিক্ষা ঐ স্থানেই হয়েছিল। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুলে প্রথম প্রবেশ করে, চিত্তরঞ্জন সেইখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ কর্‌তে থাকেন।

কলেজে অধ্যয়ন কর্‌বার সময়, তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ ছিলেন ও সেইজন্য কলেজে তিনি বেশ যশ অর্জ্জন করেছিলেন। বক্তৃতা কর্‌তে কালে তিনি এত অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যে তাঁর বক্তৃতাবলী এখন সাহিত্যের একটী বিশেষ দিক্ পরিপুষ্ট করেছে। একুশ বছর বয়সে বাঙ্গালীর সন্তান হয়ে, বিলাতের মতন বিদেশে বিদেশীয় জনতার সাম্‌নে, তিনি অকুতোভয়ে সত্য বল্‌তে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা' বাস্তবিক আশ্চর্য্যজনক।

যাহা হউক ১৮৯০ সালে ঐ কলেজ থেকেই তিনি বি, এ ডিগ্রি লাভ করেন। তখনকার কালে সিভিল সার্ভিস্ পাশ করে বড় চাকুরীয়া হতে পার্‌লে, বাঙ্গালীর জীবনের সাধ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যেত।

পিতার ইচ্ছায় ও আদেশে, চিত্তরঞ্জন সিভিল স্যার্ভিস্ পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন,—কিন্তু জাতির বড় সৌভাগ্য যে চিত্তরঞ্জনের পিতার ইচ্ছা সফল হয়-নি। সফল হলে চিত্তরঞ্জনকে কোন্ একটা জেলায় চাকরী করতে হ'ত,

জাতির ইতিহাসের পাতা একেবারে চিরকালের জন্য বদ্‌লে যেত,—জাত্‌টা পক্ষাঘাতের রোগীর ন্যায় পঙ্গু ও মৃতপ্রায় হয়ে থাক্‌তো, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

একুশ বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জন বিলাত যান ও এই নবীন বয়সে তরুণ বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতার মাধুর্য্যে, সকলে চমৎকৃত হয়ে যান। ঐ সময়ে বিখ্যাত দাদাভাই নৌরজী বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভায় সদস্য হবার খুব চেষ্টা কর্‌ছিলেন; চিত্তরঞ্জন এই ভারতীয়ের পক্ষ সমর্থন করে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার প্রশংসায় সেখানকার বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের স্তম্ভ ভরে গিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জনের হৃদয় তখনই স্বদেশ-প্রীতিতে কি রকম পূর্ণ ছিল, তা নীচেকার ঘটনাটা পড়্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারবে।

মিঃ জন্ ম্যাক্‌লীন্ নামে পার্লামেণ্টের এক শ্বেতাঙ্গ সভ্য পার্লামেণ্ট মহাসভায় অযথা মিথ্যা কথায় ভারতীয়দের ক্রীতদাস বলে কলঙ্ক লেপন করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্বদেশের এই মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার সহ্য কর্‌তে পার্‌লেন না; তখন বিলাতে তিনি ছাড়া অন্যান্য অনেক ভারতীয় ছিলেন, কিন্তু কৈ প্রথমে এই নিন্দুকের কথার প্রতিবাদ কর্‌তে কেউ তো এগিয়ে এলেন না?

চিত্তরঞ্জন,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মন অন্য ধাতুতে গড়া ছিল; তাঁর স্বদেশ-প্রেমিক হৃদয় কি মাতৃভূমির এই অপমানে স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? তখন তাঁর শয়নে স্বপনে একমাত্র চিন্তা হ'ল কিসে এর প্রতিশোধ লওয়া যায়, কি করে ঐ মিথ্যাবাদী লোকটাকে উচিতমত শিক্ষা দেওয়া যায়।

প্রবাসী অপরাপর ভারতীয়দের সম্মতি নিয়ে, লণ্ডন সহরে এক্স্‌টার হলে তিনি এক প্রতিবাদ-সভার আয়োজন কর্‌লেন ও সেই সভায় তিনি নিজে বক্তৃতা দিয়ে ঐ অশিষ্ট ম্যাক্‌লীনের মিথ্যাকথার প্রতিবাদ কর্‌লেন।

ঐ বক্তৃতার ফল হ'ল চমৎকার। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার

লেখালেখি ও আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌লো ; তাঁর বক্তৃতাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল, —সহরের চারদিকে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। এর ফলে প্রসিদ্ধ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাহেবের সভাপতিত্বে ওল্ডহাম্‌ নামে এক জায়গায় এক সভার অধিবেশন হ'ল ; সেই সভায় চিত্তরঞ্জনকে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ হ'ল। মাতৃভূমির অপমানে অপমানিত হয়ে তিনি সে-দিন জ্বলন্তভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা' অসাধারণ ; তার ফলে মিথ্যাবাদী, নিন্দুক জন্‌ ম্যাক্লীনকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল ও পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যের তালিকা থেকে তার নাম মুছে গেল।

এই ঘটনা থেকে বুঝ্‌তে পারা যায়, চিত্তরঞ্জনের হৃদয় স্বদেশ প্রীতিতে কি রকম পরিপূর্ণ ছিল।

(ক্রমশঃ)

চালাক জগাই

[শ্রীমোহিতলাল মজুমদার]

"—বলিস্‌ কিরে ! তুই হরিশের ভাই !
তার মত যে ভালো ছেলে স্কুলে আর নাই !
যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি কেমন দিব্যি সে ফুট্‌ফুটে !
তারি ভা'য়ের মূর্ত্তি এমন ! —স্বভাব কি বিদ্‌ঘুটে !
স্বভাব যা' হোক্‌, কেমন করে' হ'লি এমন কালো ?"

"কি জানি, স্যার ?—ফর্‌সা হওয়া এমন বুঝি ভালো !
দাদা বুঝি বড্ড ভালো ? --জানি সে খুব জানি,
এমন বোকা ! —মাথায় নেই তার বুদ্ধি একটুখানি !

আমি কেমন চালাক !—সে ত' বলে এখন সবাই,
বলে, হরিশ মস্ত গাধা ! কেমন তুখোড় জগাই ! —
আমার কাছে যখন তখন হেরে যায় ত' দাদা—"

"তাই নাকি ? তুই এমন চালাক। দাদা এমন গাধা !
আচ্ছা শুনি, কেমন করে' হারাস্ যে তুই তাকে ?"

"কোন্ কথাটা বলি এখন, সব কি মনে থাকে ?—
একটা আছে হাত-ঘড়ি তার—দিছ্ল কিনে মামা,
বল্লে সেদিন, 'রাখ্ ত' জগা !'—আমি কি খান্সামা ?
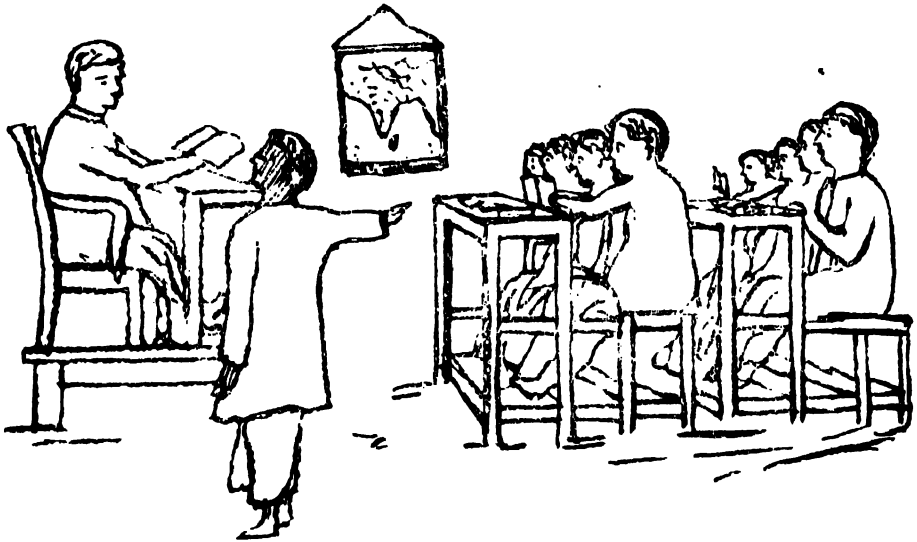
বিকেল বেলায় পায় না খুঁজে,' বল্লাম, 'আছে হোথা !'—
তত চেঁচায়, বলে—'আমি দেখ্ছি না ত' কোথা !'
বাবু যাবেন বায়োস্কোপে— তা'ও আবার 'পাশে'!
না পর্লে নয় হাত-ঘড়িটা, দেখে যে লোক হাসে !

রেখেছিলাম আমি সেটা ডেক্সটারি তলায়,
দেখি কেমন পায় সে খুঁজে—বুদ্ধি কেমন খেলায়!
যত বলে,' কোথায় জগা?' আমি বলি 'হোথায়!'—
তেড়ে এল, পালিয়ে গেলাম চিলে-কোঠার মাথায়!
শুধু হাতেই যেতে হ'ল—কেমন জব্দ! হি হি!
জানি এর পর বাবার কাছে কর্‌বে জবাবদিহি;
তারো উপায় রাখ্‌ছি করে'!—ছাদের উপর থেকে
হেসে যে আর বাঁচিনে তার গোম্‌সা-বদন দেখে!

যা' বলেছি!—ফিরে এসেই ছিঁচ্‌কাঁদুনে ধাড়ী
লাগিয়ে দিলে বাবার কাছে!- গেলাম তাড়াতাড়ি।
শুন্‌লাম—'জগা! কি হয়েছে? কি করেছিস্‌? গাধা!'—
'কি করেছি?—মিথ্যে করে' লাগায় কেন দাদা?'
'হাত-ঘড়িটা বল্‌ত কোথায়?' —'আমি কি তার জানি!'
রেখেছিলাম শেল্‌ফের উপর, যেথায় দোয়াত-দানি—
পায় না খুঁজে, সে দোষ আমার? বেশত' মজার লোক!'
—পাচ্ছিল যে হাসি তখন, দেখে দাদার চোখ!

হিড়হিড়িয়ে টেনে আমায় চল্‌ল পড়ার ঘরে,
দ্যাখে, ঘড়ি ঠিক সে আছে দু'খান বইএর পরে!
যেমন ফিরে চাইবে মুখে,—ছিনিয়ে নিয়ে হাত
দৌড় দিলাম রান্নাঘরে, বল্‌লাম, 'মা, দাও ভাত!'
মায়ের কাছে কর্‌বে কি আর? এম্‌নি বোকা দাদা—
থেমে গেল, বলে' দুবার 'ইষ্টুপিড্‌' আর 'গাধা'!"
"চালাক তুমি নও ত' মোটেই—পাজী হচ্ছ জগাই!"
"হাঁ স্যার, কেন?—ওই কথা ত' বলে আমায় সবাই।"

পাঠশালার আটচালায়

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

(১)

গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কঙ্কাল মানে কি ?"

ছেলেরা সব প্রশ্ন শুনে মহা ভাবনায় পড়্‌ল' ! 'কঙ্কাল' জিনিসটাকে কি ব'লে

বোঝানো যেতে পারে কিছুতেই তারা ভেবে ঠিক করতে পার্‌লেনা ; কাজে কাজেই, কেউ কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইল।

গুরু মহাশয়ের লম্বা বেতটা 'তুমি জানো' ? 'তুমি জানো ?' ক'রতে ক'রতে একে একে প্রায় সবছেলেরই নাকের ডগার উপর দিয়ে ঘুরে গেল ; সবাই চুপক'রে ঘাড়টি হেঁট ক'রতে লাগল—শেষে ঘরের এক কোণের সব ছোট ছেলেটি একটা মস্ত বড় ঢোঁকগিলে বললে "বল্‌ছি গুরুমশাই ! এই 'কঙ্কাল' মানে ছাল ছাড়ানো শাঁস বাদ দেওয়া মানুষ !

(২)

ভুগোল পড়ান হচ্ছিল।

মাধব সেদিকে মন না দিয়ে যদুর সঙ্গে গল্প করছিল। গুরুমশাই দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে বললেন "ভারতবর্ষের মানচিত্র তোমার তৈরি হয়েছে ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ গুরু মশাই !

"আচ্ছা, উঠে এসে দেখাও দেখি দিল্লী সহর কোন্ দিকে ?—"

মাধর উঠে এসে সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র খানার উপর হাত বুলিয়েও দিল্লী-সহর খুঁজে পেলেনা। তখন গুরুমশাই তার কানটি বেশ বাগিয়ে ধ'রে তাকে দেখিয়ে দিলেন—"এই দেখ্ আমার বাঁহাতি মাথার উপর দিল্লী !—আচ্ছা বল্ দেখি আমার ডান হাতি এপাশে কী ?"

মাধব এবার চট্ পট্ বলে দিলে "আজ্ঞে, বেত !"

তারপর মাধবের যা অবস্থা হোলো তাতো বুঝতেই পারছো

গুরুমশাই ছেলেদের ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বলছিলেন "দেখো, ইংরেজের রাজত্বে আমরা কেমন সুখে আছি ! আগে বিনা অপরাধে নির্দোষী লোকে অবিচারে শাস্তি পেতো কিন্তু আজকাল আর তা হবার জো নেই। এখন কিছু না করলে আর কাউকে শাস্তি পেতে হয়না।—"

একটা ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো, "তবে কেন গুরুমশাই, কাল আমার অত সাজা হোলো আমি বাড়ীথেকে কিছু পড়া করে আসেনি বলে ?"

(৪)

গুরুমশাই অঙ্ক কসছিলেন—"এইধরো তোমার বাবা যদি তোমার দাদাকে দশটাকা দেন, তোমার দিদিকে পাঁচটাকা দেন, তোমাকে তিনটাকা দেন, আর তোমার ছোট ভাইকে একটাকা দেন, তাহলে তোমার বাবার সবশুদ্ধ কতটাকা লাগ্‌বে ?"

ছাত্র—"আজ্ঞে, ওর চেয়ে আরও বেশী টাকা লাগবে।"

গুরুমশাই—" তার মানে ?"

ছাত্র—"বাবা যদি ওরকম কম বেশীকরে দেন তাহ'লে আমাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে কিনা ?—"

(৫)

গুরুমশাই ছেলেদের পাপ পুণ্য সম্বন্ধে নীতিশিক্ষা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা বলো দেখি, মানুষ কি করলে স্বর্গে যেতে পারে ?"

একজন চালাক ছেলে চট্‌ করে বলে উঠ্‌ল—

"আজ্ঞে, মারা গেলে !"

(৬)

ছেলেদের রচনা পদ্ধতি শেখাবার সময় গুরুমশাই বললেন "তোমরা এমন একটি পদ রচনা করো যার মধ্যে "গজিয়ে উঠ্‌ল" এই শব্দ দুটার ব্যবহার থাকবে।"

খানিক পরে তিনি ছেলেদের শ্লেট নিয়ে দেখতে দেখতে দেখলেন একটি ছোকরা লিখেছে "বাবা যখন অসুখে তিনমাস শয্যগত হয়েরইলেন তখন তাঁর বড় বড় গোঁফ দাড়ী গজিয়ে উঠ্‌ল।"

যাদুকর

[শ্রীকমলবাসিনী দেবী

গোবরা যদু নাপিতের সবে ধন নীলমণি। সেইজন্য গোবরার আদরের আর সীমা ছিল না। খুব বেশী আদর পেলে ছেলেদের যা হোয়ে থাকে গোবরারও তাই হোলো। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ানক দুর্দ্দান্ত হোয়ে উঠতে লাগলো। নিজের বাপ মাকে তো সে গ্রাহ্যই করতো না, তাছাড়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থেকে আরম্ভ কোরে বুড়, বুড়ীরা পর্য্যন্ত তার দৌরাত্ম্যে অস্থির হোয়ে উঠলো। বুড়দের হুঁকো কল্‌কে ভেঙে, নস্যির ডিপের নস্যি ছড়িয়ে, বুড়ীদের কুলের আচার চুরি কোরে খায়; তাদের নাতি নাতনিদের সঙ্গে মার পিট, ঝগড়া ঝাঁটি কোরে পাড়া গুলিয়ে সে বাড়ী ফিরতো রোজই এই ব্যাপার চলেতো, পাড়ার লোকে গোবরার নামে তার মা বাপের কাছে নালিস করতে এলে, বাপ তবু ছেলেকে একটু আধটু ধমক চমক করতো, কিন্তু তার মা উল্টে পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে বসতো। তার ধারণা ছিল যে, তার ছেলে খুব ভাল কিন্তু পাড়ার লোকে তাকে দেখতে পারে না বলে তার নামে মিছি মিছি নালিশ করে! গোবরার দৌরাত্ম্যে যদুর দিনগুলো রোজই এই রকম কতগুলো বাজে অশান্তির মধ্যে দিয়ে কাটতো।

একদিন সন্ধ্যের সময় যদু হাট থেকে বাড়ী ফিরছে, পথে তাদের পাড়ার এক বুড়র সঙ্গে দেখা হোতেই, বুড় বল্লে—ওহে যদু, তোমার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলুম তোমার খোঁজে। যাক্ ভালই হোলো দেখা হোয়ে। তোমায় একটা কথা বল্‌বো বাবা, কিছু মনে কোরো না।

যদু বল্লে—সেকি খুড়ো! এমন কি কথা তুমি বল্‌বে যার মধ্যে মনে করা

করিবার কিছু আছে ? তবে খুড়ো যে কি বলবেন তা যদু আন্দাজেই অনেকটা ধরতে পেরেছিল।

বুড়ো বল্লে— না বাবা এমন কিছুই নয়। তবে তোমার ছেলে গোবরা বড়ই দৌরাত্ম্য সুরু করেছে। আজ দুপুর বেলা আমার পাঁচ বছরের নাতনী সেই মেনীটা গো, তার হাতে সে এমন এক লাঠির বাড়ী মেরেছে যে, মেয়েটার হাতখানা ফুলে একেবারে ঢোল হোয়ে উঠেছে ! আহা বাছা সেই দুপুর থেকে হাতের যন্ত্রণায়
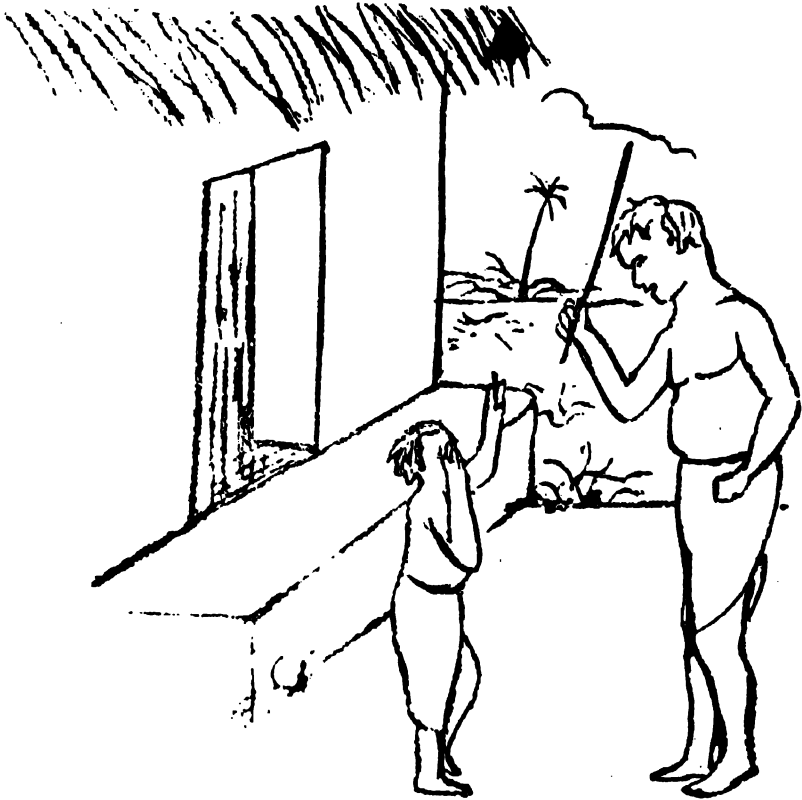
কাত্‌রে কাত্‌রে এই ঘুমুলো। তোমার গিন্নিকে তো বাবা কিছু বল্‌বার যো নেই। তিনি তো কেউটে-সাপের মত সর্ব্বদা ফণা তুলেই আছেন। তাই কি আর করা

যায় দায় পড়ে তোমাকেই সব বলতে হয়। আর ছেলে মানুষের নামে রোজ রোজ তোমাদের কাছে নালিশ করতে আমাদেরও আর ভাল লাগে না। তবে এখন থেকে ছেলেকে শাসন না করলে, কোন দিন সে কি ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে বসবে। তখন থানা পুলিসের হাঙ্গাম বাধবে। ভুগতে হবে তোমাদের দুই স্বামী স্ত্রীকেই। ছেলেটার তো বিশেষ দোষ নেই। সে শাসনের অভাবে দিনকে দিন ঐ রকম বেয়াড়া হোয়ে উঠছে।

রোজ গোবরার নামে এইরকমের সব নালিশ শুনে শুনে যদু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে বাড়ী গিয়ে গোবরাকে আর আস্ত রাখবে না। যদু বল্লে—না ব্যাটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আজ বাড়ী গিয়ে তার শ্রাদ্ধ করবো।

বুড়ো বল্লে—বাপু অত রাগ করে না। ছেলেটাকে মারধোর কোরে আর কি হবে। ছেলে মানুষ একটু বুঝিয়ে বোলো তাহলেই কথা শুনবে। যদু বুড়োয় কথার কোন জবাব না দিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ীমুখো ছুটলো। বাড়ীতে পা দিয়েই যদু অন্য দিনের মত আজও গোবরা বলে হাঁক দিলে। যদুর ডাকবার ধরন শুনে গোবরার মার বুক কেঁপে উঠলো। তার উপর আবার দুপুরবেলা ঐসব ব্যাপার হোয়ে গেছে। তাও তার শুনতে বাকী নেই। গোবরা কিন্তু অতশত বুঝলে না সে নাচ্তে নাচ্তে বাপের কাছে এসে হাজির হোলো। যেই আসা আর যদু তার হাতের লাঠি গাছটা দিয়ে গোবরার পিঠে খুব কোশে দুচার ঘা বসিয়ে দিলে। গোবরার মা রান্না করছিল সে রান্না ঘর থেকে হাঁ হাঁ কোরে ছুটে এসে ছেলেকে যদুর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যদুকে গালাগাল দিতে লাগলো। গোবরা আকাশ পাতাল হাঁ কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলো। তাদের চেঁচামেচিতে পাড়ার দুচার জনও এসে জড়ো হোলো।

যদু গিন্নিকে এক ধমক দিয়ে বল্লে—দেখ অত আদর ভাল নয়। এর নাম আদর দেওয়া নয়, ছেলের মাথা খাওয়া। তোমায় ছেলের জ্বালায় পাড়ার লোক

অস্থির হোয়ে উঠেছে। ছেলের জন্যে শেষে কি বাপ পিতেমহর ভিটে ছেড়ে বনে গিয়ে বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে বাস করতে হবে? গোবরার মা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নাকি সুরে বল্লে—আমার ঐ এক রত্তি দুধের বাচ্ছার ওপর পাড়ার লোকের এত হিংসে কেন তাতো জানি না। আর তুমিই বা সব কথা ভাল কোরে না জেনে শুনে ওকে অত মারলে কেন।

যদু বল্লে—আহা বড্ড মারই মেরেছি। ওর হাতটা পাটা যে ভাঙ্গিনি এই ওর ভাগ্যি। আহা হরি খুড়োর ঐ এক ফোট্টা নাত্নীটার হাতে, তের চোদ্দ বছরের ছেলে কি বলে লাঠির বাড়ী মারলে। একটু দয়ামায়াও নেই।

গোবরার মা বল্লে—ওসব বাজে কথা গো। মেয়ে কি কোরে পড়ে গিয়ে হাতে চোট লাগিয়েছে। আমার ছেলেকে ওরা দেখতে পারে না কিনা সেইজন্যে ওর ঘাড়ে সব দোষ চাপাচ্ছে।

যদু বল্লে—আমি তোমার ও তোমার ছেলের কোন কথা শুনতে চাই না। কাল থেকে আর গোবরার বাড়ীতে বসে থাকা হবে না। আমার সঙ্গে কাজে বেরুতে হবে। জাত ব্যাবসা এই বয়স থেকে না শিখলে আর শিখবে কবে?

যদুর চড়া চড়া কথা শুনে গিন্নি আর কোন জবাব দিতে ভরসা পেলে না বটে কিন্তু এই জাত ব্যবসা শেখার কথায় তার মন উঠলো না, তার বরাবরই ধারণা ছিল যে তার ছেলের যেমন পরিষ্কার বুদ্ধি শুদ্ধি তাতে সময়ে সে রাজা বাদশা এমনি একটা কিছু হতে পারবে।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে যদু যখন শুতে গেলো গিন্নি, দেখলে তার রাগটা পড়ে গেছে, যা বলবার এই বেলাই বলা ভাল। এই ভেবে সে যদুকে বল্লে—দেখ, গোবরা তোমাদের ও সব নাপতে কাজ পারবে না, তা আমি এই বেলা বলে দিচ্ছি। অমন পরিষ্কার বুদ্ধি শুদ্ধি ওর, ওকে একটা ভাল কাজ শেখাও। যদু বল্লে—না না আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই ঢের হয়েছে। নাপিতের বেটা জাত ব্যবসা শিখবে না নাজির উজির হবে। কিন্তু গিন্নি কি আর সহজে ছাড়ে। অনেক কথা

কাটাকাটির পর শেষে ঠিক হোলো যে গোবরাকে নাপিতের কাজ শিখতে হবে না। নাপিতের কাজ ছাড়া অন্য যে কোন একটা ভাল কাজই সে শিখবে।

(ক্রমশঃ)

— —

আমোদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ]

হাতের কাছে পাওয়া যায় এইরূপ জিনিষ দিয়া বালক বালিকারাও এমন সব ছোট ছোট পরীক্ষার আয়োজন করিতে পারে যাহাতে শিক্ষা ও আনন্দ মিলিত হয়। বিজ্ঞান শুষ্ক নীরস কঠোর নয়—আমোদ ও বিজ্ঞান কথা দুটী পরস্পর বিরোধী নয়। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যেও এমন সব ছোট খাট ব্যাপার আছে যাহা চিত্তকে আকৃষ্ট করে। ইহার কিছু কিছু ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইবে।

———

জড় পদার্থের একটা ধর্ম্ম এই যে, সে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকিতে চাহে। যদি চলিতে থাকে তো হঠাৎ থামিতে চাহিবে না, যদি থামিয়া থাকে তো হঠাৎ চলিতে চাহিবে না। সংসারে অনেক ঘটনায় ইহা লক্ষ্য করা যায়। চলিতে চলিতে ঠোক্কর খাইলে আমরা সামনের দিকে পড়িয়া যাই। তাহার কারণ এই যে চলিবার সময় সমস্ত দেহের সম্মুখের দিকে একটা গতি হয়; ঠোক্কর খাওয়া—মানে পায়ের গতি বন্ধ হওয়া—; কিন্তু পায়ের গতি বন্ধ হওয়া মাত্রই দেহের উপরদিকের গতি বন্ধ হয় না—অর্থাৎ দাঁড়াইল এই—সমস্ত

দেহের মধ্যে পায়ের গতি বন্ধ হয়, কিন্তু উপরিদিকের একটা সম্মুখদিকে যাইবার
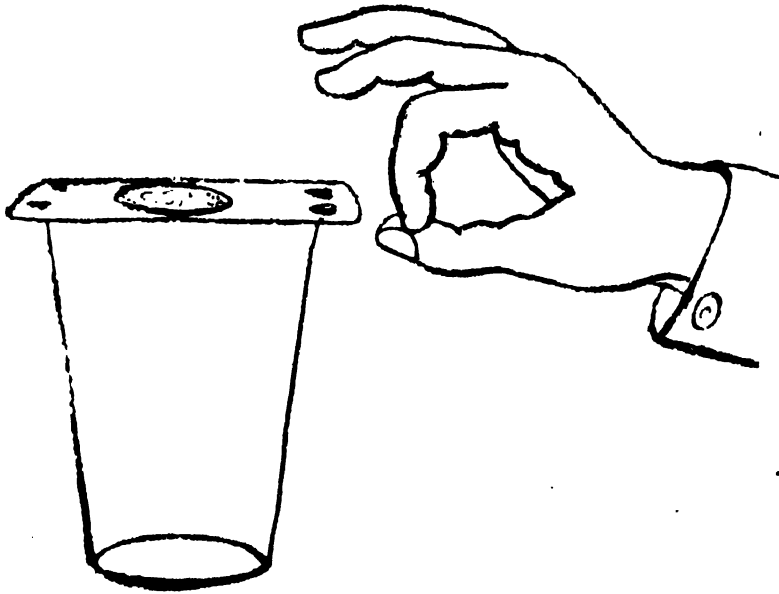
চেষ্টা কিন্তু পা দু'টা একবারে নিশ্চল—ফলে আমরা হুমড়ি খাইয়া পড়ি। চলন্ত ট্রাম হইতে নামিবার সময় ঠিক ঐ দশাই ঘটে। যতক্ষণ অবধি ট্রামে আছি ট্রামের গতির মত সমস্ত দেহের ও একটা সম্মুখের দিকে গতি আছে। মাটিতে পা দিলে পায়ের গতি বন্ধ হয় কিন্তু মাথার দিকে গতি তৎক্ষণাৎ বন্ধ না হওয়ায় আমরা সামনের দিকে পড়িয়া যাই। ঘোড়ার উপর একজন বসিয়া আছে—ঘোড়া হঠাৎ দৌড় দিল। ঘোড়ার সম্মুখের দিকে যে গতি হইল সওয়ারের উপরের দিকে সে গতি তৎক্ষণাৎ পৌঁছিল না—ফলে মানুষ পিছন দিকে উল্টাইয়া পড়িল। এইবার এই রকমের এক সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটা গেলাসের উপর একখানা তাস রাখ—তাসের উপর একটা টাকা রাখ। এইবার

ক্যারম বোর্ডের ঘুটিতে যেমন টোক্কর মার তাসটাকে সেইরূপ টোক্কর দাও। এই কথা মনে হয় যে টোক্কর দেওয়ার ফলে তাস ও তাহার সঙ্গে টাকাটা মাটিতে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু দেখিবে তাসটা মাটিতে পড়িল—কিন্তু টাকাটা কিছুতেই মাটিতে পড়িবে না যত জোরে মার না কেন,—দেখিবে টাকাটা সব সময় এ গেলাসের ভিতর পড়িতেছে। ইহার কারণ এই যে টোক্কর দিলে তাসের একটা গতি হইল, কিন্তু সেই গতি তৎক্ষণাৎ টাকায় গিয়া পৌঁছিল না, তাস সরিয়া গেল কিন্তু টাকা সরিল না; তবে টাকার তলায় অবলম্বন না থাকায় টাকা সেই খানেই গেলাসের মধ্যে পড়িল। এইরূপে আর
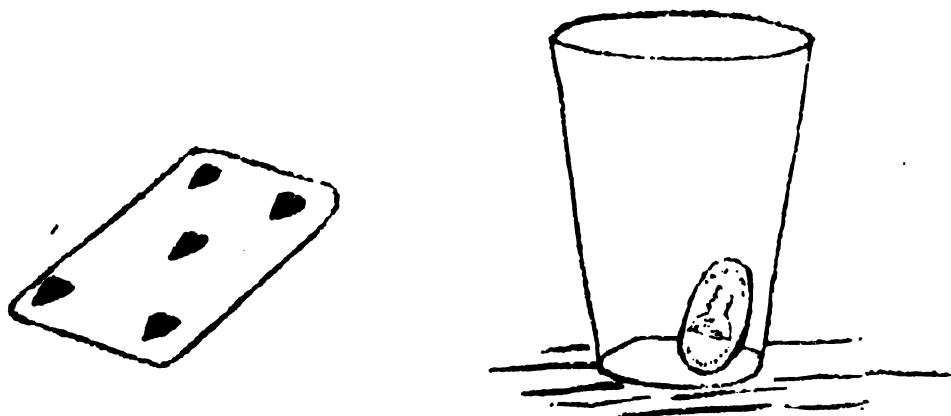
একটা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটী টেবিলের উপর থাক্ থাক্ করিয়া কতকগুলি টাকা সাজাইয়া রাখ। এইবার একখানা তাস বা একটা সরু কার্ডবোর্ড দিয়া যে কোন একটা টাকাকে জোরে আঘাত কর; দেখিবে মাত্র সেই টাকাটা বাহির হইয়া আসিল। বাকী টাকাগুলা সেই থাক্ ভাবেই সাজন রহিল। এই রূপে তোমার যে টাকাটা ইচ্ছা বাহির করিয়া আনিতে পার অথচ থাক্ ভাঙ্গিবে না। আরো একটা পরীক্ষার কথা বলা যাইতে পারে। টেবিলের উপর টেবিল ক্লথ আছে এবং তাহার উপর বাসন পত্র সাজান আছে। এটা অসম্ভব নয় যে কাপড়খানা

টানিয়া লওয়া হইল অথচ বাসন পত্র যথাস্থানে রহিয়া গেল। বালক বালিকাগণ যেন গোড়াতেই একেবারে এ পরীক্ষার চেষ্টা না করে, কারণ কাপড় যদি টান্ টান্ না থাকে, ও সব জায়গায় যদি জোর টান না পড়ে তো জিনিষপত্র গুলি ঠিকরাইয়া মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

এই বার একটা অঙ্কের কথা বলিব। যত ইচ্ছা টাকা, যত ইচ্ছা আনা, যত ইচ্ছা পাই মনে করিয়া লিখ। টাকার সংখ্যা ১১ র বেশী না হয়। ইহার তলায় ঐ সংখ্যাগুলি উল্‌টাইয়া লিখ—অর্থাৎ যত পাই ছিল টাকাটা তাই লিখ—আনা ঠিক থাকিবে—পাই এর জায়গায় লিখ যত টাকা ছিল। এইবার বড়টা হইতে ছোটটা বাদ দাও। বাদ দিয়া যা দাঁড়াইল তাহার তলায় ঐটা আবার উল্‌টায়া লিখ (টাকার জায়গায় পাই—আনা আনাই—পাইএর জায়গায় টাকা) এইবার দুইটা যোগ কর। যোগ ফল কত দাঁড়াইল বলিব ?

১২ টাকা ১৪ আনা ১১ পাই।

একটী উদাহরণ ধর।

আচ্ছা ধর মনে করা গিয়াছে ১০ টাকা ১৩ আনা ৭ পাই—ইহার তলায় রাখ—

৭ টাকা ১৩ আনা ১০ পাই—দুইটায় বাদ দাও। রহিল

২ টাকা ১৫ আনা ৯ পাই ; এর তলায় রাখ

৯ টাকা ১৫ আনা ২ পাই, যোগ কর। যোগ ফল হইবে ;

১২ টাকা ১৪ আনা ১১ পাই।

আশ্চর্য্য দেখিবে গোড়ায় যা ইচ্ছা মনে কর না কেন, দেখিবে শেষকালে ঐ ১২ টাকা ১৫ আনা ১১ পাইতে দাঁড়াইল। কেন এরূপ হয় ?

(ক্রমশঃ)

আগামী সংখ্যায় সচিত্র ভ্রমণকাহিনী
প্যারিশে কয়েক দিন।

একখানি চিঠি

কল্যাণীয়েষু—

তোমরা 'মুকুল' প্রকাশ করছ শুনে সুখী হলুম। 'মুকুল' নামটার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। মনে পড়ে, তখন সবে মাত্র দ্বিতীয় ভাগের 'কর্কট' 'শর্করা' ইত্যাদি কট্‌কটে শব্দ উচ্চারণের সময়তে পাঁচ বৎসর বয়সেই অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময় একখানা মুকুল আমার হাতে এসে পড়্‌ল। শিশুজীবনের সে অনুভূতি এখন আর নাই তবুও সে আনন্দের কথা আজও মনে পড়ে। তারপরে সেই অল্প কয়েকখানা পাতায় ভরে 'মুকুল' প্রতিমাসে আমাদের নতুন নতুন ডালি দিয়ে যেত, কিন্তু শিশুহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিট্‌ত না, মনে হোতো প্রতি সপ্তাহে যদি একবার কোরে মাসকাবার হোতো --।

শুনেছি 'মুকুল' প্রকাশ করার মধ্যে তাঁদের একটা বিরাট উদ্দেশ্য ছিল। ছেলে মেয়েদের নীতি-পরায়ণ কর্‌বার উদ্দেশ্যেই নাকি মুকুল প্রকাশ করা হয়। দস্তুর মতন নীতিশিক্ষা দেবার জন্য তখন একটা প্রতিষ্ঠানও ছিল। আমরা প্রতি রবিবার সকালে সেখানে গিয়ে নীতিশাস্ত্রের প্রধান সূত্রগুলি মুখস্থ কোরে আনতুম আর সমস্ত সপ্তাহ ধরে সেই সব নীতি-কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি কিনা বাড়ী থেকে তার একটা ছাড়পত্র নিয়ে যেতে হোতো। এই নীতি বিদ্যালয়ের সঙ্গে মুকুলের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই নীতির তাপে মুকুল ঝরে গেল, জানিনা নীতি বিদ্যালয়টা এখনো আছে কিনা, যদি উঠে গিয়ে থাকে তবে তার জন্য দুঃখ করবার কিছু নাই। কারণ নীতিশিক্ষা দেবার লোকের অভাব কখনো হয় না কিন্তু মুকুল ফুটিয়ে তোলবার মত প্রাণ দুর্ল্লভ।

তোমরা আবার মুকুল বার কর্‌ছ শুনে আবার আমার সেই শিশুজীবনে ফিরে যেতে সাধ হচ্ছে। কিন্তু দোহাই তোমাদের নীতির তাপে তোমরা 'মুকুল'কে শুকিয়ে মেরো না। মুকুল জীবনের অগ্রদূত, কিন্তু মনে রেখো ধরায় সে নতুন অতিথি, তার প্রাণ অতি কোমল, কোনো রকমের চাপ সহ্য করতে সে নারাজ।

ইতি—

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

অদ্ভুত বাক্স

(বিদেশী উপকথা)

একটি সৈন্য তালে তালে পা ফেলে রাস্তা দিয়ে আসছিল।

লড়াই থেমে যাওয়াতে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাড়ী ফিরছিল ; কাঁধে ছিল একটা মস্ত থলে, আর কোমরে এক লম্বা তলোয়ার। পথিমধ্যে এক বুড়ি ডাইনির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

ডাইনটা তাকে বল্লে "তুমি যদি এক কাজ কর্‌তে পার, তা'হলে তোমাকে আর কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না, যত ইচ্ছা টাকা তোমার হাতের ভেতর এসে পড়্‌বে।"

সৈন্য বল্লে "বহু ধন্যবাদ তোমায়, আমায় তা'হলে এখন কি কর্‌তে হবে ?" ডাইনি বল্‌তে লাগ্‌লো "ঐ যে বড় গাছটা দেখ্‌ছ, ওটার ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। তুমি একেবারে গাছটার উপরে উঠে গেলে একটা বড় গর্ত্ত দেখতে পাবে, সেই গর্ত্তটার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে একেবারে নীচে নেমে গেলে একটা পথ তোমার চোখের সামনে পড়্‌বে। এ সব কাজ কর্‌বার আগে তোমার কোমরে একটা দড়ি আমি বেঁধে দেব, কেননা দরকার বোধ হ'লে তুমি দড়িটায় টান দেবে, আমি বুঝ্‌তে পেরে তোমায় টেনে গাছের উপরে তুলে আনব। সৈন্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কিন্তু আমি গর্ত্ত দিয়ে নীচে নেমে যখন সোজা পথটা দেখ্‌তে পাব, তখন কি কর্‌বো ?"

ডাইনি বল্লে "পথটায় দেখ্‌বে শত শত আলো জ্বল্‌ছে। কিছুদূর গিয়ে দেখ্‌বে তিনটে দরজা রয়েছে। দরজায় চাবি ঝোলান থাকাতে ঢুক্‌তে কোন কষ্ট বোধ হবে না। প্রথম ঘরে গিয়ে দেখ্‌বে মেজের উপরে একটা সিন্দুক ও তার উপর একটা কুকুর বসে রয়েছে,—তার চোখদুটো ঠিক চায়ের বাটীর মত। তোমায় আমি একটুক্‌রো নীল কাপড় দেব, সেই কাপড়টার উপর কুকুরটাকে ধরে এনে

বসিয়ে দেবে, আর সিন্ধুক থেকে যত ইচ্ছা তাম্রমুদ্রা নেবে; কিন্তু যদি তুমি রৌপ্য মুদ্রা পেতে চাও তো পাশের ঘরেতে সোজা ঢুকে যাবে। সেখানেও সিন্ধুকের উপর তেল-কলের চাকার মতন চোখওয়ালা কুকুর বসে আছে। তুমি ভয় না পেয়ে আগেকার মত কুকুরটাকে নীল কাপড়ের উপর বসিয়ে দেবে,—এবং যত ইচ্ছা টাকা তুলে নেবে। আর যদি স্বর্ণমুদ্রা চাও তো' তার পাশের ঘরে সোজা ঢুকে যাবে, সেখানেও একটা কুকুরকে সিন্ধুকের উপর দেখতে পাবে,—তার চোখদুটো দুর্গের গোল গম্বুজের মত বড়। তার পর ঠিক আগেকার মত আমার নীল কাপড়ের উপর কুকুরটাকে বসিয়ে, যত খুশী স্বর্ণমুদ্রা তুলে নেবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কুকুরটা তোমার একটুও অনিষ্ট করবে না।"

সৈনিকটী বুড়িকে জিজ্ঞেস করলে "তুমি আমায় এই সব দামী কথা যে বলে দিলে, তার বদলে কি চাও?"

ডাইনি বল্লে "আমি অন্য কিছু চাই না, কেবল আসবার সময় আমার দিদিমার শেষ চিহ্ন চকমকির বাক্সটা আমায় এনে দিবে।"

তারপর বুড়ির কথামত সৈনিক কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে, গাছের উপর উঠে গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করলে, তারপর নীচে নেমে এসে দেখলে সত্যি সত্যি একটা রাস্তার ওপর শত শত আলো জ্বলছে। কিছুদূর গিয়ে দরজাটা খোলবার মাত্র দেখতে পেলে, চায়ের কাপের মত চোখওয়ালা বিশ্রী কুকুরটা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কুকুরটার পিঠ চাপড়িয়ে নীল কাপড়ের উপর বসিয়ে, পকেট ভর্ত্তি করে তাম্রমুদ্রা নিয়ে, কুকুরটাকে আগেকার জায়গায় বসিয়ে. দ্বিতীয় ঘরটায় প্রবেশ করলে। আচ্ছা মজা! তেল-কলের চাকার মত চোখওয়ালা কুকুরটাকে সে দেখতে পেলে, তারপর তাকে কাপড়ের উপর বসিয়ে, দেখতে পেলে সিন্ধুক ভর্ত্তি রূপোর টাকা। তখুনি পকেট থেকে আগেকার তামার মুদ্রাগুলো ফেলে দিয়ে, রূপোর টাকায় খালি পকেট দুটো ভর্ত্তি করে নিলে। তৃতীয় ঘরটায় ঢুকে বললে বাপরে বাপ! কি চোখ, কিন্তু কাপড়ের ওপর তাকে বসাতেই একেবারে চুপ। রূপোর টাকাগুলো

ফেলে দিয়ে টুপি, জুতো, জামা যেখানে যা পার্‌লে স্বর্ণ মুদ্রা ভরে নিয়ে অতিকষ্টে হাঁট্‌তে লাগলো। তারপর ডাইনিকে চেঁচিয়ে বল্‌লে "ওরে বুড়ি এখন আমায় টেনে তোল্।"

বুড়ি বল্‌লে "চক্‌মকির বাক্সটা এনেছিস্"

"ও ভুল হয়ে গেছে" বলে সৈনিক বাক্সটা নিয়ে আস্‌লে, বুড়ি তাকে টেনে তুল্‌লে।

বুড়ি বাক্স নিয়ে কি করবে, তা না বলাতে সৈনিক গেল মহাচোটে, তারপর রাগ সাম্‌লাতে না পেরে, ডাইনির মাথাটা তার লম্বা তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেল্‌লে।

বুড়িকে সেখানে ফেলে রেখে সে সহরের সব চেয়ে সেরা হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লো। এখন সে বড়লোক বলে একটা চমৎকার ঘরে আস্তানা নিলে, আর খুব দামী দামী খাবারের হুকুম দিলে। তার ছেঁড়া বিশ্রী বুট জুতো দেখে হোটেলের চাকর খুব খানিকটা হেসে নিলে,---এই সব দেখে শুনে সে পরদিন খুব ভাল পোষাক ও জুতো কিনে এনে একেবারে ফুলবাবু সেজে ফেল্‌লে। তাকে বড়লোক দেখে সেখানকার লোকেরা বহু নতুন খবর তাকে দিতে লাগ্‌লো, শেষে তারা তাকে রাজার সুন্দরী মেয়ের কথা বল্‌লে।

সৈনিক কোন রকমে উঁকিঝুঁকি মেরে মেয়েটিকে দেখ্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লে, তারা খুব জোরে হেসে বল্‌লে—মহাশয়! সে দিকে নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা দেখ্‌বার কোনও রকম উপায় রাখেন নি। তিনি সেই যে এক ভুঁইফোড় গণৎ-কারের কাছ থেকে শুন্‌লেন, যে তাঁর মেয়ের সঙ্গে একজন সাধারণ সৈনিকের বিয়ে হবে, সেই থেকে তিনি তাঁর মেয়েকে তামার-দেওয়াল ঘেরা রাজপ্রাসাদে রেখে দিয়েছেন। সেখানে রাজা ভিন্ন আর কেউ যেতে পারে না!—

(দুই)

সৈনিক গরীবদের টাকা দিচ্ছিল, ভালো দামী দামী পোষাক কিন্‌ছিল, -দু'হাতে মুটো মুটো টাকা খরচ কর্‌ছিল। শেষকালে সে দেখলে, তার কাছে মোটে দুটো

পয়সা রয়েছে ; বেচারা আর কি করে ! হোটেলের ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে একখানা ভাঙ্গা ছোট ঘরের কোণে বাস কর্‌তে লাগ্‌লো। সেখানে সে তার নিজের জুতো পরিষ্কার ও সেলাই কর্‌তো, বন্ধুবান্ধবরা তার কাছে গল্প ও দেখা সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌তো না !—

সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই অন্ধকারটা বেশ জমাট হয়ে পড়্‌লো, সৈনিকের ঘরে আলো ছিল না, বাতি কেন্‌বার পয়সাও ছিল না তার কাছে। হঠাৎ তার মনে পড়্‌লো সেই চক্‌মকির বাক্সটার কথা, তার মনে হ'ল বাক্সটার ভেতর বাতি টাতি হয়তো' থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। তখুনি বাক্সটা সে খুলে ফেল্‌লে—দেখ্‌লে হ্যাঁ বাতির একটা টুক্‌রো বাক্সটায় লেগে রয়েছে বটে ! একবার চক্‌মকি ঠুকে আগুন বের কর্‌বার সময় দুই একটা আগুনের ফিন্‌কি বেরুচ্ছিল, ঠিক সেইসময় বাক্সটার ঢাক্‌না খুলে গেল, আর তার ভেতর থেকে চায়ের কাপের মতন চোখওয়ালা কুকুরটা লাফিয়ে তার সাম্‌নে বসে সেলাম করে বল্লে "আজ্ঞা করুন।"

সৈনিক ভাব্‌লে ব্যাপার তো মন্দ নয়,—বাক্সটা যদি এইরকম হয় যখন যা দরকার তা যদি পাই, তা হলে তো' ভারী মজা—হাঃ হাঃ !

সৈনিক এক গাল হেসে বল্লে "কুছ তাম্বাকা পয়সা লে'আও।" কি আশ্চর্য্য ! কুকুরটা এক নিমেষের মধ্যে কেথা থেকে একটা পয়সা—ভরা থলে মুখেতে ধরে নিয়ে এল।

সৈনিক ভাব্‌লে কি সুন্দর ! সে বুঝতে পার্‌লে একবার আঘাত কর্‌লে তাম্র মুদ্রার সিন্ধুকের ওপর যে চায়ের কাপের মতন চোখওয়ালা কুকুরটা বসেছিল সেইটা বেরিয়ে এসে তার আজ্ঞা পালন কর্‌বো দু'বার কর্‌লে, রৌপ্যমুদ্রার সিন্ধুকের ওপর তেল-কলের চাকার মতন চোখওয়ালা যে কুকুরটা ছিল সেইটা আস্‌বে। তিন বার আঘাত কর্‌লে স্বর্ণমুদ্রার সিন্ধুকের ওপর যে দুর্গের গোল-গম্বুজের মতন চোখওয়ালা কুকুরটা ছিল, সেটা এসে তার সাম্‌নে হাজির হয়ে হুকুম তামিল কর্‌বে।

একদিন সৈনিক ভাব্‌লে রাজার মেয়েকে একবার দেখ্‌লে হয়, সে শুনেছিল রাজার মেয়ে খুব সুন্দরী।

বাক্সটা নিয়ে চক্‌মকি একবার ঠুক্‌তেই চায়ের কাপের মতন চোখওয়ালা কুকুরটা এসে তার সাম্‌নে বসে সেলাম করে বল্লে—"কি হুকুম?" সৈনিক বল্লে "আমি একবার সেই রূপবতী রাজকুমারীকে দেখ্‌তে চাই।"

কিছুক্ষণ পরেই ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পিঠে করে নিয়ে এসে কুকুরটা তার সামনে এল,—হ্যাঁ রাজকুমারী সুন্দরী বটে! কি চমৎকার তার চেহারা।

সৈনিক ভাব্‌লে একদিন সে তাকে নিশ্চয় বিয়ে কর্‌বে,—হ্যাঁ নিশ্চয় কর্‌বে, সে যে একজন বীর সৈনিক!

কুকুরটা কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটীকে রেখে ফিরে এল। তখন সকাল হয়ে গেছে।

রাজকুমারী রাজা ও রাণীকে বল্লে সে গতরাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছে; একটা কুকুর তাকে একজন সৈনিকের কাছে ধরে নিয়ে গেছে।

সেরাত্রে একজন পরিচারিকা রাজকুমারীর ঘরে জেগে বসে রইল। সৈনিকের আদেশে কুকুরটা সেরাত্রে এসে যখন রাজকুমারীকে পিঠেকরে নিয়ে পালাচ্ছিল, তখন পরিচারিকার নজর পড়্‌ল। সেও তৎক্ষণাৎ কুকুরটার পিছনে ধাওয়া কর্‌লে।

তারপর যখন কুকুরটাকে একটা বাড়ীর ভেতর প্রবেশ কর্‌তে দেখ্‌লে, তখন সে একটুক্‌রো খড়ি দিয়ে সেই বাড়ীটার গায়ে একটা ঢেড়া কেটে চলে গেল।

কুকুরটা রাজকুমারীকে আবার যখন পৌঁছে দিতে গেল, তখন ঢেড়াটা তার চোখে পড়্‌লো; সে-ও অমনি খড়ি দিয়ে, পাশাপাশি অনেকগুলো বাড়ীর ওপর ঠিক অবিকল সেইরকম চিহ্ন এঁকে দিলে।

পরদিন সকাল বেলায় রাজা ও রাণী এলেন, সেই পরিচারিকা ও লোকজন এল, কিন্তু সব বাড়ীতেই এক চিহ্ন দেখে তাঁরা সকলেই বোকা বনে গেলেন।

সেইদিন রাণী নিজে সিল্কের একটা থলি তৈরী করে তার ভেতরটা গমে

ভরে দিলেন ও সেই থলিটায় একটা ফুটো করে, সেটা রাজকুমারীর গলায় বেঁধে দিলেন। ভাব্‌লেন যখন কুকুরটা রাজকুমারীকে আবার নিয়ে যাবে, তখন ফুটো দিয়ে সমস্ত রাস্তায় গম পড়্‌তে পড়্‌তে যাবে, তারপর আর কি ! সেই গমের চিহ্ন দেখেই বাড়ীটা চিন্‌তে পারা যাবে।

(তিন)

কুকুরটা সে-রাত্রে রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার সময় সমস্ত রাস্তায় যে গম পড়্‌লো, তা লক্ষ্য কর্‌লে না।

সুতরাং পরদিন সৈনিকটী ধরা পড়ে গেল, ও তাকে তখুনি জেলের ভেতর রেখে দেওয়া হল।

সৈনিক জেলে বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো। কি বিশ্রী ঘুটঘুটে অন্ধকার এই জেলের ভেতরটা, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। সকলে বল্‌ছে কাল আমার ফাঁসি হবে, এখন কি করা যায়। চকমকির বাক্সটাও হোটেলের ঘরে ফেলে এসেছি।

পরদিন সকাল বেলায় সে ঘরের রেলিংএর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, কত লোক যাওয়া আসা কর্‌ছে। সে দেখ্‌লে সৈন্যের দল বাজনা বাজাতে বাজাতে চলেছে, সকলেই একরকম ছুটতে ছুটতে চলেছে। এক মুচীর ছেলে খুব জোরে যাচ্ছিল, সৈনিক তাকে ডেকে বল্লে "ওহে, আস্তে ছোক্‌রা ! এখানে শোন, তোমায় একটা কথা বলি।"

ছেলেটী আস্‌তেই সৈনিক বল্‌লে "হোটেলের অমুক ঘরে একটা চক্‌মকির বাক্স আছে, সেটা যদি আমায় এনে দিতে পার, তা'হলে পাঁচটী তাম্রমুদ্রা পাবে ; কিন্তু তোমার খুব তাড়াতড়ি একাজ কর্‌তে হবে। ছেলেটীর তখুনি ছুটে গেল ও কিছুক্ষণের মধ্যেই বাক্সটা তাকে এনে দিলে।

এইবার যে ব্যাপার হ'ল, চমৎকার।

সহরের বাইরে ফাঁসি দেবার জায়গায় রাজা রাণী থেকে সামান্য লোক সকলেই উপস্থিত হয়েছিল।

সৈনিকের গলায় যখন দড়ি পরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল,তখন সে বল্‌লে "যারা ফাঁসি যায়, তাদের শেষ একটা নির্দ্দোষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। আমাকে ও এই রকম একটা শেষ ইচ্ছা পূরণ কর্‌তে দেওয়া হোক্‌; আমি জীবনে শেষবার ধূম পান কর্‌বো।"

রাজা বল্লেন "আচ্ছা., ধূমপানটা হয়ে গেলেই তোমায় লট্‌কে দেওয়া হবে।"

সৈনিক তখুনিই তার চক্‌মকির বাক্সটা বের করে, তিনবার ঠুকে আলো জ্বাললে তার পর চায়ের কাপের মতন,তেল-কলের চাকার মতন ও দুর্গের গোল গম্বুজের মতন চোখওয়ালা তিন-তিনটে কুকুর এসে তাকে সেলাম করে সমস্বরে বলে "হুকুম করুন"।

সৈনিক চীৎকার করে বল্‌লে "আমায় রক্ষা কর" কুকুরগুলি তখুনিই বিচারক ও রাজকর্ম্মচারীদের কারুর একটা পা কাম্‌ড়ে, কারুর গলাটা কাম্‌ড়ে এত্‌ উঁচুতে ছুঁড়ে দিলে, যে তারা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল।

তারপর রাজা ও রাণীকে ধরে খুব উঁচুতে ছুঁড়ে দিলে। অনান্য লোকরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল ও সৈনিককে বল্‌লে "থামাও, থামাও, ওহে বীর সৈনিক; তুমি আমাদের রাজা হবে ও সুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়ে কর্‌তে পারবে।"

সুতরাং সৈনিক তার কুকুরদের থামিয়ে রাজার গাড়ীতে চেপে বস্‌লো আর কুকুর তিনটে গাড়ীর সামনে নাচতে নাচতে চল্‌লো।

আটদিন ধরে বিয়ের উৎসব চলেছিল!

চয়ন

জাপানের বিশ্বাস—জাপানীরা যখন গৃহে কিংবা অপর কোন জায়গায় টেলিফোন লয়, তখন টেলিফোন্ নম্বরের উপর তাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে; কেননা তাঁদের বিশ্বাস নম্বর অনুসারে টেলিফোন পয়া অপয়া হয়। ৮ ও ৩৫৭ নম্বরের টেলিফোন নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ও তারা এই দুটোর জন্য টেলিফোন আফিসে খুব দর দিতে থাকে। জাপানে তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম জন্মদিনে শিশুদের দেবতার নিকট নিবেদন করা হয়, সেই জন্য ৩৫৭ নম্বর জাপানে এত পয়া বলে মনে করা হয়। আবার ৪২ ও ৪৯ নম্বরকে অপয়া বলে কেউ নিতে চায় না; জাপানী ভাষায় ও দুটো নম্বরের নাম সিনি (বা মৃত্যু) এবং সিকু (বা বিপদ ও কষ্টভোগ)। এই দুটো নম্বরের টেলিফোন পাগলা গারদ ও পুলিশের থানা ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

অদ্ভুত আইন—জগতের কত দেশে কত রকম যে অদ্ভুত আইন আছে, তার ঠিক নেই। কোপেনহেগেন ডেনমার্কের রাজধানী,—সেখানে সহরের রাজপথে কেউ যদি মাতাল হয়ে পড়ে, তা'হলে পুলিশ তাকে কিছু না বলে গাড়ী করে বাড়ীতে দিয়ে আসবে; কিন্তু যে দোকানে মদ বেচা হয়েছিল, সেই দোকানের মালিকের কাছ থেকে পুরো গাড়ী ভাড়াটি আদায় করে নিবে।

চোর ধরবার কল—এ কলে একবার পড়লে চোর বেচারার আর পরিত্রাণ নেই। যন্ত্রটি একটি ছোট বাক্সের ভিতর রেখে এক গাছা খুব সরু তার দিয়ে দরজা বা জানালার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়; তারপর তারটা একটি সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। চোর ঘরে প্রবেশ করলেই তৎক্ষণাৎ আপনা—আপনি একটি বাতি টেলিফোন আফিসে জলে উঠবে, তারপর কাল বিলম্ব না করে তাঁরা পুলিশে সংবাদ দিবেন। চোর চুরি করতে যাবার সময় অনেক রকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, আর সে যদি চতুর হয়, তা'হলে সে টেলিফোনের তার কেটে ফেলবে; কিন্তু তাতেও পালাবার উপায় নেই, টেলিফোনে শব্দ হয়ে গৃহস্থকে সজাগ ও সাবধান করে দিবে।

বাসনমাজা দেরাজ—বিলাত ও আমেরিকার এমন হোটেল আছে, যেখানে প্রত্যহ হাজার হাজার লোক আহার করে; এই বাসন মাজা দেরাজের জন্যে তাদের খুব সুবিধা হয়েছে। এই কলটা দেখতে অনেকটা দেরাজের মতন,—ভিতরে কতকগুলি

কুঠ্রীর মতন আছে। এই কলটায় কাচের বাসন পর্য্যন্ত চমৎকার পরিষ্কার হয়, একখানিও ভেঙ্গে যায় না। কলটা চালিয়ে,—বাসন, গেলাস, প্লেট্ যা'হোক একটা কুঠ্রীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়, তারপর কল আপনা আপনি কোনও রকম শব্দ না করে কাজ করে যাবে। প্রথমে একটা কুঠ্রীতে বাসনের এঁটোগুলো পরিষ্কার হয়, দ্বিতীয় কুঠ্রীটায় জলের বন্দোবস্ত থাকায় বাসনগুলো ধুয়ে যায়, তৃতীয় কুঠ্রীটায় বাসনগুলির গা পরিষ্কাররূপে মুছে শুষ্ক হয়ে যায়। বিলাত ও আমেরিকায় এই কলের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

সোলার ছিপি—সোলার ছিপি খুব হাল্কা ও নরম জিনিষ হলেও ধারালো ইস্পাতের ছুরিকে অতি শীঘ্র ভোঁতা ও অকেজো করে দেয়। এই কারণে বিলাত ও আমেরিকায় যন্ত্রের দ্বারা অধিকাংশ অপরাপর কাজ করলেও এই ছিপি তৈরি হয় মানুষের হাতেই। স্পেনে কর্ক-ওক্ নামে এক রকম গাছ জন্মায়, তারই বল্কলে ছিপি তৈরি হয়; প্রত্যেক কারিকর ছুরি ও শানপাথর নিয়ে কাজ করতে বসে ও বল্কল কাট্‌তে তার যতখানি সময় লাগে, ছুরিতে শান দিতেও তার ঠিক ততখানি সময় খরচ হয়।

তোমরা কি জান

—মশার মুখে গোণা বাইশটি দাঁত আছে?

—উড়ো জাহাজ অর্থাৎ এরোপ্লেন আকাশে ওড়্‌বার সময় হাজার হেলুক দুলুক, ভিতরে বসে থাক্‌লে হাতের গেলাসভরা জল চল্‌কে যায় না?

—এক বৎসরে একটা কাক সাত লাখ্ কীট ধ্বংস করে?

—একটি মানুষের দেহে প্রায় পঁচিশ হাজার লোম-কূপ আছে?

—বিলাতে ক'বছর থেকে ইঁদুরের চামড়ায় দস্তানা ও চটিজুতা ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে?

—সারা পৃথিবীতে আন্দাজ দু'হাজার রকমারি জাতের পিঁপড়ে আছে?

—দু'বছর বয়স হবার পর কুকুরের দেহের বাড় থেমে যায়?

—সমুদ্রের শুক্তিরা সচরাচর দশ বৎসরের পরমায়ু ভোগ করে থাকে?

—লণ্ডন সহরে নব্বই বৎসর আগে শোধিত জল সরবরাহ করা হত না?

—বাতাসের বেগ তখনি বেশী বেড়ে ওঠে, যখন তার বেগ কমে আস্‌বার উপক্রম হয়?

—একটী মাত্র লেবুগাছ আটহাজারের বেশী লেবু দেয় না, কিন্তু একটীমাত্র কমলালেবুর গাছ কুড়িহাজারেরও বেশী কমলা দেয়।

—সারা ইউরোপে পাঁচহাজার জাতের ফুল পাওয়া যায় কিন্তু কেবল ভারতবর্ষেই ফুল পাওয়া যায় অন্ততঃ দশ হাজার জাতের?

—দক্ষিণ আফ্রিকা ফুলে আর-সব দেশকে হারিয়ে দিয়েছে, সেখানে প্রায় দশ হাজার দু'শো ত্রিশ জাতের ফুল আছে?

—পাঁচজনের সঙ্গে বসে থাক্‌বার সময়, চোখে চশমা পরা চীনদেশে অসভ্যতা ব'লে বিবেচনা করা হয়?

—বিলাতের উত্তর সাগরে অর্থাৎ নর্থ সি-তে যত বেশী মাছ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন সমুদ্রে তত বেশী মাছ পাওয়া যায় না?

—মানুষের হাতের মাংসপেশীর তুলনায়, পাখীর ডানার মাংসপেশী আকার অনুসারে কুড়িগুণ বেশী জোরালো?

কাজের কথা

শিশুদের অসুখে কোন চট্‌চটে ওষুধ খাওয়াবার সময়, চামচে খানিকে আগে গরমজলে ডুবিয়ে নেওয়া দরকার; তারপর সেই চাম্‌চেতে ওষুধ নিলে, পরে চাম্‌চেতে ওষুধ আর লেগে থাকবে না।

কীট-পতঙ্গ দেহের যেখানে দংশন করে বা হুল ফুটিয়ে দেয়, সেখানে কাঁচা পেঁয়াজের রস দিলে যন্ত্রণা কমে যায়।

দেহের কোন জায়গা পুড়ে বা আগুনের তাপে ঝল্‌সে গেলে, কাঁচা ডিমের শ্বেতাংশ তার উপর লাগিয়ে দিলে প্রদাহ কমে যাবে।

দেহের কোন জায়গা কেটে বা ছড়ে বা থ্যাঁৎলাইয়া গেলে, মাখন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

দাঁতের ব্যথায় এক টুক্‌রো পরিষ্কার ন্যাকড়া টার্পেনটাইন তেলে ও জলে ডুবিয়ে ব্যবহার করলে ব্যথা সেরে যায়।

দেহের কোন স্থানে মৌমাছি বা বোল্‌তা কামড়ালে, মাটী আর জলে গুলে আহত স্থানের উপর প্রলেপের মতন মাখিয়ে রেখে, একখানি ন্যাকড়া দিয়ে সেটা ঢেকে রাখ্‌লে জ্বালা কমে যাবে।

আলুমিনিয়ম সাফ কর্‌বার পক্ষে সাবানজল ভালো, কিন্তু সোডা ভয়ানক অপকারী।

রঙীন কাপড় জামা রোদে না দিয়ে ছায়ায় হাওয়ায় শুকিয়ে নেওয়া ভালো, কারণ সূর্য্যের তাপ রঙীনকেও ধীরে ধীরে সাদা করে আনে।

মার্ব্বেলের জিনিষের রং জলে গেলে ভিজে নুনের গুঁড়ো দিয়ে মেজে নিলে আবার চক্‌চকে হয়ে যাবে।

কাশ্মীর নিশৎবাগ

কান্তিক প্রেস—কলিকাতা।
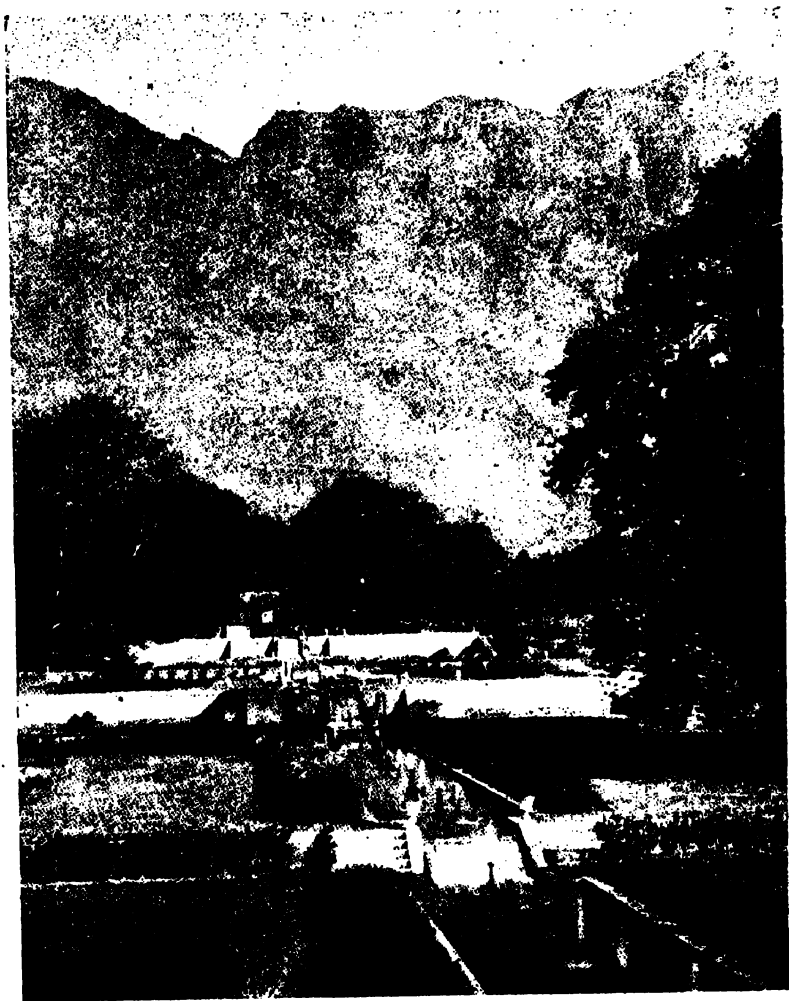
তাল গাছ

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একবারে উড়ে যায়,
কোথা পাবে পাখা সে ?
তাই ত সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।
সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা পত্তর
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও !
তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
সেইভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

রংমশাল ৩য় বর্ষ ১৩২৯

১ম বর্ষ । আশ্বিন, ১৩৩২ । তৃতীয় সংখ্যা

শারদ লক্ষ্মী

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

তার অপ্‌রাজিতার শাড়ী বাঁধা বিনারে
লোটে শিউলি বোঁটায় রাঙা পা'র কিনারে
তার হাসি-ফাঁদে বাঁধা পড়ে চাঁদ ও নাকি ?
তার নিশি-কালো এলো চুলে জ্বলে জোনাকি
খোলে কুমুদের কলি তার মৃদু মুঠিতে
তার পদ্মের পাপ্‌ড়ি যে চোখ্‌ দুটিতে
তার দুল হ'য়ে, কুরুবক-ফুল্‌—গরবী
তার বক্ষের হারে গাঁথা শ্বেত্‌ করবী

তার আলো পরী চলে লঘু মেঘ্‌-নৌকায়
তার পাখা কাঁপা প্রজাপতি ঐ মৌ খায়
কোথা মন্‌-ভোলা ঝিঁঝি তার গায় পূরবী
তার কেতকীর বাসে হ'লো বায়ু সুরভি
তার কিরণের ওড়্‌নায় জরি রূপালি
তার জ্যোৎস্নায় বসুধার সুধা-দীপালি
তার আঁখি-কোণে ক্ষণে ক্ষণে জল তবু যে
তার মাঠে মাঠে কোলাকুলি সোনা—সবুজে

এলে কে তুমি গো গেহ ভরি স্নেহ-মধুতে
ধরে কাশের চামর তব দিক্‌-বধূতে
তুমি শিশিরে যে দিলে ধুয়ে সব কালোকে
তুমি রঙ্‌-রামধনু দিলে বালা-বালকে
তুমি পরিয়াছ ভালে টিপ্‌ হেম-গোধূলির
তব আগমনী আঁকা, পাতে আম-কদলীর
ওই রূপ দেখি বারে বারে, শুনি রাণী গো
আয় শরতের লক্ষ্মীটি, আয় রাণী গো।

হাসি-কান্না

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

১

রাণী বনে গেছেন বসন্ত উৎসব করতে। সখীদের হাসি-বাঁশী, গানে-গল্পে বন মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বন নিজেও তাঁদের এই আনন্দে সাড়া দিতে দ্বিধা কর্‌লে না। তার নিজের বুকের হাসি সে ফুটিয়ে তুল্‌লে হাজার ফুলের মুখের ভেতরে, লতা-পাতা ঝোপ-ঝাড়ের বুকের ওপরে। পলাশের হাসির আগুনে সমস্ত বন রাঙা হ'য়ে গেল, থোকা থোকা অশোকের মুখে হাসির টুক্‌রোগুলো ফুটে, উঠে দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। যূথী হাস্‌ল, অপরাজিতা হাস্‌ল, সূর্য্যালোকে বনের পাতা হাস্‌ল, গাছের মাথা হাস্‌ল। এমনি ক'রে সারা বনের ভেতর কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও সাদা, কোথাও বা হরিৎ হাসির বান জাগ্‌ল। বসন্তের তারুণ্যের সোণার কাঠির স্পর্শে তাজা তরুণ বন এমনি ক'রে রাণীর মন ভরিয়ে দিলে, চোখ জুড়িয়ে দিলে, উৎসব তাঁর অজস্র আনন্দের ভেতর দিয়ে সার্থক হয়ে উঠ্‌ল।

সারা দিন উৎসব ক'রে রাণী মনের ভিতর উচ্ছ্বসিত উদ্দীপ্ত হাসির স্বপ্ন নিয়ে বাড়ী ফিরে চল্‌লেন। এই উৎসবের পেছনে বনের ভেতর যে অশ্রুর অন্ধকার জেগে উঠ্‌ল তা আর তাঁর চোখে পড়্‌লনা। আর সেই অন্ধকারের ওপর করুণ সহানুভূতির প্রলেপ

বুলিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা যে কেমন ক'রে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌লে তা-ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

২

কিন্তু প্রাসাদে পা দিয়েই তাঁর মন বিগ্‌ড়ে গেল। তাঁর হাসির স্বপ্নের মাঝে ঘোরালো হ'য়ে জেগে উঠ্‌ল বাস্তব জগতের অভাব অভিযোগ, দুঃখের কান্না, স্বার্থের সংঘাত, হিংসা-দ্বেষের হানাহানি। মানুষের মনের দুয়ারে এগুলো স্তূপের পর স্তূপীকৃত ক'রে সাজানো রয়েছে। আর তারি আঁচে মানুষের চোখে মুখে আনন্দের উৎস, হাসির ঝরণা শুকিয়ে ম'রে গেছে।

রাণী বিরক্ত হ'য়ে রাজাকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন। রাজা এসে রাণীর দরবারে হাজির হ'তেই রাণী বল্‌লেন্—মহারাজ, তোমার রাজ্যের ভেতর এত গুমোট কেন? হাসির যে অজস্র উৎস আমি বনের ভেতর প্রকৃতির মুখে দেখে এলুম, তোমার রাজ্যের ভেতর তার চিহ্নটুকুও নেই। প্রকৃতির রাজ্যের প্রজারা যদি এত হাস্‌তে পারে, তোমার রাজ্যের প্রজারা কান্নার ভেতর এত ডুবে থাক্‌বে কেন? এই কান্নার কল-কোলাহল আর আমি সইতে পার্‌ছিনে। তুমি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা কর।

মহারাজ হেসে বল্‌লেন—রাণী, পৃথিবী তো হাসি-কান্নার দোলাতেই দুল্‌ছে। তুমি কান্না থামিয়ে হাসিকেই যদি বজায় রাখতে চাও তবে তাতে অশান্তিকেই বেশী ক'রে তাজা ক'রে তোলা হবে। অতএব এ খেয়াল পরিত্যাগ কর।

রাণী বল্‌লেন, তা হয় না মহারাজ! হাসির যে রূপ আমার চোখে পড়েছে, সে রূপ আমার শিরার ভেতর রক্তের কণা-গুলোকেও মাতাল ক'রে তুলেছে। সেই হাসির রূপ আমি তোমার রাজ্যের প্রত্যেকটি লোকের মুখের উপর প্রতিফলিত দেখতে চাই।

মহারাজ বল্‌লেন—সে কি করে হবে?

রাণী বল্‌লেন—কেন রাজ্যের ভেতর ঘোষনা ক'রে দাও, হাসি ছাড়া যার চোখে আজ থেকে জলের চিহ্ন ধরা পড়্‌বে এরাজ্যের ভেতর আর তার স্থান হবে না। চুরী করার শাস্তি যেমন কারাদণ্ড, নর-হত্যার শাস্তি যেমন ফাঁসী, এ রাজ্যের কান্নার শাস্তি হবে তেমনি নির্ব্বাসন।

রাজা বল্‌লেন—মহারাণী, তুমি প্রজার মা হ'য়ে যখন, একথা মুখে আন্‌তে পার্‌লে

আমি তখন আর তোমাকে বাধা দেবো না। তোমার আদেশ আমি রাজ্যের ভেতর ঘোষণা ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু আমি ব'লে রাখ্‌লুম, তুমি লোকের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে যে আইন জারি কর্‌ছ, সে আইন অশ্রুর পাথারেই জোয়ার জাগাবে এবং এর প্রায়শ্চিত্তের সময় যখন আস্‌বে, তার শিখা মহারাণীকেও দগ্ধ কর্‌তে দ্বিধা কর্‌বে না।

৩

রাজার কথাই সত্য হ'ল। রাণার আদেশে মুখের উপর হাসি ফুটাতে গিয়ে প্রজার মনে সোয়াস্তি রইল না, চলা-ফেরা আড়ষ্ট কৃত্রিম হ'য়ে উঠ্‌ল। যার মন দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়েছে সে তার মুখের ওপরকার বিষাদের ভার জোর ক'রে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু এই হাসি হাস্‌তে তাকে যে কস্‌রৎ কর্‌তে হয় তাতে হাসির পাশে পাশে ঝর্‌তে থাকে বুক-ফাটা বেদনার দীর্ঘশ্বাস। দীন দুঃখী নিরন্নের মুস্কিল হ'ল আরো বেশী। পেটে অন্ন নাই, বুক তাদের হাহাকারে ফেটে পড়্‌ছে; তবু কেঁদে যে বুকটা একটু হাল্‌কা করে নেবে তার জো নেই। দুঃখের আর্ত্তনাদ তাদের বুক ফেটে যেই বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চায় অমনি তাদের কানের কাছে বাজতে থাকে রাণীর নিষেধ আর সেই আর্ত্তনাদ তাদের ফুটে ওঠে হাহা হাহা অট্ট হাসিতে। সে হাসি কি হাহাকার তা বোঝ্‌বার উপায় থাকে না। এমনি করে রাজ্যের ভেতর হাসির রং বদলে গেল, আনন্দের রূপ ঝল্‌সে গেল। মানুষের মুখে যেখানে যে তাজা তরুণ সবুজের চিহ্ন ছিল তা ম'রে ঝ'রে শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে গেল। কোন্‌টা যে হাসি আর কোন্‌টা যে কান্না তা বোঝবার উপায় রইল না। দলে দলে লোক রাজ্য ছেড়ে পালাতে আরম্ভ কর্‌লে। নির্ব্বাসিত কর্‌বার আগে তারা নিজেরাই নির্ব্বাসনকে বরণ ক'রে নিলে।

মন্ত্রী এসে বল্‌লেন,—মহারাজ, রাজ্য রসাতলে যায়, আপনার এ আদেশ ফিরিয়ে নিন্।

রাজা বল্‌লেন—মন্ত্রী এ আদেশ তো আমার নয়, তোমাদের রাণীর, তোমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করো।

মন্ত্রী অন্তঃপুরে এত্তলা পাঠিয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা ক'রে বল্‌লেন, মহারাণী, আপনি রাজ্যের মা, মা যদি রাজ্য ধ্বংস কর্‌তে চান কেউ বাঁচাতে পার্‌বে না। আপনার অন্তত

আদেশ ফিরিয়ে নিন্। মানুষকে কাঁদ্‌বার অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন না। কর্‌লে রাজ্য কখনো টেকাতে পার্‌বেন না।

রাণী উত্তর দিলেন—হাসির রাজত্বে যদি বাস কর্‌তে না পারি, তবে কান্নার রাজত্বে বাস কর্‌বার আমার এতটুকুও লোভ নেই। যারা হাস্‌তে জানে না তারা রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেলেও রাজ্যের তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

মুখ ম্লান ক'রে মন্ত্রী রাণীর দরবার হ'তে ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন।

৪

কিন্তু রাজপুরীতেই একদিন হাসির দীপ্তি নিভে গেল। সমস্ত পুরী একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কার অন্ধকারে ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল মৃত্যু-শয্যায় শায়িত শিশু রাজ-পুত্রকে নিয়ে। রাণী নিজেও সেদিন ভুলে গেলেন বসন্ত উৎসবের সেই হাসির কথাটা, যে হাসির জন্যে গোটা রাজ্যের ভেতর একটা বিভীষিকার সৃষ্টি কর্‌তেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তাঁর মুখ হ'য়ে উঠল আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর, আর চোখ হ'য়ে গেল শীতের ভোরের কুজ্ঝটিকার মত অশ্রু ভারে ঝাপ্‌সা।

রাজার বুকের দুলাল, রাণীর নয়নের মণি—সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হল না। কিন্তু শিশুকে শত চেষ্টাতেও ধ'রে রাখা গেল না।—রাণীর কোলের ভেতরেই শিশু একবার চমকে উঠে' রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মৃদু কণ্ঠে ডাক্‌লে—মা—তার পর বাতাসের দম্‌কা হাওয়ায় ফুলের পাপ্‌ড়ি যেমন ক'রে ঝ'রে পড়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে তেমনি করে কুমার তার পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত চোখ্ দুটো সেই যে মুদ্রিত করে ফেল্‌লে—সে চোখ আর খুল্‌লে না। রাণী শোকের ঘায়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে মহারাজের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌লেন।

* * * * *

শোকের প্রথম ধাক্কা শেষ হয়েছে। কিন্তু রাণীর চোখের জলের ঝরণা এখনও

শুকিয়ে যায়নি। চোখ বুজ্‌লেই তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে আধ ফোটা বসরাই গোলাপের মত রাজকুমারের সুন্দর মুখখানা আর তাঁর চোখ জলে জলে ভ'রে ওঠে।

রাণী হাস্‌তে চান্ কিন্তু কই তিনিতো হাস্‌তে পারেন না ! শোকের ব্যথাটা চেপে যদি কখনো হাস্‌তে চেষ্টা করেন, তবে যে ধারা রোধ কর্‌বার জন্য চেষ্টা, সেই ধারার বেগই আরো দ্বিগুণ হ'য়ে জেগে ওঠে।

সেদিন কুমারের কথা মনে ক'রে রাণীর চোখে বন্যার ধারা বইতে সুরু করেছে এমন সময় রাজা এসে বল্‌লেন, রাণী—এইবার তোমার দণ্ড গ্রহণ করো।

রাণী চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—কিসের দণ্ড ?

তুমি আদেশ দিয়েছিলে, তোমার রাজ্যের ভেতর কেউ চোখের জল ফেল্‌তে পারবে না, যে ফেল্‌বে তাকে নির্ব্বাসিত করা হবে। তোমার আদেশ তুমি নিজেই লঙ্ঘন করেছ। সুতরাং তোমাকে দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হবে।

রাণী রাজার দিকে বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে বল্‌লেন —কিন্তু আমি যে রাজ্যের রাণী !

একটু ম্লান হেসে রাজা উত্তর দিলেন—কিন্তু আইনের কাছে-তো রাজা-রাণীর প্রভেদ নেই। তোমাকে শাস্তি গ্রহণ করতেই হবে। তবে আমি তোমাকে এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ কর্‌তে পারি, যদি কখনো সত্যিকার হাসির উৎসটা জয় কর্‌তে পার, তবে রাজ সিংহাসন আবার তোমাকে তার রাণী বলে গ্রহণ কর্‌তে দ্বিধা কর্‌বে না।

রাণীর চোখের কোণে আবার জলের ধারা উছলে উঠ্‌ল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে কেবল বল্‌লেন—বেশ !

রাণীর স্তব্ধ মুখের দিকে ব্যথা-বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজা তাঁর মন্দির হ'তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

৫

রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রান্ত সীমায় এক খানা ক্ষুদ্র কুটীরে রাণী তাঁর নির্ব্বাসনের দিন যাপন কর্‌ছেন। যে চোখের জলকে তিনি চিরদিন জীবনের বাইরে রাখ্‌তে চেয়েছেন সেই চোখের জলই আজ তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু এ যে কেবল দুঃখের পাথারে গড়া, সে কথা আজ আর তাঁর মনেও হয় না। এখন তিনি শুধু মনে মনে ভাবেন, চোখের জল যদি তাঁর না থাক্‌ত তবে তাঁর কি উপায় হ'ত ! এ যে সান্ত্বনার প্রলেপে ভরা ! এ যে বুকের ওপর হ'তে শোকের ভারি পাথরটা নামিয়ে রেখে তাকে হাল্কা ক'রে তোলে।

দিন আসে দিন যায়। কর্ম্মহীন নিরালা জীবন রাণীর আর ভাল লাগে না। বুকের ভেতর যে হাহাকার জেগে ওঠে কাজ দিয়ে তবু তাকে কাবু ক'রে রাখা যায় কিন্তু অকাজের ভেতর শোকের ঝড়ে জীবন যে একবার হাঁপিয়ে ওঠে—দিন আর শেষ হ'তে চায় না, রাতের অন্ধকার নিবিড়তর হ'য়ে চোখের সম্মুখে জেগে থাকে!

রাণী ব্রত গ্রহণ কর্‌লেন।—চোখের জল ঢেলে চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার ব্রত। যাদের মুখে ক্ষুধার অন্ন ছিল না রাণী তাদের মুখে অন্নের গ্রাস তুলে দিলেন, রোগে যারা পথের ধারে পড়ে ক্ষুধায় ছট্ ফট্ কর্‌ছিল, রাণীর স্নেহ-কোমল চোখের দৃষ্টি দিনের পর দিন তাদের শিয়রে ধ্রুবতারার মত জেগে রইল। শোকে যাদের বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে রাণীর চোখের জল তাদের চোখের জলের সঙ্গে মিশে সান্ত্বনার শতদল ফুটিয়ে তুল্‌লে। এই রকম করে রাণীর চার পাশে গ'ড়ে উঠ্‌ল এক অপূর্ব্ব সুন্দর স্নেহের রাজত্ব। সেখানে চোখের জল ঝর্‌বার বিরাম নেই, কিন্তু সে চোখের জলের ভেতর দিয়ে হাসির দীপ্তি ঝ'রে পড়ে, সান্ত্বনা ও আনন্দের মণি-মুক্তা দোল খায়।

৬

সেদিন রাজা মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। বন হ'তে বনান্তরে ঘুরে' শীকার না পেয়ে রাজার মন বিরক্তিতে ভ'রে উঠেছে, হঠাৎ এমন সময় তাঁর চোখের সাম্‌নে দিয়ে একটা হরিণ বিদ্যুতের দীপ্তি হেনে চলে গেল। রাজা তূণ হ'তে বাণ তুলে নিয়ে অদৃশ্য হরিণের গতিপথ লক্ষ্য ক'রে ধনুকে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শর ধনুকের ছিলা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর তার পরেই একটা করুণ আর্ত্তনাদ অসির আঘাতের মত বনের বুক চিরে দিয়ে কান্নর মত করে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু একি এতো হরিণের আর্ত্তনাদ নয়! -এ যে মানুষের চীৎকার! রাজার বুকের ভেতর রক্তের স্রোত টগ্‌ বগ্‌ ক'রে ফুট্‌তে লাগ্‌ল। তিনি হাতের ধনুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে চল্‌লেন সেই চীৎকার ধ্বনি লক্ষ্য ক'রে, লতাগুল্ম দ'লে, কাঁটার বন মথন ক'রে।

বন পেরিয়ে মাঠে পড়্‌তেই তাঁর চোখ বিস্ময়ে জ্ব'লে উঠ্‌ল, পা স্থাণুর মত হ'য়ে থেমে গেল। তিনি দেখ্‌লেন বনের প্রান্তে তাঁরি মহারাণীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে একটি বালক; তাঁর হাতের নিক্ষিপ্ত শর তার পঞ্জর ভেদ ক'রে চ'লে গেছে,

কিন্তু তবু তার মুখে ভয়ের রেখাটিও নেই। সূর্য্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়্লে যেমন তার দীপ্তি মেঘের কিনারা গুলোতে জরির পাড় পরিয়ে দিয়ে যায়, বালকের ম্লান মুখে তেমনি একটি উজ্জ্বল হাসি এবং পরিপূর্ণ আশ্বাসের আভা ফুটে উঠেছে। আর সেই বালককে বুকের উপর তুলে নিয়ে নির্ব্বাসিত রাণীর চোখে জলের লেখা চক্ চক্ কর্‌ছে।

* * * *

রাজা বল্‌লেন—রাণী এইবার ফিরে চলো তোমার রাজ্যে। হাসিকে চিরন্তন ক'রে ধরে রাখ্‌বার সাধনায় তুমি জয় লাভ করেছ।

রাণী বল্‌লেন,—রাজা, আমি হাসির রাজত্বে বাস কর্‌তে চেয়েছিলুম। চেয়ে দেখ, আমার এই রাজত্বে, অন্ধকারের বেদনাকে করুণ হাসির আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তু'লে জ্যোৎস্না হাস্‌ছে, ফুলের বুকে গাছের মাথায় হাসির হীরে-মাণিক দুল্‌ছে; আর আমার চার পাশে যারা ভিড় করে আছে তাদের মুখেও হাসির বান কূল ছাপিয়ে দিক্ ভাসিয়ে জেগে উঠেছে। সুতরাং তোমার রাজ্য বা রাজ-সিংহাসনের ওপর আমার আর কোনই লোভ নেই।

নদীপথে

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

১

আজ, ফেনিলোচ্ছল জলকল্লোলে
বিহঙ্গ-কলকূজনে,
প্রভাত না হতে টুটে গেল নিদ্ নয়নে!
আঁকা বাঁকা এই নদীর দু'ধারে,
নানা তরুলতা শোভিছে কাতারে,
তাদের গোপন গন্ধ আমারে
হাওয়া এনে দেয় মাতিয়া!
তাই, ভেঙে-যাওয়া ঘুম আবার আসে গো ভাসিয়া!

২

ওই, সেফালি-বিতানে আকুল বাতাস
কোন্ বাণী বহি বিহরে
পুলকে আমার সারা প্রাণ মন শিহরে !
এ যেন মাটির স্নেহ-আহ্বান,
ছুটে যেতে চায় আকুল পরাণ,
জল-উচ্ছ্বাসে প্রলয়-বিষাণ
শোঁ-শোঁ রবে ওঠে বাজি' রে !
ওরে, কাজ নেই জলে, বুক পেতে দিব মাটিরে।

৩

মোরা, স্নেহ-বন্ধনে যুক্ত বলিয়া
মাটি দেখে উঠি পুলকি' !
তারে ছেড়ে থাকা জীবনে কখনো ভালো কি !
সেথা লোকালয়ে কত না আদর,
স্নেহালাপে হিয়া রহে যে মুখর।
নর নারী সবে মধু-অন্তর
জাগে কত নিশি পোহাতে।
তাই, মন কাঁদিতেছে মাটির গভীর মায়াতে !

বাঁশী

[শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়]

এক সহরে একজন লোক বাস করত। লোকটির যেমন ধনদৌলত টাকা পয়সা, তেমন সম্মান। আচারে ব্যবহারে কথায়বার্ত্তায় বড় চমৎকার, সব সময়ই হাসিখুসী। তাদের স্বামী স্ত্রীর মনে ভারী দুঃখ যে, তাদের কিছুরই অভাব নেই কিন্তু এত সব ভোগ করবে কে? একটি ছেলেমেয়েও নেই। অনেকদিন বাদে তাদের একটি সুন্দর মেয়ে হল। মেয়ে পেয়ে যে তারা কত খুসী হল তা বলা যায় না। দেখতে দেখতে-চাঁপা ফুলের কলিটির মত মেয়েটি বড় হল।

মেয়ের বয়স যখন আটবছর তখন একদিন তার মা অসুখে পড়ল, আর উঠল না। তার গোলাপের মত সুন্দর মুখখানা মরণের ঠাণ্ডা লেগে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। বাড়ীর পাশে, বাগানের ধারে তার ফুলের মত দেহখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

স্ত্রীর মরণে লোকটি কেঁদে কেটে একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। খায় না দায় না, কেবলি দিন রাত্তির কেঁদে ভাসিয়ে দিতে লাগল। ক'দিন একটা কুটা পর্য্যন্ত দাঁতে দিলেন না, মেয়েটি কিন্তু একবার কাঁদলও না, মুখ বুজে বাপের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দিন যায়। ক্রমে লোকটি আপনার কাজকর্ম্মে মন দিল। স্ত্রীর কথাও দুদিনে ভুলতে চেস্টা করল। যে লোক একটু সময় পেলেই স্ত্রীর শ্মশানে যেয়ে চুপ করে বসে থাকত, কিছুদিন যেতে না যেতেই সে সব ভুলে গেল, কিন্তু মেয়েটি কি রোজই সেখানে যাওয়া—আসা করত।

এক বছর যেতে না যেতেই সে আবার বিয়ে করে এক সুন্দরী মেয়েকে ঘরে নিয়ে এল। নতুন বৌ দেখতে ভারী সুন্দর কিন্তু তার মনটা ছিল ভারী ছোট। লোকটি কিন্তু কিছুতেই

বুঝতে পারে নি। সে মেয়েকে বল্লে, খুকু, এ তোমার মা, সব সময় এর কাছে কাছে থাকবে, এর কথা শুনবে, কেমন ?

বাপের মনে ধারণা হল এতেই সব গোল মিটে যাবে কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে, সৎ মা তার আদরের মেয়েটিকে হিংসা করতে পারে। নতুন মা সুযোগ পেলেই মেয়েটিকে মারধর করত। মেয়েটি কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব তার বাপকে কখনো মুখ ফুটে জানাত না, চুপ ক'রে মার হজম করত। এই জন্য সৎমায়ের রাগ আরো বেড়ে যেত।

একবার জরুরী কাজে লোকটিকে বাড়ী ছেড়ে সহরে যেতে হল। সেখান থেকে ফিরে আসতে তার মাস দুই সময় লাগবে। দূরের পথে যাওয়ার সব দরকারী জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিতে নিতে লোকটি মেয়েকে ডেকে বল্লে, মা, আমিত কাল ভোরেই রওনা হব। তোমার জন্যে আসবার সময় কি নিয়ে আসব ?

মেয়েটি জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে বাবার সুমুখে হাঁটুগেড়ে বসল।

বাপ আদর করে জিজ্ঞাসা করল, আসবার সময় তোমার জন্যে কি কি আনব, বলত মা !

মেয়ে এবারও কোন জবাব দিল না, মাথা গুঁজে বসেই রইল।

বাপ আবার বল্লে, বলনা লক্ষীটি, তোমার কি চাই ?

মেয়ে তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাপ তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করতে চাইল কিন্তু মেয়ের কান্না কিছুতেই আর থামে না। বাপ যতই কান্নার কারণ জানতে চায়, মেয়ে ততই জোরে হাত দিয়ে দুচোখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। অনেক সাধ্য সাধনার পর মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, বাবা, বাবা, তুমি আমায় ফেলে যেয়ো না গো, যেয়ো না।

বাপ বল্ল, কিন্তু মা, আমায় যে যেতেই হবে, ভারী দরকার। তবে বেশী দেরী হবে না, শীগ্‌গিরই চলে আসব। আর আসবার সময় ঠিক তোমার জন্যে অনেক কিছু খেলনা নিয়ে আসব, কেমন ?

সে বল্লে, তাহলে আমায়ও সঙ্গে নাও।

বাপ হেসে উঠে বল্লে, বলে কি পাগলী বেটী, সে কি হয়! সে যে অনেক দূরের

পথ, তুমি যেতে পারবে কেন ?—না, তা হয় না। কেন, তুমি তোমার মায়ের কাছেই ত থাকবে !

সে মাথা নেড়ে জবাব দিল, বাবা, আমায় সাথে নিয়ে না গেলে, বলে দিচ্ছি, ফিরে এসে আর আমায় দেখতে পাবে না।

কথা শুনেই বাপের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে ভাবল, তাইত, তাহলে উপায় ? বড় ভাবিয়ে দিলে দেখ্‌চি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হল, না ও কিছু নয়। পুরুষ সে, সামান্য এক ফোঁটা মেয়ের কথাই কি আপনার কাজ থেকে বিমুখ হবে ? মেয়েটিকেই আদর করতেই নীরবে সে চলে গেল।

পরদিন সূর্য্য উঠ্‌বার আগেই সে উঠে বাপের কাছে এসে হাজির হল। তার হাতে ছিল একটি সুন্দর ছোট বাঁশের বাঁশী। মেয়ে বল্ল, এ বাঁশীটী আমি কাল নিজের হাতে তৈরী করেছি, আমাদের বাগানের বাঁশ দিয়ে তোমার জন্যে। আমায় যখন সাথে নিলে না, তখন এটি সঙ্গে নিয়ে যাও। সময় সময় এটি বাজালে আমার কথা মনে হবে।

একখানা দামী রেশমী রুমালে বাঁশীটী মুড়ে বাবার হাতে দিতেই তিনি তা জামার বুক পকেটে রেখে মেয়ের মাথায় আর একবার হাত বুলিয়ে শ্রীদুর্গা বলে রওনা হয়ে গেলেন। মেয়ে পিছু পিছু সদর দরজা পর্য্যন্ত এসে দাঁড়াল। বাপ তিনবার পিছন ফিরে মেয়েকে দেখে নিল, তারপর রাস্তার বাঁকে অদেখা হয়ে গেল।

সহরে এসে লোকটির কাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু সহরের জাঁকজমকের মধ্যে বাড়ী ফিরবার কথা একবারও তার মনে হল না। দিন রাত্তির সে আমোদ প্রমোদে মেতে রইল। ক্রমে দুমাস চলে গেল। বাড়ী যাবার বা মেয়ের কথা একবারও তার মনে হল না।

সেদিন বিকেলে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবে, জামা কাপড় পরে একখানা রুমাল খুঁজতে খুঁজতে বাড়ী থেকে আসার দিন যে জামাটি গায়ে দিয়ে ছিল, তার বুক পকেটে দেখতে পেল মেয়ের দেওয়া রেশমী রুমালে মোড়া বাঁশীটি। সব কথা তার মনে পড়ে গেল। বাড়ীর জন্যে তার প্রাণটা ছটফট করতে লাগল। বাঁশীটি বার করতেই সেটি এমন বরফের মত ঠাণ্ডা বোধ হল যে এমন আর কখনো ত মনে হয় নি। বাঁশীটি ঠোঁটের ডগায় ছোঁয়াতেই এক করুণ সুর বার হয়ে এসে তাকে উতলা করে দিল।

সে বাঁশীটি একপাশে রেখে দিয়ে চাকরকে ডেকে বলে দিল, তার শরীরটা হঠাৎ কেমন ভাল লাগচে না, আর নেমন্তন্নে যাবে না। কেউ যেন না তাকে বিরক্ত করে, খানিক বাদে সে হাত বাড়িয়ে বাঁশীটি তুলে নিয়ে বাজাতে লাগল। আবার সেই করুণ সুর বেজে উঠল। সুর শুনে এক না-জানা ভয়ে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। বাঁশী বল্লে, ফিরে এসো বাবা, ফিরে এসো!

সুরে তার মা-হারা মেয়েটির স্বর শুনতে পেয়ে তার সকল শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তাই ত কি হল! তখনই ছুটে পথে বার হয়ে সে বাড়ীর দিকে চল্ল। বনজঙ্গল মাড়িয়ে, দিন নেই, রাত্তির নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই পাগলের মত সে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। শরীর তার আর চলে না, তবু কিসের টানে সে এগিয়ে চল্ল। পাগলের মত আলুথালু চুল চোখ মুখ বসে গেছে, একমনে দেবতাকে ডাকতে ডাকতে সে আধমরা হয়ে বাড়ীতে এসে পৌঁছল।

সদরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, খুকী কোথায়?

স্ত্রী বল্লে, খুকী?...

হাঁ, খুকী,—খুকী কোথায়?

স্ত্রী হেসে বল্লে, তা কি করে বলব? কোথায় খেলচে হয়ত।—তা তার জন্যে এত তাড়া কি? মেহনৎ করে এলে, আগে একটু জিরিয়ে নাও, তার পর হবে সব।

সে পাগলের মত চীৎকার করে উঠে বল্লে, কোথায় গেল সে, আগে খুঁজে আন তাকে।

বাড়ীর এঘর সেঘর, বাগান, পুকুর ঘাট—সব আঁতিপাতি করে খোঁজা হল কিন্তু কোথাও খুকীর দেখা পাওয়া গেল না। তখন সে 'খুকী খুকী' করে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল কিন্তু খুকীর সাড়া পাওয়া গেল না। বাগানের বাঁশ গুলির শোঁ শোঁ শব্দে একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেল। কি মনে করে সে পকেট থেকে খুকীর দেওয়া সে বাঁশীটি বার করে নেড়েচেড়ে দেখল, পরক্ষণেই কি মনে করে তাতে ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক কান্নার সুর চারদিকে বেজে উঠল। বাঁশী যেন বলছিল—

বাবা, বাবা, তুমি এসেচ? সৎমা আমায় মেরে ফেলেচে। তুমি চলে যাওয়ার কদিন

বাদেই আমায় মেরেচে। বাগানের বাঁশ ঝাড়ের পাশে আমায় কবর দিয়েছে। আমায় আর দেখতে পাবে না।

* * *

লোকটি তখুনি নিজের হাতে মেয়ে মারার প্রতিশোধ নিল—মাথায় তার খুন চড়েছিল। তলোয়ারের এক কোপে নিজের স্ত্রীর ঘাড় থেকে মাথা খসিয়ে ফেল্ল। তারপর শাদা পোষাক পরে হাতে একখানা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে সে না-জানা দেশে রওনা হল।

সঙ্গে তার মেয়ের দেওয়া সেই ছোট্ট বাঁশের বাঁশীটি, অতি গোপনে বুকের কাছটিতে রেখে চিরদিনের মত চলে গেল। *

মুকুলের প্রতি

[কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।]

শরতে আমারে বরাত করেছ কবিতা।
দিতেছে ঢালিয়া শত শত তা'ত
শরতের শশী সবিতা।

ফুটিছে কবিতা তারায় তারায়
ছত্রে ছত্রে সুধার ধারায়
পত্রে পত্রে পাঠায় আজিকে
বিশ্বের কবি 'রবি'তা'।
এমন বাজারে আমার কবিতা চলিবে ?

* একটি জাপাণী গল্পের অনুসরণে।

মুকুল তোমার পাড়া পড়সীরা
দেখে কত কিনা বলিবে।
আমার অপরাজিতার কবিতা
সবার নিকটে সে যে পরাজিতা,
পূজার বাজারে তোমার মন কি
খুসী হবে হায় লভি'তা' ?
পূজার বাজারে রয়েছে অনেক বরাতী,
সবাই আজিকে হুকুম করিছে
সবাই হয়েছে অরাতি।
কেহ চায় ছবি কেহ জুতা জামা,
কেহ বলে, 'দাও ফুটবল, মামা'
দেনা করে হোক' বিনা দামে হোক
কেনা চাই মোর সবি তা'।
পাইনিক ভয়, মুকুল, তোমার বরাতে,
ছুটী পয়সায় পারিব তোমার
একটি পাপড়ি ভরাতে।
সেই ভরসায় যাহা খুসী তাই
পাঠায়ে মুকুল তোমারে ভুলাই
তবু মনে ভাবি ; ভুলিবে কি দাবি
হাসিয়া ল'বে কি 'ভবী'তা'।

খেলার মাঝে

[শ্রীভূপতি চৌধুরী]

(গল্প)

আমাদের পাড়ার ছোট মাঠটীতে, তখন গুলি খেলা স্বরু হয়ে গিয়েছে।

একটু আগে স্কুলের ছুটীর ঘণ্টা বেজেছে। কত ছেলে তখন স্কুলের গেটের ধারে 'আলুকাবলি' ওয়ালার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ওসবদিকে আমার কোন দিন লোভ ছিল না; তাই ছুটী পাওয়া মাত্র বাড়ী এসেই বই গুলোকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলেদিলুম তারপর কোনরকমে মায়ের দেওয়া জলখাবারগুলো মুখে পুরতে লাগলুম। মন তখন আমার খেলার মাঠের দিকে টেনেছে। খেতে খেতে কতবার যে বিষম খেলুম তার ঠিক নেই। মা বকলেন—অত তাড়া কিসের? কিন্তু ওসবদিকে কাণ দেবার মত অবস্থা তখন নয়। কোন রকমে প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে জলের ঢোক গিলে খাওয়া শেষ করেই দিলুম বাড়ী থেকে ছুট্। জামার পকেটেই গুলি ছিল, আর থাকতও সব সময়। কাজেই সেজন্যে কোনো চিন্তা ছিলনা। দলে ভিড়ে খেলতে স্বুরু করে দেওয়া গেল।

বিকেলের রোদ্দুর তখনও ফেটে পড়ছে। ঘামে নেয়ে উঠেছি; কিন্তু সে খেয়াল নেই। কপালের ঘামের লোণা ফোঁটা গুলো যখন চোখে মুখে এসে পড়ছে, তখন কোন রকমে জামার হাতায় কপালের ঘামটা মুছে নিচ্ছি। জামার পিছনটা ধুলোয় লুটোচ্ছে; কিন্তু সে সব দেখবার সময় কি আছে ছাই। খেলা দারুণ জমে উঠেছে। আমাদের সকলের মোটে নাইন কি টুয়েল্‌ভ্; কিন্তু দেবুটা এরি মধ্যে এইট্টিন্ করে ফেলেছে এখুনি সে টোয়েন্‌টি করে উঠে যাবে। তাকে উঠতে দেওয়া হবে না। রোজই সে সকলের আগে উঠে যায়, প্রত্যেককে খাটায়, কিন্তু নিজে কোন দিন খাটে না। আজ তাকে খাটাতে হবে মতলব করে আমরা খেলতে লাগলুম। তাকে এড়িয়ে নিজেদের মধ্যেই ব্যবস্থা করে আমরা যে যার 'এইট্টিন' করে নিলুম। শেষে নীরা আর স্থলু উঠে গেল। বাকী রইলুম আমি আর দেবু। আমাদের সকলের মধ্যে দেবু ছিল সকলের চেয়ে সেরা

খেলোয়াড়। যেমন ছিল তার আঙুলের টিপ' আর তেমন ছিল তার 'আঁটে'র জোর। দশহাতের মধ্যে গুলি এসে পড়লে আর রক্ষে ছিলনা, তাকে সে মারতো নির্ঘাৎ আর গুলিতে গুলিতে মেরে ফাটিয়ে দেওয়ায় তার জুড়ী আর একটীও ছিলনা। এ হেন দেবুর সঙ্গে শেষে যখন আমাকেই খেলতে হ'ল তখন যাতে তার টিপের মধ্যে না পড়ি সে জন্যে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে চালতে হচ্ছিল। ফলে আমার লক্ষ্য হ'ল কোথায় কোন গাদার মধ্যে, পাথরের খোয়ার পাশে লুকোতে পারি, আর তার লক্ষ্য হল কেমন করে আমাকে সে সব জায়গা অধিকার কর্ত্তে না দিতে পারে। শিকারী যেমন তার বন্দুক নিয়ে শিকারের পেছনে ছোটে, দেবুও তেমনি তার অব্যর্থ টিপ নিয়ে আমাকে তাড়া করেছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারেই আমার ফন্দির কাছে তার টিপ ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল। ফলে সে ক্রমাগতই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল।

খেলাটা যখন এমনি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় আমাদের পাড়ার 'নন্দদুলাল' এসে সেখানে হাজির হল। নন্দদুলাল যাকে বললুম তার আসল নাম হচ্ছে দুলাল। কিন্তু তার রোগা একহারা ডিগ্‌ডিগে ঘসাপয়সার মতো চেহারা দেখে, আমরা তাকে ঠাট্টা করে 'নন্দদুলাল' বলতুম। অবশ্য এমন ভাবে ঠাট্টা করে ডাকলে, আর যারাই রাগ করুক, দুলাল কোনো দিন রাগ কর্ত্ত না। এ বিষয়ে সে ছিল ভারী ভাল লোক। শুধু এ বিষয় নয় অনেক দিক থেকে দেখতে গেলে, সে হচ্ছে একটী খাঁটী 'গুড বয়' অর্থাৎ নিরীহ গোবেচারি ছেলে। আমাদের দুজনকে মাত্র খেলতে দেখে, দুলাল বলে বসল—আমি 'গেম্‌' বসব ভাই ?

তার কথাটা শুনে আমি একটু খুসি হয়ে উঠলুম। দেবুর তাড়ায় যে রকম জ্বালাতন হয়ে উঠেছিলুম, তাতে দুলাল 'গেম্‌' বসলে সহজেই আমি উঠে পড়তে পারব এই আমার আশা। কিন্তু দেবুটা বলে উঠল—নারে এখন গেম্‌ বসিস না, আমাদের দুজনেরই 'এইট্টিন্‌'।

আমি বললুম— তাতে কি তুই গেম বস্‌, আমি তোকে তুলে দেব।

কথাটা শেষ করে আমি আমার পকেট থেকে দুলালকে একটা গুলি বার করে দিলুম।

আমার কথামতো দুলালকে গেম বসতে দেখে দেবু গেল চটে—বলে উঠল—আচ্ছা দেখি দুলে, তুই কেমন করে টোয়েনটি করিস।

তার সমস্ত আক্রোসটা গিয়ে পড়ল দুলালের উপর। আমি উঠে গেলুম। দেবুর হাতে পড়ে দুলাল বেচারি বেশীক্ষণ টিকতে পারলে না। দেবু সহজেই টোয়েনটি করে উঠে গেল। তারপর দুলালের 'খাটান' আরম্ভ হল। খাটাবার মতো একটা লোক পেয়ে আমরা খুসীই হয়ে উঠেছিলুম। সে বেচারী মুখটা চুণ করে খেটে যাচ্ছে, আর আমরা নেশার ঝোঁকের মতো তাকে খাটিয়ে যাচ্ছি। একবার তার গুলিটা 'পিল' হতে হতে 'গাবু'র মধ্যে পড়েও উঠে এল। নীরা প্রথমে কড়ে আঙুলদিয়ে একটু সরিয়ে দিলে। তারপর সুলু যতটা জোরে পারে মেরে গুলিটাকে মাঠ পার করে দিলে। আমি বললুম 'এক্‌স্ কিউজ্'। দেবু বল্লে, আমিও ; খেটে খেটে দুলাল বেচারী একটু হায়রাণ হয়ে পড়েছিল ; সেজন্যে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই খান থেকেই বল্লে, ওই ওই-খানে রইল।

আমরা তিনজনে বললুম—তা হবে না, তোমায় চেলে দিতে হবে। দুলাল মুখ বিষন্ন করে চালতে গেল। দেবু বলে উঠল—এখন মুখ কাঁচু মাচু করলে চলবে কেন? যখন বলেছিলুম গেম বসিস নি, তখন শুনলি না। কানুর কথায় খেলতে এলি। দেখলি ত মুরোদ ওর। যা এইখানে চেলেদে দেখি ; কেমন না পিল হয় এবার।

দেবুর কথাটা আমারই আঁতে লেগেছিল বেশী তাই নীরা আর সুলুকে দলে টেনে বললুম—আচ্ছা দেখি, কেমন তুই একা দুলোকে তুলে দিস্।

দেবু প্রত্যেক চালটা দুলালকে বলে দিতে লাগল আর আমরাও রোকের মাথায় খেলতে লাগলুম। সকলের শেষে উঠলেও হাতের টিপের জোরে দেবু ফার্স্ট হয়েছিল, তারপর ছিলাম আমরা। সে নিজে দু একবার ফস্‌কে গিয়ে দুলালকে তুলে দেবার চেষ্টা করে দেখলে, সে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন না একজন তাকে হটিয়ে দিচ্ছে। তখন কি মতলবে তাকে উদ্ধার করবে, ভাবছে এমন সময় দুলাল গুলিটাকে পিলকরার চেষ্টা করতে গিয়ে গাবুর কাছে চেলে দিলে। দেবু একবার কি ভেবে তার গুলিটা দিয়ে সজোরে দুলালের গুলিটাকে মারা মাত্র, সেটা ভেঙে চার টুকরো হয়ে গেল। দেবুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

খেলা ভেস্তে গেল, দেবুর কাছে আমরা হেরে গেলুম. তার উপর একটা গুলিও নষ্ট হল। রেগে গিয়ে দুলালের হাত চেপে ধরে বললুম—দুলে গুলিদে আমার।

সে বেচারী কাঁদ কাঁদমুখে বললে—আমার ত গুলি নেই ভাই।

দেবু তার নিজের গুলিটা দুলালের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—যা এই গুলিটা দিয়ে দে।

দেবুর উপরের রাগটা সমস্ত গিয়ে পড়ল দুলালের ওপর। সে যে এইভাবে ফাঁকি দেবে তা হতে পারে না। এইত গুলি পেয়েছিস্, খাটনি দে তবে।

দেবু দুলালের হাতটা একঝট্‌কায় ছাড়িয়ে তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললে—যা তুই বাড়ী পালা; আমি তোর খাটান দিচ্ছি।

কথাটা শেষ করেই সে খাটানি দিতে বসে গেল। দেবুকে খাটাবার এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও সেদিন আর কোন উৎসাহ রইল না। দেবুর সঙ্গে খেলাটা আর আমাদের জমলই না।

নয়-ছয়-সর্দ্দার

[শ্রীনলিনীভূষণ দাশ গুপ্ত, এম, এ]

নাম তার গোরাচাঁদ—আটমাস বয়সে।
এরি মাঝে হাবভাবে সব কথা কয় সে!
সারাদিন চুল্ বুল্, হাত পাও চঞ্চল্—
পায়ে হাঁটা শিখেনি ত—হামাগুড়ি সম্বল্!
তবু তার 'থির্'নেই—দিনরাত দুর্‌দার্—
চুর্‌মার্—তোল্‌পাড়—নয়-ছয়-সর্দ্দার!

* * * * *

পুষী-রাণী 'মেণী', আর খুকুরাণী "বুল্‌বুল্"
ভয়ে তার নিঃসাড়—ভক্তিতে মশগুল্!
দাঁত-পড়া ঠাণ্‌দি ও দরোয়ান্ রামদীন্,
রাত-জাগা "ভুলো", তার দাপে কাঁপে রাতদিন্।
এই মত যতকিছু—বাড়ীময় খর্‌দার—
তাঁবেদার সব তার—নয়-ছয় সর্দ্দার!

* * * * *

——দোয়াতের কালি আর কৌটার সিন্দুর,
শিশিভরা "ফুলতেল" রবারের ইন্দুর,
জাপানের ঝুম্ ঝুমি জার্ম্মাণী খেল্‌না,
আয়না ও ক্রুশ কাঁটা, ময়দার 'বেল্‌না',
লক্ষ্মীর 'জলঘট্' কৌটাটি জর্দ্দার——
সব তার অনুচর—নয় ছয়-সর্দ্দার!

সোনার কলসী

[শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।]

(গল্প)

বরকত্ আলি টিহারাণের উপকণ্ঠে উষ্ট্র চালকের কর্ম্ম করিত। একদিন সে সন্ধ্যায় উষ্ট্র লইয়া মনিবের কাছে ফিরিয়া আসিল এবং কর্ম্মে ইস্তফা দিল।

পাড়ার লোকে সকলে বরকতের এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল কারণ তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোনও উপায় ছিল না। ক্রমশঃ এই ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া লোকে জানিল যে, বরকত এক কলসী সোণার টাকা পাইয়াছে।

টাকা পাইয়াছিল সত্য বটে। টাকার গরমে কিন্তু সে মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। পনর দিনের মধ্যে সে মদে জুয়ায় সমস্ত টাকা অপব্যয় করিয়া ফেলিল।

একদিন সকালে সে উঠিয়া দেখিল যে, সে যেমন নিঃস্ব ছিল -ঠিক সেই প্রকারই আছে—দিন চলিবার মত এক বিন্দু শস্যও তাহার গৃহে নাই। রাগে সে কলসীটা নর্দ্দমায় টালিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার উষ্ট্র চালকের কর্ম্মের সন্ধানে বহির্গত হইল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নর্দ্দমার নিকট গিয়া দেখিল যে কলসীটা পড়িয়া আছে—সে একবার ইহার দিকে চাহিল—তারপর কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে উহার নিকটে গেল। তাহার মনের ইচ্ছাটা কলসীটা বিক্রয় করিয়া আজকের দিনটা কাটাইয়া দেয়।

হাত দিয়া কলসী তুলিতেই সে দেখিল যে উহা ভারী ঠেকিতেছে। ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, কলসী পাইবার পূর্ব্বে যেমন উহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল, এখনও ঠিক সেই প্রকার আছে। আনন্দে সে পুলকিত হইয়া উঠিল। মাথায় করিয়া কলসটীকে ঘরে তুলিয়া আনিল। সে বুঝিতে পারিল যে, এই কলসী কখনও শূন্য হয় না। যত ইচ্ছা খরচ করিলেও ইহা সমভাবে পরিপূর্ণ থাকিবে।

বরকতের আর সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। তাহার প্রকাণ্ড বাসভবন হইল। দাস দাসী আত্মীয় স্বজনে সেই প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দিবারাত্র সুমন্বিত হইতে লাগিল। বরকত ঐ যে বিবাহ করিয়া তাহার দিনগুলি যেন বাদশাহের মত কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু বিপদ তবু ছাড়ে না। তাহার এই কলসীটা চুরি করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র হইতে

লাগিল। দাস দাসী প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সকলেরি এই কলসীর দিকে লক্ষ্য হইল। বরকত কলসী লইয়া বড়ই বিব্রত হইল।

সে অনেক ভাবিরা চিন্তিয়া কলসীর অনুরূপ অনেকগুলি কলসী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিল। ইহাতেও নিস্তার নাই। আসল কলসীটাই একদিন তাহার স্ত্রী আর একটু হইলেই বাসন বিক্রেতাকে দিয়া ফেলিত। দৈবাৎ বরকত সেই সময়ে আসিয়া পড়িয়াছিল তাই রক্ষা। কলসীর ভাবনায় বরকত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার আহারে রুচি নাই—রাত্রে নিদ্রা নাই সে ক্রমশঃ কৃশ হইতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া সে একটী স্বর্ণ শৃঙ্খলে কলসীটীকে বাঁধিয়া নিজের গলায় ঝুলাইয়া রাখিল। কলসীর ভার বহন করিয়া সে ক্রমশঃ শয্যাশায়ী হইল। ডাক্তার আসিলেন—রোগীর জীবনের কোনও আশা আর নাই।—তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া একটা উকা লইয়া সেই সোনার শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিলেন এবং কলসীটীকে লইয়া জানালা দিয়া নদীগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। বরকত যখন সুস্থ হইল তখন দেখিল তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার সেই কলসীটী আর নাই। সে সমস্ত দাস দাসী বিদায় করিয়া দিল এবং পুনরায় উষ্ট্র চালকের কর্ম্ম করিবার জন্য তাহার পুরাতন মনিবের নিকট উপস্থিত হইল।

* * * * * *

ছয় মাস পরে আবার বরকত ছাগলের চামড়ার জামা গায়ে দিয়া স্ফূর্ত্তি সহকারে উষ্ট্র চালকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে সকলে দেখিতে পাইল। তাহার তখন আর কোনও ভাবনা নাই—সে বেশ আনন্দ সহকারে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার শরীরে কোনও রোগ নাই। সে বেশ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট। কর্ম্মই মানবের একমাত্র বন্ধু। কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং জীবিকা নির্ব্বাহেরও কোন প্রতিবন্ধক হয় না।

পূজোর স্বপ্ন !

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১

ইঁ্যারে খোকন, মা শুধোলেন
কোলে আমায় নিয়ে
পূজো বাড়ীতে কেমন করে
ঠাকুর দেখ্‌বি গিয়ে ?
নূতন কাপড় কোথায় পাবি
ছেঁড়া ন্যাকড়া নেই
জামা একটা তালি দেওয়া
তিন বছরের সেই,
হাতে নেইক' একপয়সা,
ভিক্ষে পাইনি হেঁটে,
দুঃখ পেতেই জন্মে ছিলি
পোড়াকপালীর পেটে !

একটি দিনও দুটি বেলায়
পাস্‌নি ভাল খেতে
কেউ রাখেনা এসব খবর
পূজোয় আছে মেতে !
বেচতে গেলুম শাল খানা তাঁর
কিন্‌লে না কেউ ও'রে !
এই বলে মার চোখ দুটিতে,
অশ্রু এলো ভরে !

একলার খেলা

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত।

কান্তিক প্রেস—কলিকাতা।

২

শরৎঋতু সবে সেবার
পা দিয়েছে ভুঁয়ে
আগমনীর তান উঠেছে
সব শানায়ের ফুঁয়ে
অশ্রু মুছে মা বললেন
আমার পানে চেয়ে
সব দুঃখ ভুলে ছিলুম
তোমায় কোলে পেয়ে,
আজ কিন্তু পারছিনি আর
রাখতে চ'খের জল,
গাঁ ছেরে আজ গাঁ'য়ে পো'য়ে
পালাই কোথাও চল্।

তোর পানে যে যায়না চাওয়া
হায়রে যাদু মোর
হাড় পাঁজরা সার হয়েছে
এই বয়সে তোর;
একটা ছেলে পূজোর দিনেও
উপোস করে আজ!
ভাগ্যে তিনি স্বর্গে গেছেন
পেলেন না এই লাজ,"

৩

পথের ধারে কুঁড়ে মোদের
তারই দ্বারের ফাঁকে
যাচ্ছে দেখা ছেলের দল
ছুটছে ঝাঁকে ঝাঁকে

বোস্ পাড়াতে ঠাকুর নাকি
এবার সবার সেরা
জাফ্‌রী কাটা চাল চিত্তির
চুমকী দিয়ে ঘেরা,
নূতন জুতো জামা কাপড়
সবছেলেরই গায়ে,
আমিই শুধু পাইনি কিছু
ছিলুম খালি পায়ে

সন্ধ্যারতির বন্দনা আর
ঢুলি কাঁসীর সাড়া,
বোধন দিনের সকাল থেকেই
মাত করেছে পাড়া।

নাইবা হল' জামা কাপড়
তবু আমার মন
ছেলের দলের সঙ্গে যেতে
চাইছে অনুক্ষণ।

সোনার ঝাঁপি।

(চীনে গল্প)

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

যখনকার কথা তোমাদের বল্‌তে যাচ্ছি—চীন দেশের রাজা ছিলেন তখন দিগ্বিজয়ী ইউ। পূব-পশ্চিমে জোড়া মস্ত বড় তাঁর সাম্রাজ্য। বড় বড় রাজারা পর্য্যন্ত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাঁর সভাসদেরাও ছিলেন তেম্নি বাছা বাছা নাম করা পণ্ডিত। রাজা তাঁদের উপদেশ না নিয়ে কোন কাজেই হাত দিতেন না।

আজ পর্য্যন্ত চীনের লোকেরা তাদের জ্ঞানী, দয়ালু রাজা ইউ এর কথা বলে দুঃখ করে থাকে।

এদিকে হ'য়েছে কি—স্যাং দেশের রাজা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বস্‌ল। স্যাং দেশ ছিল রাজা ইউয়ের রাজ্যের উত্তর অংশ।

রাজা তক্ষুনি ছুটলেন তাকে দমন করতে—সঙ্গে তাঁর ঘোড়া—রথ আর অসংখ্য সৈন্য সামন্ত।

অল্প কয়েকদিনের যুদ্ধেই তিনি শত্রুপক্ষকে একেবারে হটিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতাকে জানিয়ে দিলেন—রাজা ইউ দয়ালু বটেন—কিন্তু সেই সঙ্গে দুষ্টের দমনেও তিনি বেশ পটু।

কিন্তু এই বিজয়োল্লাসের পেছনে—যে তাঁর জন্যে দুঃখের বোঝা জমা ছিল—তা' রাজা কিছুই টের পাননি।

যুদ্ধক্ষেত্রের উপরাউপরি প্রায় এক মাসের পরিশ্রমে রাজার শরীর ভেঙ্গে পড়্‌ল।—তিনি শয্যা নিলেন।

রাজ-বৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না।—রাজা ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চল্‌লেন।

জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যে নানা দেশ থেকে বড় বড় কবি ও গায়কদের আনা হ'ল। তিনি কিন্তু তাদের সব বিদায় দিয়ে বল্লেন—আমায় শান্তিতে থাকতে দাও—এখন আমি কিছু চাইনে।

চীন দেশের রাজপুরোহিতের কাছে দেবতাদের দেওয়া একটি সোনার-ঝাঁপি ছিল। রাজ্যের কোন বিপদ-আপদ হ'লে আমীর ওমরাহ আর দেশের সব বড় বড় লোক গিয়ে ঐ ঝাঁপি খুলতেন। তার ভেতর তারা সময় সময় দেবতাদের আদেশ পেতেন। তখন সেই আদেশ অনুসারে কাজ চলত।

রাজা মর মর—রাজ্যের দুরবস্থার সীমা নেই—তাই রাজার তিন ভাই এক সঙ্গে পরামর্শ করলেন—এখন উপায় কি? দুজন বল্লেন, দেবতাদের দেওয়া কৌটোটি খুলে দেখলে হয়তো তার ভেতর আমরা কোন ইঙ্গিত পেতে পারি।

তৃতীয় ভাই চো কিন্তু অন্য উপায় স্থির করলেন। তাই কাউকে কিছু না বলে, তিনি একটা খোলা মাঠে চলে এলেন। সেই তিনি চারটি বেদী তৈরী করালেন।—একটি পূবে—একটি—পশ্চিমে—একটি উত্তরে—আর একটি দক্ষিণে। দক্ষিণ দিকের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আর উত্তর দিকে মুখ করে—তিনি পরলোকগত তিনজন বড় বড় রাজার কাছে নিজের প্রার্থনা জানালেন। তিনি ভেবেছিলেন,—রাজার জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের কাছ থেকে—কোন না কোন সাহায্য মিলবেই।

রাজ্যের ঘোষণাপত্র লিখে রাখ্‌বার জন্যে একজন লোক থাকে—তাকে বলে "লিপিকারক।"

চো যা বলে যাচ্ছিলেন—এ লিপিকারক একটী তামার পাতে অবিকল তাই লিখে যাচ্ছিলেন।

চো প্রার্থনা কচ্ছিলেন—হে মহামান্য রাজগণ, তোমাদের বংশধর ইউ এখন মৃত্যুশয্যায় শু'য়ে। তাঁর মঙ্গল অমঙ্গলের জন্য তোমরাই দায়ী। যদি তাঁকে মরতেই হয়—তবে তার বদলে—তাঁর ভাই আমাকে তোমরা নাও। আমি জীবনে কারো ক্ষতি করিনি। আমার প্রার্থনা যেন বিফল না হয়। রাজ্যের প্রজারা তাঁকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসে। জগতে আমার কোন বাঁধন নেই। কাজেই তাঁর বদলে আমাকে নিলে তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'বে—রাজ্যও রক্ষা পাবে। আমার প্রার্থনার জবাব যেন সোনার ঝাঁপির ভেতর পাই।

প্রার্থনা শেষ হ'বার পর চো মন্দিরে চলে গেলেন। মন্দিরে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের পদধূলি নিয়ে সব বল্‌তেই সোনার ঝাঁপির চাবিটি এনে—তিনি চো'র হাতে তুলে দিলেন। ঝাঁপিটি খোলা হয়নি অনেক দিন। রাজা ইউয়ের শাসনে রাজ্যে শান্তি ছিল—দুঃখের মুখ প্রজারা অনেক দিন দেখেনি। কাজেই সোনার ঝাঁপি খোলারও আর কোন দরকার হয়নি।

মন্দিরের এক অন্ধকার কুঠুরীতে লোহার সিন্ধুকের ভেতর সোণার ঝাঁপিটি ছিল। যেই সিন্ধুকের ডালাটা তুলেছেন—অমনি সোনার ঝাপি থেকে জ্যোৎস্নার মত আলো বেরিয়ে ঘরটাকে ক'রে ফেল্লে ঠিক দিনের মতো। সেই আলোতে চো দেখতে পেলেন—দেবতারা তাঁর প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন।

আনন্দে চো'র গা শিউরে উঠ্‌ল!

ঝাঁপির ভেতর লেখা রয়েছে—চো তোমার প্রার্থনা আমরা শুনতে পেয়েছি। তোমার ব্যবহারে আমরা খুব খুসী। তার বদলে তোমাকেও মরতে হ'বেনা।—আমরা রাজা ইউকে বাঁচিয়ে দেব। বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করতে পারবেন।

চো আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন। যে তামার পাতে চো'র প্রার্থনা লেখা হয়েছিল—সেই পাতটা ঝাপির ভেতর রেখে ঝাপিটা বন্ধ কর্‌লেন। তারপর চাবিটা পুরোহিতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন, এসব কথা কেউ যেন ঘুনাক্ষরেও জান্‌তে না পারে।

পরদিন সকাল বেলা রাজা ইউ বিছানা ছেড়ে উঠে বস্‌লেন। সকলে দেখে তো অবাক!

*   *   *   *   *   *

তার পর দশ বছর কেটে গেছে। রাজা ইউয়ের শাসনে প্রজাদের বেশ সুখেই কাটছিল। কিন্তু একদিন রাজ্যের ছেলে বুড়ো সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেলেন ওপারের ডাকে। যুবরাজ চ্যাং তখন ছোট্ট। তাই কাকা চো তার হ'য়ে রাজ্য চালাতে লাগ্‌লেন। কারণ বয়েসে ছোট হ'লেও তিনিই ছিলেন তার কাকাদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক। তার পরিচয় তোমরা আগে কিছু পেয়েছ।

চো'র আর দু'ভাই কিন্তু ছোট ভাইয়ের এত সম্মান দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মর্‌তে লাগ্‌লো। দিন-রাত্তির তারা ফিস্ ফিস্ করে বুদ্ধি আঁট্‌তে লাগ্‌লো—কি ক'রে চো'কে জব্দ করা যায়!

হঠাৎ তাদের কপাল গুণে—একটা ভারী সুবিধেও জুটে গেল।

ব্যাপারটা হল কি—কিছুর মধ্যে কিছু নেই হঠাৎ একদিন হোয়াঙ্গ হো নদীতে বান ডেকে এলো—তাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা ঘর দোর হারিয়ে পথের ভিখিরী হয়ে পড়ল। দেশ জুড়ে হাহাকার উঠ্‌ল।

দলে দলে প্রজা রাজবাড়ীতে এসে তাদের দুঃখ জানিয়ে বল্লে, রাজা আমাদের নাবালোক—দেখ্‌বার আমাদের কেউ নেই!—চো এই সব শুনে একদিন ঘোষণা করে দিলেন, যুবরাজ নিজে বন্যার যায়গা-গুলো দেখ্‌তে যাবেন।

রাজপুরীতে সাড়া পড়ে গেল।—রাজ পুত্র দেশ ভ্রমনে যাবেন। তখুনি এক সোনার পাল্কী তৈরী হ'ল। সৈন্য সামন্তদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

ভাল এক দিন দেখে সোনার পাল্কীতে চেপে রাজপুত্র রাজ্য দেখ্‌তে বেরোলেন।

দু'একদিনের ভেতরই তারা হোয়াং হো নদীর তীরে এসে পৌছুলেন। প্রজারা দলে দলে এসে তাদের রাজপুত্রকে দেখে যেতে লাগ্‌লো। রাজপুত্র কাউকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেন নি।

একদিন সকালবেলা রাজপুত্র এমনি বেড়াতে বেরিয়েছেন—কিছুদূর যেতেই রাজপুত্রের পাল্‌কী দল থেকে ছট্‌কে অনেকটা এগিয়ে পড়ল। সঙ্গে তখন তাঁর দু'একজন অশ্বারোহী ছাড়া আর কেউ ছিলনা।

হঠাৎ একদল তাতার দস্যু তাদের ওপর এসে পড়ল। সঙ্গের লোকেরা চীৎকার করে সাহায্যের জন্যে ডাকা ডাকি করলে—কিন্তু দলের লোকেরা তখন অনেক দূরে। তাতাররা অনায়াসেই তাদের হটিয়ে দিয়ে—সোনার পাল্কীর দিকে এগিয়ে চল্লো।

সকলে হা—হা—করে উঠ্‌ল।

হঠাৎ তারা দেখ্‌তে পেলে—রাস্তার ধুলো উড়িয়ে তীর বেগে তাদের সৈন্যেরা সব ছুটে আস্‌ছে। আনন্দে তারা চীৎকার করে উঠ্‌ল।

সৈন্যদের দেখে তাতার দস্যুরা সব চারদিকে সরে পড়ল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে এই যে একটা ঘটনা ঘটে গেল—এতে চো'র আর দু'ভাই খুব সুবিধা পেলে। তারা রাজ্যের ছোট বড় সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগ্‌লো—চো রাজপুত্রকে হত্যা করে নিজে রাজা হবার জন্যে এই ষড়যন্ত্র করেছিল।

চো যদি দুষ্টলোক হতেন—তাহলে তক্ষুনি তার ভাইদের কারাগারে কিম্বা শূলে দিতে পারতেন! কিন্তু তিনি তার কিছুই না করে—চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে এক দূর দেশে।

রাজ্যের ভার তাঁর ভায়েরা পেলেন।

ধীরে ধীরে হেমন্ত কাল এসে পৌঁছিল। মাঠ সব শস্যে ভরে উঠ্‌ল।

একদিন হল কি কথা নেই বার্ত্তা নেই—এক প্রলয়ের ঝড় এসে শস্যের ক্ষেত সব দ'লেমুচ্‌ড়ে ঘর দোর ভেঙ্গে গাছ-পালা উপ্‌ড়ে রাজ্য তোল পাড় করে তুল্‌লো।

সাত দিন সাতরাত এই ঝড় সমানে চল্‌লো। রাজ্যের প্রাচীন লোকেরা বল্লে—এমন ঝড় দেখাতো দূরের কথা—তারা কখনো কানেও শোনেনি।

প্রধান পুরোহিত বল্লেন—কোন কারণে স্বর্গের দেবতারা আমাদের ওপর রাগ করেছেন—এ ঝড় হ'য়েছে তারই জন্যে।

রাজা বল্লেন—সোনার ঝাঁপি খুল্‌লে আমরা বোধহয় তার ভেতর কোনও ইঙ্গিত পেতে পারি। ব'ল্‌তে ভুলে গেছি—যুবরাজ চ্যাংই এখন রাজা।

আমীর ওমরাহদের নিয়ে রাজা মন্দিরে গেলেন। প্রধান পুরোহিত এসে রাজার হাতে সোনার ঝাঁপির চাবি তুলে দিলেন।

অনেক দিন পর আবার ঝাঁপির মুখ খোলা হ'ল।

ঝাঁপি খুল্‌তেই রাজা—তামার পাতে লেখা চোয় সেই প্রার্থনা দেখ্‌তে পেলেন। প্রধান পুরোহিতের দিকে ফিরে রাজা বল্লেন,—এ সব কি? এর তো কিছুই আমাকে জানান্ নি?

পুরোহিত তখন তাঁকে সব জানিয়ে বল্লেন, চোই এসব কথা বল্‌তে মানা করেছিলেন।

রাজা তখন ওমরাহদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—এ ঝড় কেন হয়েছে—তা আর আমার বোঝবার বাকী নেই। সৈন্যদের সাজতে বলুন—আমি এখনই চো'কে ফিরিয়ে আন্‌তে যাবো।

সাতদিন পর রাজা, চোকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। ফিরেই তিনি তাঁর আর দুই কাকাকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রজারা অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে—ঝড়ের আগে তাদের মাঠ যেমন শস্যে ভরা ছিল—ঠিক তেমনটিই আছে। ঘর দোর কোথায়ও কিছু ভাঙ্গা নেই!

সকলে দলে দলে রাজপুরীতে গিয়ে রাজাকে এ খবর জানালে।

চো ফিরে আসাতেই যে তাদের পূর্ব্বশ্রী ফিরে এসেছে তাতে আর কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।

মুকুল

[শ্রীপশুপতি শর্ম্মা]

১

নবীনাভরণে এসেছি মুকুল
জীবন-গাছের শাখে!
পরাণ-কুঁড়িরে ফুটাবারে ফুল
নবীনের নব ডাকে!
বরি লও মোরে ভরি সব বুক
ফুটাইব সুখ, ঘুচাইব দুখ!
আঁধারের কারা ভেদি' ছেদি' আমি
আলোকে এসেছি নামি;
লও বুকে মোরে সমাদরে আজি
মনের মালার পাকে
নবানাভরণে এসেছি মুকুল
জীবন-গাছের শাখে!

২

আমার হিয়ার কাণায় কাণায়
আশার আশাস ভরা !
ঘুচাব ভ্রান্তি, যত হায়-হায়
টুটাব মরণ—জরা !
জীবন-প্রভাতে ক'রেচি যাত্রা,
বাড়াব জগতে সুখের মাত্রা,
প্রীতি সুধা-ধারা, অমরা ছানিয়া
দিব আমি সবে আনি' !
বাঁচাও আমারে বুক্-ভরা স্নেহে
ভরো ভরো হৃদি ত্বরা !
আমার হিয়ার কাণায় কাণায়
আশার আশাস ভরা ।

৩

ওগো অমৃতের সন্তান সবে
মম অনুরাগ গান
কাণ পাতি শুনো হবে হবে হবে
বেদনার অবসান !
প্রাণে দিবে দোল্ হর্ষে আকুলি'
গাবে নব গান আপনায় ভুলি' !
এসো এসো সাথে হা'তে-হাত ধরি
পথ চলা সুরু করি !
লহ বরি মোরে বুকের মাঝারে
ফুটাতে তরুণ প্রাণ !
মরতের ওগো মধুময় হিয়া
অমৃতের সন্তান ।

সুরেন্দ্র-প্রয়াণ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(১)

উপকার ভুলে যেতে মোরা বুঝি হইনে কাতর,
আজ যারে শিব বলি কাল তারে বানাই পাথর।
বর পেয়ে স্মরিনাক সুচির আরাধ্য দেবতায়,
বৃষ্টিশেষ বারিদের দিকে আর কজন তাকায়!

(২)

রামধনু নেহারিয়া ভুলে যাই তপনের কথা,
ধ্রুপদের চেয়ে পাই "খেয়ালে" অধিক মধুরতা।
গাণ্ডীবির শরজালে সারথি শ্রীকৃষ্ণ যান ঢাকা,
অমৃতের মহোৎসবে মন্দার দূরেতে রয় একা।

(৩)

বিধাতা-বিমুখ দেশে বিমাতার বাক্যে পেয়ে ব্যথা,
যখন ধ্রুবের মত হে সুরেন্দ্র এলে তুমি হেথা,
রাজসিংহাসনাকাঙ্খী তুচ্ছ করি সে পার্থিব ধন
হরির কৃপায় পেলে জনগণহৃদয়ে আসন।

(৪)

তুমি ঋষি মন্ত্রস্রষ্টা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অধিকারী,
জাতীয় যজ্ঞের হোতা, নান্দীকর, প্রথম পূজারি।
তুমিই বহালে গঙ্গা, নিঙ্গারি জটিল জটাজাল
ছুটে আজ নীলধারা দিগ্নাগের করিয়া নাকাল?

(৫)

তোমার জাগৃহি গানে শমীবুকে বহ্নি উঠে জ্বলি,
দধিচির অস্থি মাঝে খেলে যায় শক্তির বিজলি,
অহল্যার শিলাদেহে সঞ্চারিত করে নব প্রাণ
'কদলীপত্তনে' আনে নিদ্ ভাঙ্গা মৃদঙ্গের তান।

(৬)

তোমার বাগ্মিতা বিশ্বে আনিল নবীন সুপ্রভাত.
ভাষার পাগলাঝোরা, ভাবের সে 'কাবেরী প্রপাত'
বীণার ঝঙ্কারে পাই: গাণ্ডীবের সে রুদ্র টঙ্কার
শ্যামের মুরলী রবে চামুণ্ডার বিজয় হুঙ্কার।

(৭)

'গুরু-গোবিন্দের' মত শক্তি তব অনন্ত অপার
বাঙ্গালীর কঙ্কালেতে করে দিলে জীবন সঞ্চার।
গড়িলে চিতোর নগর এই জলা জলঙ্গীর বুকে,
ব্রাহ্মণের নগ্ন বুক পেতে দিলে কামানের মুখে।

(৮)

ক্লান্তিহীন রুদ্ররণী তীব্রতেজা অসীম সংযমী
নির্ব্বাণের স্পৃহা নাই, মোক্ষকামী চিরদিন তুমি।
ঘৃণা কর দুর্ব্বলতা শত্রু মিত্র দুই অকপট
'ভারতপুরের' গড় দুষ্প্রবর্ষ Surrender not.

(৯)

দেখেছি তোমারে মোরা পককেশ তরুণ অন্তর
নয়ন প্রতিভাদীপ্ত, আপনাতে অনন্ত নির্ভর।
সম্রাট কিরীট্ হীন অখণ্ড সমস্ত ভারতের,
কাছে বলে বিশালতা পুরাপুরি পাই নাইটের ?

(১০)

তব স্নিগ্ধ বার্দ্ধক্যের ফিণ্‌ফোটা 'অরোরার' ভাতি
আলো করে রেখেছিল দীনদেশ দীনতর জাতি।
শরশয্যা-শায়ী ভীষ্ম, শুনাইতে শান্তির বারতা
রণস্থলে শান্তি-মঠ, মহাযোধ আজ তুমি কোথা!

(১১)

বিপুল আলোক-মঞ্চ কালাঘূর্ণি করিয়াছে গ্রাস,
উৎপাটিত বনস্পতি, যুগের সজীব ইতিহাস।
মুছেছে অশোকলিপি, নাহি আর নাই সে যে আর
অজন্তার বুদ্ধমূর্ত্তি ঢাকি দিল আসিয়া আঁধার।

সীতা

(পুরস্কার-প্রাপ্ত কবিতা)

[শ্রীদেবব্রত লাহিড়ী]

১। জুড়াইতে জগতের ব্যথা
বিধাতার আশীর্ব্বাদ সমা,
মুর্ত্তিমতী-ক্ষমা সহিষ্ণুতা
জনক দুহিতা রূপে রমা।

২। প্রজাহিতে তাপসী কল্যাণী
সাদরে বরিলা নির্ব্বাসনে
উচ্ছ্বসিত ভক্তি অশ্রুধারা
বহে আজো যাঁহার স্মরণে।

৩। পুণ্য প্রেমে ত্যাগে গরিয়সী
শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি জননীর ;
কর্ত্তব্যে অটল অনুপমা,
ধৈর্য্যে-কন্যা মাতা ধরিত্রীর

৪। স্মরণে গরবে ভরে বুক
আমাদেরই ভারত দুহিতা
জগতের আরাধ্যা রমণী
অতুলনা নারীরত্ন সীতা।

---

*সীতা

(পুরস্কার-প্রাপ্ত কবিতা)

(সনেট)

[শ্রীনির্ম্মলেন্দু বিশ্বাস]

মৃত্তিকা-দুহিতা সীতা, চিরবিরহিণী ;
মাতা নহ, কন্যা নহ, নহ রামপ্রিয়া,
চির-ব্যথা ফল্গু-ধারা—নিত্যপ্রবাহিনী—
যুগে যুগে কবিচিত্তে। মৃদু গুঞ্জরিয়া
বিরহ-রাগিণী তোল ছন্দোবন্ধ গানে ;
চিত্ত-শতদলে রাজ শত-কবি-প্রাণে।

সতত সন্দেহ-বিষে জর্জ্জরিত ধরা,
বিষ-পঙ্কে ফোটে যদি কখন পঙ্কজ ;
ভক্ত কবি-ভৃঙ্গ তবে নিত্য মধুক্ষরা—
চক্ষুহীন স্বার্থ অন্ধ পায় না সে খোঁজ। ... ..
অবহেলা অনাদর লাঞ্ছনা গঞ্জনা
মটীমা'র মেয়ে বলে অবহেলে সয়ে,
ফিরে গেলে মাতৃকোলে বুকে ব্যথা বয়ে
ধরা-মরু মাঝে নাহি বিন্দু স্নেহ কণা।

---

* (শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীগিরিজাকুমার বসু) বিচারকদের মতে শ্রীনির্ম্মলেন্দু বিশ্বাসের (ওড়াকান্দী, ফরিদপুর বয়স পনের) ও শ্রীদেবব্রত লাহিড়ীর (মেছুয়া বাজার, কলিকাতা বয়স সাড়ে বারো) কবিতা দুইটী পুরস্কার যোগ্য হওয়ায় পুরস্কার দুইজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

বুনো রাজ-হাঁস

(উপকথা)

[প্রভাংশুকুমার গুপ্ত]

(এক)

দূরে—বহুদূরে এক রাজা বাস কর্‌তেন—তাঁর ছিল এক জ্যোৎস্না-ছাওয়া আকাশের চাঁদের মত এগারো ছেলে ও আধ-ফোটা গোলাপের মত লীলাবতী বলে একটি মাত্র মেয়ে। এগারোটী ছেলে বুকের ওপর ঝক্‌ঝকে তারার তক্‌মা এঁটে ও কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যেত। তারা সোনার শ্লেটের ওপর হীরের পেন্সিল দিয়ে লিখ্‌তো, তারা যে রাজার ছেলে !

তাদের বোন লীলাবতী একটা ছোট্ট আয়নার তৈরি টুলের ওপর বসে বসে একটি ছবির বই দেখতো—যার দাম ছিল গোটা-রাজত্বের আধখানার সমান।

হায় ! সে সময়টা ছেলে-মেয়েদের কি সুখেরই ছিল, কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না !...

প্রথম রাণী হঠাৎ মারা যাওয়ায় রাজা একটি নতুন রাণীকে বিয়ে করে আন্‌লেন !

নতুন রাণী ছেলেমেয়েদের মোটেই দেখ্‌তে পার্‌তো না, এ জিনিষটা প্রথম দিনই ছেলে মেয়েরা বুঝতে পার্‌লে। পূর্ব্বে লালটুক্‌টুকে আপেল ও ভালো ভালো সুতার খাবার তারা খেতে পেত, রাণী এসেই সে-সব একেবারে বন্ধ করে দিলে।

সপ্তাহখানেক পরে নতুন রাণী লীলাবতীকে কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে এক দূর-দেশে পাঠিয়ে দিলে ও ছেলেমেয়েদের নামে কতকগুলি এমন কথা রাজাকে বুঝিয়ে দিলে যে তিনি তাদের সম্বন্ধে কোন খোঁজ বা মাথা ঘামালেন না।

রাণীর মায়া-জালে তারা এগারো ভাই শ্বেতপদ্মের মত ধপ্‌ধপে সাদা রাজহাঁস হ'য়ে গেল ও অদ্ভুত চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে বিরাট দুর্গের জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে গেল উদ্যান ও বনের মধ্যে। তাদের আদরের বোন লীলাবতী কৃষকের যে ঘরের মধ্যে রেতের পদ্মের মত স্থির হ'য়ে ঘুমোচ্ছিল, সেখান দিয়ে যখন তারা চঞ্চল

বাতাসের মত বেগে উড়ে গেল তখন সবে ভোরের ফ্যাকাসে আলো পৃথিবীর বুক জুড়ে খেলা সুরু করে দিয়েছে।

ঐ স্থান দিয়ে যাবার সময় তারা ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল, তাদের দীর্ঘ গলা আরও দীর্ঘ কর্‌লে ; উড়ন্ত ডানাগুলি দিয়ে ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ কর্‌লে, কিন্তু কৈ কেউতো বাগানের সদ্য-ফোটা লাল-গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত দু'খানি কান খাড়া করে শুন্‌লে না… কিন্তু কৈ কেউ তো আকাশের ফুট্‌ফুটে তারার মত দুটী চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌লে না।…তারা ডানাগুলি আকাশের বুকের ওপর আরও বিস্তার করে দিয়ে, জোরে নাড়তে নাড়তে উঁচুতে মেঘের ভেতর প্রবেশ ক'রে, অসীম পৃথিবীতে ভ্রমণ করবার জন্য পাড়ি মারলে।

ক্লান্ত হ'য়ে অবশেষে তারা আশ্রয় নিলে এক অগুণ্‌তি ফুল গাছে ভরপূর এক ফুল-বনে।…

লীলাবতী কুটীরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে সদ্যপাড়া একটী সবুজ কাঁচা পাতা নিয়ে এক মনে খেলা করছিল। ক্রোশের পর ক্রোশ দূরে এ নিরালা স্থানে, জীর্ণ কুটীরে, খেলবার মত খেলনা কিছুই ছিলনা। সেই সবুজ কচি পাতা-খানিতে একটি ফুটো করে উঁকি মেরে সে পূর্ব্ব আকাশে রবির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে ; তার মনে হ'ল দূরে সে তার ভাইদের উজ্জ্বল চোখগুলি দেখতে পাচ্ছে। ঈষৎ উত্তপ্ত সূর্য্যের রশ্মিগুলির অগুণ্‌তি রেখা তার কুন্দ ফুলের মত মুখের ওপর, গাছে-ঝোলা লাল আপেলের মত গাল দুটীতে চুমু খাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তার ভাইরাই বুঝি তাকে আদর করছে।…

দিনের পর দিন একই ভাবে কেটে যায়। কুটীরের বাইরে যখন মাতাল বাতাস বড় বড় গোলাপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে বইতে বইতে গোলাপদের কানে কানে চুপি চুপি বল্‌তো—সৌন্দর্য্যে তোমাদের চেয়ে সেরা আর কেউ নেই ; তখন গোলাপের দল একসঙ্গে মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে উত্তর দিত—

আছে, আছে, লীলাবতী আছে।

যখন চাঁদের দেশের বুড়ির মত শাদা চুলের বোঝা মাথায় ক'রে কৃষক বুড়ি দরজার মুখে বসে বসে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করতো, তখন অধীর বাতাস একটা দমকা বেগ দিয়ে বইয়ের

পাতা উল্টে দিয়ে তাকে বল্‌তো—তোমার চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই, —তখন বইটী চেঁচিয়ে বল্‌তো—আছে, আছে, লীলাবতী আছে, এবং গোলাপগুলির ও বইখানির উক্তি ছিল হুবহু ঠিক্।

পনের বছর পরে সে ফিরে এল বাড়ীতে।

রাণী চোখ বিস্ফারিত করে দেখ্‌লে লীলাবতী সদ্য ফোটা শতদলের মত রূপে-লাবণ্যে টলমল করছে, সে তখন তাকে ঘৃণা করতে লগেলো আরও বেশী করে। তার মনে ইচ্ছা জেগে উঠ্‌লো লীলাবতীর ভাইদের মত লীলাবতীকে হাঁস করে ফেলে, কিন্তু হাজার কূটবুদ্ধি হলেও পারলে না শুধু রাজার জন্যে, কেন না রাজা মেয়েকে আর একবার দেখতে চেয়েছিলেন।

দুই

রাণী একটা দুর্গন্ধ মলম দিয়ে তার গোলাপী মুখ খানায় লেপন করে দিলে ও তাঁর চুলগুলি এমন ভাবে সঙ্কুচিত করে দিলে যে, কার সাধ্য লীলাবতীকে চেনে?

সুতরাং যখন রাজা তাকে দেখ্‌লেন, তখন তিনি ঐ রকম কুৎসিৎ ও বিদঘুটে চেহারা দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন ও চীৎকার করে বল্লেন-এ আমার মেয়ে নয়।

কেউই তাকে লীলাবতী বলে চিন্‌তে পারলে না, কেবল গৃহপালিত কুকুরগুলি ছাড়া: কিন্তু তারা বোবা জন্তু, কি আর করবার তাদের ক্ষমতা আছে?

লীলাবতী তার এরকম অবস্থা দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করলে ও তার এগারো ভাই যে দূর-দূর দেশে চলে গেছে, তাদের কথাই ভাব্‌তে লাগলো।

শেষকালে দুঃখে কষ্টে সে বিরাট রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল ও ঘন বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলো। তার গন্তব্যস্থান কোথাও ঠিক ছিলনা, দুঃখে কষ্টে অভিভূত হয়ে, সে শুধু তার ভাইদের অন্বেষণে ঘুরতে লাগলো।

রাত্রি এসে পড়লো,—পথ হারিয়ে সে মখমলের মত কোমল ঘাসের বিছানার উপর শুয়ে মাথাটা রাখলে একটা গাছের গুড়ির ওপর।...

চারিদিকে নির্জ্জন,—থম্‌থমে নীরবতা তাকে যেন ঘিরে ফেলেছিল। অসংখ্য জোনাকী উড়্‌ছিল—তাদের আলোগুলো সব সবুজ।...সারা রাত সে তার ভাইদের স্বপ্নেতে

দেখ্‌লে ; তার মনে হোল আবার সেই আগেকারমত তারা খেলা করছে।...যখন তার ঘুম ভাঙ্গলো তখন রবি আকাশে অনেক দূরে উঠে গেছে।

অনেক গুলো রংবেরংয়ের পাখী তার কাঁধের ওপর বসে তখনও প্রভাতী গান গাইছিল ; ঘন গাছে গাছে বনটা ভরা,—ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ সূর্য্যের রশ্মি আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে বন-ভূমির ওপর লুটিয়ে পড়েছিল। ঝর্ ঝর্ ঝর্ মিষ্টি শব্দ কর্‌তে কর্‌তে ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল।...সেই ঝরণার স্বচ্ছ জলে তার সেই কুৎসিত চেহারা প্রতিফলিত হয়ে ছিল ও সে নিজেই আঁৎকে উঠ্‌লো সেটা দেখে। মুখে ও কপালে জল দিতেই আগেকার মসৃন সুকোমল সুন্দর ত্বক ফিরে এল। যখন সে জলে গোটা দশ এগারো ডুব দিয়ে ও আধ ঘণ্টাটাক জলে কাটাবার পর ডাঙ্গায় উঠলো, তখন যদি কেউ তাকে দেখ্‌তো, তা'হলে নিশ্চয়ই সে বল্‌তো ওর চেয়ে সুন্দরী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

সে আবার চলতে সুরু কর্‌লে...গাছের দেওয়া ফল ও ঝরণার দেওয়া জল খেয়েই সে পা চালাতে লাগলো।

ক্রমে সে খুব ঘন বনের ভেতর এসে পড়লো—সে-স্থানটা এম্নি নীরব যে সে নিজেই চমকে উঠলো নিজেরই পায়ের শব্দে। সেখানে একটা পাখীও গুঞ্জন করে-নি বা একটাও সূর্য্যের রশ্মি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে-নি।

সে রাতটা কি বিশ্রী অন্ধকার! সেই খানেই সে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো, আধ-ঘুমে আধ-স্বপ্নে সে রাত কেটে গেল।

সকালে উঠেই তার দেখা হ'য়ে গেল এক বুড়ির সঙ্গে। লীলাবতী তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে তার ভাইদের কথা!...বুড়ি ঘাড় নেড়ে বল্লে না, তবে সে কাল এগারোটা মাথায় সোণার-মুকুট-পরা হাঁসকে এই কাছেই যে নদী আছে, তা'তে সাঁতার কাটতে দেখেছে!

বুড়ি তাকে নদীর ধারে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল!...নদীর ধার দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে যে জায়গায় এলো, সেখানে নদীর মোহনা শেষ হয়ে গেছে।...

নদীর ঘোলা জল ও সাগরের আধ-নীল জল মিশে সে জায়গাটায় এক বিচিত্র রংএর সমাবেশ হয়েছে। সে আরও এগিয়ে যেতেই একেবারে খোলা সমুদ্রের ধারে এসে পড়লো, কিন্তু সেখানে কৈ কাউকে তো দেখা গেল না। ..কোন নৌকার চিহ্নও তো দেখা গেল না!...

সে সমুদ্রের বালু-তটে আছড়ে পড়া অগুন্‌তি ঢেউয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আপম মনে বলে উঠলো—নীলে নীলিমায় প্রবাহিত ঢেউ সব, আমার মন বলছে তোমরা আমায় একদিন এখান থেকে বহন করে, যেখানেই আমার ভাইরা থাকুক না কেন, সেখানে আমায় পৌঁছে দেবে।

সমুদ্রের ধারে তুষারের মত শাদা হাঁসের পালক দেখতে পেয়ে সে একটা পাখা তৈরী কর্‌লে। ফোটাকতক জল সেই পালকগুলোর ওপর পড়েছিল, কিন্তু সে ভাব্‌লে সে ফোঁটাগুলি ব্যথা ভরা চোখের জল না হেমন্তের শিশিরকণা! সে আরও ভাব্‌লে সমুদ্রের রূপ কি সারা দিনই বদলাতে থাকে? পাহড়ের মত কালো মেঘ যখন সুন্দর নির্ম্মল হাস্যোদ্দীপ্ত ফুটফুটে আকাশ খানা ঢেকে ফেলে, তখন সমুদ্রের নীল জল কালো হ'য়ে যায় আর সে বোধ হয় বলে—ওহে আকাশ চেয়ে দেখ! আমার অবস্থা অবিকল তোমার মত হ'য়েছে। আবার যখন প্রকৃতি শান্ত মুর্ত্তি ধারণ করে, গোটা আকাশটা লালে লাল হয়ে যায়, তখন সমুদ্রের চেহারাটা তাজা রক্ত-গোলাপের একখানা পাপড়ি বলেই বোধ হয়।

রবি সেদিনকার মত কাজ শেষ করে যখন বিশ্রাম নেবার যোগাড় করছেন, তখন লীলাবতী দেখ্‌তে পেলে এগারোটী তুষার-ধবল হাঁস সমুদ্রের ওপর দিয়ে লম্বা সারি বেঁধে তীরে দিকে উড়ে আস্‌ছে।

তাড়াতাড়ি কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়লো; হাঁসগুলি তীরেতে নেমে ঠিক সেই ঝোপের পাশে বসেই ডানাগুলো নাড়তে লাগ্‌লো ঝট্‌পট্‌।

সূর্য্য যখন সাগরের সুনীল জলের নীচে ডুব্‌ দিলেন, তখন হঠাৎ হাঁসগুলির পাখা ও পালকগুলো পড়ে গেল ও এগারো জন কান্তিমান রাজপুত্রের সেখানে উদয় হ'ল। পুলকে লীলাবতী চীৎকার করে উঠে তাদের কাছে ছুটে গেল ও ভাইরা তাকে তাদের আদরের বোন লীলাবতীই বলে চিন্‌তে পার্‌লে। সকলে তারা মিলে সৎমায়ের দুষ্টুমির কথা আলোচনা করতে লাগলো!...

তিন

বড় ভাই বল্লে—সূর্য্য যতক্ষণ আকাশে থাকেন ততক্ষণ আমরা হাঁস হ'য়ে থাকি, আবার যখন তিনি আকাশ থেকে সরে যান তখন আমরা আবার মানুষ

হ'য়ে যাই। সুতরাং সূর্য্য অস্ত যাবার সময় একটা বিশ্রামের জায়গা আমাদের অতি অবশ্য দরকার, কেন-না তখন আমরা যদি সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে আস্‌তে থাকি, তা' হলে সূর্য্য ডোব্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও আশ্রয় না থাকার দরুণ জলের মধ্যে চিরদিনের তরে ডুবে যাবে। আমরা এখানে বাস করি না; সমুদ্রের ওপারে ঠিক এই রকম একটা চমৎকার জায়গা আছে,—এখান থেকে অনেক অনেক দূরে—আমরা সেখানে থাকি। সেখানে যেতে হলে আমাদের এই অগাধ সাগর পাড়ি মারতে হয়, আর সেই সমুদ্রের মধ্যে একটা ছোট পাহাড় ছাড়া বিশ্রামের আর স্থান না থাকায়, তার উপর বসেই বিশ্রাম করি।

বছরে একবার—একবার মাত্র আমাদের নিজের দেশে বাড়ীতে যাবার অনুমতি আছে ও মাত্র এগারোদিন থাক্‌বার হুকুম আছে সেখানে। তারপর আমরা বনের ওপর উড়্‌তে উড়্‌তে দুর্গ দেখি, সেখানে আমাদের পিতা বাস করেন। সে-জায়গায় ঝোপ গাছদের অনেক দিনের পুরাণো বন্ধু বলে বোধ হয়।

এই পিতৃভূমিতে আমরা আমাদের আদরের বোন লীলাকে খুঁজে পেলুম। আমরা এখানে মাত্র আর দুদিন থাক্‌তে পারি।... কিন্তু তারপর সমুদ্রের ওপারে সেই সুন্দর দেশে যাত্রা কর্‌তে হবে...কিন্তু তোমাকে কি করে নিয়ে যাই? সঙ্গে জাহাজ বা নৌকা কিছুই তো নেই!...

(চার)

তার পরের দিন রাতে তারা সারা রাত ধরে একটা কোমল জাল তৈরী করলে ও জালের তলায় লঘু কাঠের টুক্‌রো জুড়ে দিলে। লীলা সেইটের উপর শুয়ে পড়লো। পূর্ব্ব আকাশ ফিকে হয়ে আস্‌তেই ভাইরা সকলে হাঁস হয়ে গেল ও দীর্ঘ চঞ্চু দিয়ে জালটা ধরে মেঘের দিকে উড়ে গেল। লীলা তখনও ঘুমোচ্ছিল; তার ঘুমন্ত মুখের ওপর সূর্য্যরশ্মি পড়াতে একটী হাঁস তার পাখা ছড়িয়ে তাকে আড়াল করে রইলো।

যখন তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে, তখন লীলা জেগে উঠে দেখ্‌লে তার পাশে ভাইদের দেওয়া একগোছা আঙ্গুর রয়েছে। একটা জাহাজ নীচে দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা দেখাচ্ছিল একটা খেলনার জাহাজের মত।

সমস্ত দিন তারা যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু অন্য সময়ের চেয়ে আস্তে কেননা এবারে তাদের আর একটী প্রাণী,—বোন লীলাবতীকে নিয়ে যেতে হচ্ছিল।

ক্রমে ঝড় বইতে সুরু হ'ল,—এদিকে সন্ধ্যাও হ'য়ে আস্‌ছিল। লীলাবতী নীচের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ছোট পাহাড়টার জন্য; কিন্তু হায়! কোথায় কি! পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই! চেয়ে দেখ্‌লে হাঁসরা খুব জোরে ডানা চালাচ্ছে, কিন্তু সন্ধ্যে হতে তো বেশী দেরী নেই! সন্ধ্যার আগে তারা যদি পাহাড়টার ওপর না পৌঁছুতে পারে, তা'হলে বড়ই বিপদ! হাঁসরা মানুষ হয়ে যাবে ও জলের মধ্যে সকলকেই চির-শয্যা নিতে হবে।

সূর্য্য প্রায় ডুবে আস্‌ছিল। হাঁসরা হঠাৎ নীচে নাম্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—সূর্য্য যখন তারার মত ছোট হয়ে গেল, তখন লীলাবতী দেখ্‌লে তারা পাহাড়ের ওপর প্রায় এসে পড়েছে। তারাও পাহাড়ে নেমেছে, ওদিকে সূর্য্যও ডুব মেরেছেন; লীলা দেখ্‌লে তার ভাইরা মানুষ হয়ে গেছে ও সে সেখানে দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টি বেগে পড়্‌তে লাগলো তবুও তারা আনন্দে মিষ্টি গলায় গান গাইতে সুরু করলে।

পরদিন সূর্য্য উকি মারবার সঙ্গে সঙ্গেই, তারাও বোনকে নিয়ে উড়তে আরম্ভ করলে।

তাদের মনোমত জায়গায় পোঁছাতেই লীলাবতী দেখ্‌লে কি সুন্দর দেশ! নীলে—নীল পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে!...ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখলে!...অপূর্ব্ব সুন্দরী এক পরী তাকে বল্‌ছে—তোমার ভাইরা রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু তোমার কি সে কাজ করবার সাহস আছে? এই যে যন্ত্রণাদায়ক বিচুটী গাছ দেখছ, এ রকম গাছ এই গুহার চারিধারে প্রচুর জন্মায়; ঐ গাছ থেকে ছাল তুলে বুনে এগারোটা চাদর তৈরী ক'রে হাঁসগুলির ওপর রেখে দেবে, দিলেই মায়াজাল থেকে এরা মুক্তি পাবে; কিন্তু সাবধান এ সমস্ত কাজ শেষ হবার আগে তুমি একটিও কথা কইতে পাবে না।

পরদিন সকাল বেলায় লীলাবতী বিছুটীর গাছ তুল্‌লে ও তা থেকে খালি পা দিয়ে ঘষে ওপরকার ছাল ছাড়িয়ে ফেল্লে; ওঃ কি যন্ত্রণা,—ঠিক্ আগুনের মতন।

সে সমস্ত কষ্ট সহ্য ক'রে ভাইদের মুক্তির জন্য চাদর তৈরী করতে লাগলো। তার ভাইরা বোনকে বোবার মত কথা বল্‌তে না দেখে ও ঐ রকম কাজ কর্‌তে দেখে সমস্তই বুঝতে পারলে,—অঝোরে তাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে লীলাবতীর দেহে পড়্‌তে লাগলো, তার জ্বলন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বরফের মত জুড়িয়ে গেল।

সারা রাত সে কাজ কর্‌তে লাগ্‌লো। পরদিন সকাল বেলা হাঁসরা উড়ে যাবার পর হঠাৎ সে বাইরে কুকুরের চীৎকার শুন্‌তে পেলে; সে তখন একটা চাদর শেষ করে দ্বিতীয়টায় সবে মাত্র হাত দিয়েছে।

একটার পর একটা দলে, দলে, বড় বড় বাঘের মত কুকুর গুহার ভেতর প্রবেশ করলে। তাদের সঙ্গে শীকারির দল। শীকারিদের মধ্যে যে সব চেয়ে সুন্দর দেখতে, তিনি ছিলেন সেখানকার রাজা। তিনি লীলাবতীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে রাজধানীতে রওনা হলেন। লীলাবতী একটাও কথা বল্লে না কিন্তু তাকে রাজা নিয়ে গিয়ে একেবারে বিয়ে কর্‌বেন বলে ঘোষণা করে দিলেন। রাজপুরুত ঘাড় নেড়ে বল্লে না তা' হতে পারে—না, ও ডাইনি, ওই রূপ ধরে রাজাকে ভুলিয়েছে।

রাজা সে কথায় কান না দিয়ে লীলাবতীকে ঠিক তাঁর নিজের ঘরের পাশেই একটা সুসজ্জিত ঘরে বিশ্রাম করতে বল্লেন।

সে ঘরে গুহার বিছুটী গাছ, বোনা একটি ও আধখানা একটি চাদর সমস্তই আনা হয়েছিল। রাজা বল্লেন—এই সব দেখলে তোমার মনে হবে তুমি কি কষ্টেই ছিলে।

লীলাবতী শুধু একটু হাসলে, এইজন্যে, যে সে তার ভাইদের জন্যে মুক্তির চাদর তৈরী কর্‌তে পারবে।

সেইদিনই ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'ল বন থেকে আনা রূপসী বোবা মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে হবে। সে চাদর তৈরী করতে লাগ্‌লো—যখন সাতটা শেষ হ'য়ে গেল তখন একগাছিও বিছুটি নেই। জ্যোৎস্না রাত্রে সে রাজপ্রাসাদ থেকে গুহার ধারে গাছ তুল্‌তে গেল কিন্তু রাজা ও রাজপুরুত তাকে দেখতে পেলেন।

সে যখন গাছ তুল্‌ছে তখম সেখানে গোটাকতক ডাইনি বড় বড় পাথরের ওপর

বসে ছিল। লীলাবতী ঈশ্বরের প্রার্থনা কর্‌তে কর্‌তে গাছ তুলতে লাগলো। রাজা সেই ডাইনীদের দেখে ও সেখানে লীলাবতীকে দেখে স্থির কর্‌লেন সে-ও ডাইনি!...

রাজা লীলাবতীর বিচারের ভার প্রজাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। তারা বল্লে রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক্‌। রাণীকে একটা অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ঘরে ভরে দেওয়া হ'ল; বিছানা ও বালিশের বদলে সেই বিছুটীর গাছ ও চাদরগুলি ছুঁড়ে সেইঘরে দেওয়া হ'ল। সে নিজের কষ্ট ভুলে চাদর তৈরী কর্‌তে লাগ্‌লো।

সন্ধ্যের সময় তার ভাইদের ঘরের সাম্‌নে আসতে দেখে লীলাবতী আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগ্‌লো। যদিও সে জান্‌তো কালকেই তার এ জগতে শেষ দিন।

সে চাদর বুনে যেতে লাগ্‌লো।

পাঁচ

সবে আকাশ ফুটফুটে হয়েছে,—তখন ও লীলাবতীর ভাইদের রাজহাঁস হ'তে ঘণ্টাখানেক বাকি!...তারা রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে এসে রাজার জন্য হাঁকাহাঁকি কর্‌তে লাগ্‌লো।

যখন রাজা এলেন তখন তারা হাঁস হয়ে আকাশে ডানা মেলে উড়তে আরম্ভ করেছে।

লীলাবতীকে একটা খোলা গাড়ী করে পোড়াবার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সে তখন ও শেষ চাদরটা বুনে যাচ্ছে!...

সহরের সমস্ত লোক চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—দেখ! দেখ! শেষ সময়েও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করে ডাইনী মায়া-জাল বুন্‌ছে,—কেড়ে নাও।

এগারোটা হাঁস কোথা থেকে ঝটপট্‌ ঝটপট্‌ কর্‌তে করতে এসে পড়্‌লো।

লীলাবতী চট্‌ করে এগারোটা চাদর তাদের এগারোজনের ওপর ফেলে দিলে, তখুনিই তারা এগারো জন সুশ্রী রাজপুত্র হয়ে গেল। কিন্তু ছোটভাইয়ের একখানা হাতের জায়গায় একটা ডানা থেকে গেল, কেননা একটা দিকে একটু কম বোনা ছিল।

লীলাবতী বল্লে—আমি নির্দ্দোষী। বল্‌তে বল্‌তে সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো ও সেখানে

একটা লাল গোলাপের ঝাড় তৈরী হয়ে গেল ও ঝাড়ের ওপরে একটা মস্ত বড় শাদা গোলাপ ফুটে উঠলো ; বড় ভাই সমস্ত ব্যাপার আগা গোড়া বল্লে ! ..রাজা ঝাড় থেকে সব চেয়ে শাদা গোলাপটা তুলে নিয়ে লীলাবতীকে পরিয়ে দিতেই সে তারার মত স্নিগ্ধ চোখতুটী চেয়ে জেগে উঠ্‌লো !...মধুর ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল আগামী কল্য রাজার সঙ্গে লীলাবতীর শুভ বিবাহ।

পূজোর মুকুল

অভিমানী খুকুরাণী কহে করি আব্দার।
কি দিবে পূজায় মোরে বল বাবা এইবার॥
চাহিনা জরির সাড়ী, চাহিনাক কান-ফুল।
চাহিনা তারের বালা, চাহিনাক হার দুল॥
চাহিনা সেমিজ বডি, চাহিনাক ঘাঘ্‌রায়।
চাহিনা সুরভি তেল, সে সবে না মন যায়॥
চাহিনা খেলনা নানা, চাহিনাক ক্রুচ'লেস্‌।
চাহিনা মতির মালা, চাহিনাক রাজবেশ॥
চাহিনা রুমাল রাঙা, চাহিনা সাবান আর।
চাহিনা রঙিন ফিতা, চাহিনাক ফুল সার॥
মোর প্রতি ভালোবাসা যদি তব অকপট।
পূজার "মুকুল" তবে কিনে দাও চট্‌পট্‌॥

পূজোর পোষাক

[শ্রীমোহিতলাল মজুমদার]

এবার পূজোয় কন্যা আমার (বছর বয়স তিন)
চেয়েছিলেন জামা জুতো ধুতি এষ্টাকিন্!
গিন্নির বড়ই ইচ্ছে ছিল একটা দামী ফ্রক্,
মেয়ের খেয়াল অন্য রকম—'বাবা' সাজার সখ্!
মায় সে রুমাল চাদর এবং মনিব্যাগও চাই,
এনে দিলাম ফর্দ্দ-মতন, বাকি কিছুই নাই।
সব চেয়ে তাঁর ধর্‌ল মনে পাঞ্জাবী আর জুতো.
বল্লেন তবু "নেইক' কেন জুতোয় বাঁধা 'সুতো'?"
পাঞ্জাবীটা এত ভালো—ভাবনা হ'ল বেজায়—
বাবা যদি নিজেই পরে—ঘটির জলে ভেজায়!
বল্লে, "তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, দেব লজঞ্জুস—
পোরো না'ক আমার জামা!"—দিলেন চুমা ঘুষ।
মনিব্যাগটা খালি দেখে ফেলে দিলেন টেনে—
বল্লেন 'তুমি দিলে না যে পয়সা কিনে এনে!"
শেষে যখন বাবার মত হ'ল সকল সাজ,
হ'ল সারা মায়ের হাতে চুলের কারু কাজ,
গট্ গটিয়ে কাছে এসে বলেন হেসে মেয়ে
"কেমন আমি বাবা হলাম, দেখ দিকিন চেয়ে!"
ভাবলাম বুঝি গেলাম বেঁচে, ফাঁড়া গেল কেটে—
হঠাৎ মেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ঠোঁট দুখানি এঁটে!
বল্লেন শেষে (শুনে আমি ছেড়ে দিলাম হোপ্)
"বাবা, তুমি আমার জন্যে আন্‌লে না যে গোঁপ!"

পূজোর কাপড়

[শ্রীপ্রনবকুমার রায়]

সবুজ ধানের মঞ্জরীর দুল কানে প'রে আর শেফালি ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে শরৎ-লক্ষ্মী আবার এসেছেন!

জান্‌লার ধারে বসে সুধীর রাস্তার পানে তাকিয়েছিল। সকালবেলায় সোনার মত রোদে চারিধার ভরে গেছে। বাউলেরা একতারা বাজিয়ে আগমনী গান গেয়ে ভিক্ষে করছে; কাপড়-জামার দোকান গুলিতে সাজানো রঙিন্ পোষাকের দিকে চেয়ে ছেলেদের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে ......কাল ষষ্ঠী।

সুধীরদের বাড়ীতে পূজো হয় প্রতিবছর, ভিতরে কারিগরেরা প্রতিমা সাজাচ্ছিল। অনেক লোকজনে বাড়ীটা কোলাহলে ভ'রে উঠেছে।

—হঠাৎ বছর সাতেকের একটী রোগা কালো ভিখারীদের ছেলে তার জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখখানা তার ঝরা পাতার মত শুখিয়ে উঠেছে, পরণে ধূলোয় ময়লা কাপড়খানার কোন জায়গা আর আস্ত নেই।

সুধীরের দিকে চেয়ে সে মিনতি করে বল্‌ল—"একটা পয়সা দাওনা বাবু -কিছু খাইনি ..." সুধীর ধমক্ দিয়ে উঠ্‌ল—"যা যা ভাগ্—পয়সা পাবি না—" ছেলেটা মুখখানা ম্লান করে চলে গেল।

তার ম্লান মুখ দেখে এবার সুধীরের প্রাণে দরদ জাগ্‌ল। আহা, সত্যিই হয়তো ও খেতে পায় নি— একটা পয়সা দিলেই হোত;······তার মনে পড়ল—কাল কবিতায় পড়েছে —

"মাতৃহারা মা যদি না পায়—
তবে আজ কিসের উৎসব···"

ওর কাপড় খানা কি বিশ্রী নোংরা —ওকে কি কেউ একখানা নতুন কাপড় কিনে দেয় না? বেচারা...তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটী কাঁটা বিঁধে ব্যথা দিতে লাগ্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে সুধীরের বাবা ঘরে ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করলেন - "এবার পূজোয় কি রকম পোষাক নিবি রে সুধীর?"

সুধীর একবার কি যেন ভাব্‌লে, তারপর তার দু'খানি নরম হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"এবার আমার আর কাপড় চাই না বাবা– আমার অনেক কাপড় আছে - তার চেয়ে তুমি সব ভিখারীদের একখানা করে নতুন কাপড় কিনে দাও -"

ভাদ্র মাসের ধাঁধাঁর উত্তর—১। চা ২। কুসুম ৩। ছায়া।

যাঁহারা ৩টী ধাঁধাঁর উত্তর দিয়াছেন :—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীমনোমোহন সেন, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, শ্রীঅনিলকুমার সান্ন্যাল, শ্রীমিহিরকুমার লাহিড়ী, শ্রীসুকুমার সান্ন্যাল, শ্রীরঞ্জিতকুমার সাহা, শ্রীসন্ধ্যারাণী সান্ন্যাল, কলিকাতা; শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু (বাঘ) বর্দ্ধমান; শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, কলিকাতা; কালোমামা, প্রবোধ মাষ্টার, অনিল, অশিত, পটল, ভবানী, শিবানী ও যতীন জানা কলিকাতা; লেখা ও তস্ত মাতা, মায়া, মণ্টু, যমুনা, সরযূ, উর্ম্মিলা, শান্তু, ভোলা, খোকন, রাধু ও জিমি, বাঁকুড়া; শ্রীরণজিতকুমার গুপ্ত, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত, শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, শ্রীঅভিজিৎ কুমার গুপ্ত, শ্রীনীলীমা দেবী, শ্রীপূর্ণিমা দেবী, শ্রীপ্রকৃতিপ্রসন্ন গুপ্ত, শ্রীমতী সুকৃতিপ্রসন্ন গুপ্ত, শ্রীনীহারবালা দেবী, দেবপ্রসন্ন গুপ্ত, কানু, রেনু, বিলু গুপ্ত আরা; শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, কলিকাতা; শ্রীঅমিয়কুমার ও শ্রীবিনয়কুমার মিত্র, ধানবাদ; শ্রীতপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা; শ্রীমিহির চন্দ্র, অপরাজিতা, মনু, মুক্তি ও শিশির চন্দ্র রায়, পাটনা; শ্রীমতী বাণী দেবী, বর্দ্ধমান; কুমারী সুহাসিনী ও রমা সরকার, ভবানীপুর; কুমারী উষারাণী সোম, "ওসান ভিউ", ভিজাগাপট্টাম; শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিঃপ্রসাদ মিত্র, নিমাইরতন মুখোপাধ্যায়, বলাইচন্দ্র ঘোষ ও অমৃত লাইব্রেরীর মেম্বার বৃন্দ "সালিখা"; শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা; শ্রীচিত্তরঞ্জন, শান্তিরঞ্জন, স্মৃতিরঞ্জন, কান্তিরঞ্জন, জ্যোতিরঞ্জন গুহ এবং ছবি ও সুধীররঞ্জন রায়, ভবানীপুর; শ্রীঅশোক-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীদোলগোবিন্দ পাল, চুঁচুড়া; শ্রীভোলানাথ ঘোষ, কলিকাতা; কুমারী বিমল বরণী দেবী, বাজিতপুর; শ্রীগোকুলচন্দ্র বসু কলিকাতা; শ্রীবিমলকুমার রায়, পাটনা; শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ও নবারুণ সাহিত্য মন্দির, বরাহনগর; শ্রীবিমলাবালা সাহা, নাগপুর; শ্রীঅরুণচন্দ্র পালিত, কলিকাতা; শ্রীশান্তিপ্রিয়া বসু, পেগু (বর্ম্মা) শ্রীকেশব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅশ্বিনী কুমার সিকদার, কলিকাতা।

যাঁহারা দুইটী ধাঁধাঁর উত্তর দিয়াছেন :—

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মিতে দা, শৈলেন দা, শিবে, ভুলো, কেবলা, কড়াই, গৌরী, জাক্কি, ক্ষেত্র মোহন, দুর্গা ও অবনী ঘোষ, ভবানীপুর; কুমারী তরুলতা দে, কলিকাতা; শ্রীকালাচাঁদ বর্ম্মণ কলিকাতা; শ্রীগোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, রূপপুর, হাওড়া; শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার ও শ্রীঅনিলকুমার সিংহ, কলিকাতা; বাবু, ভাকু, মুকু, গুগি, শান্তি এবং রেণু, কলিকাতা; শ্রীদেবব্রত, প্রিয়ব্রত লাহিড়ী, কলিকাতা; আশালতা, শান্তি, প্রতিভা, জ্যোতি, কালীঘাট; শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীউষা দেবী, বর্দ্ধমান; শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুন্সী, হাজারিবাগ; শ্রীবলাইচাঁদ বসু, বর্দ্ধমান; শ্রীউষাপতি ঘটক, কালীঘাট; শ্রীচুনীলাল ঘোষ, ইণ্টালী; শ্রীপরেশনাথ কর্ম্মকার, কলিকাতা; শ্রীঅজিতকুমার মিত্র, কলিকাতা; সন্তোষ মজুমদার, কলিকাতা।

যাঁহারা একটি ধাঁধাঁর উত্তর দিয়াছেন :—

শ্রীসুধাংশুভূষণ মিত্র, উত্তরপাড়া; শ্রীমতী বাসন্তীলতা দেবী, (পেগু) বর্ম্মা; কুমারী সমিতা মজুমদার, শ্রীপতাকী চরণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

১ম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩২ { চতুর্থ সংখ্যা

নির্লোভ

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

বুকে তোর চাঁদমুখ
সুধু চাঁদ আকাশে
বল্ রাণী, কোন্‌খানি
বেশী সুধা মাখা সে
কার আলো বেশী ভালো
হাসি বেশী মিষ্টি
আঁখি-তারা দিশাহারা
যাচে কার দৃষ্টি
কে আমার বেশী প্রিয়
বল ঠিক্, চুমু দি'
কে লোটায় সুখে মন
কে ফোটায় কুমুদী!

গলে ডোর ভুজে ডোর
জালে ডোর, মৃণালে
বল্ নিধি কারে বিধি
ননী দিয়ে বিনালে
গায়ে তোর বেশহীন
দিলি রাণী গা মেলি
ঠায়ে ওই বায়ু ভরে
দোলে মৃদু চামেলি
কোমল কে বল্ বেশী
কেবা বেশী কান্ত
কার্ প্রেমে আসে নেমে
পরী পথ'ভ্রান্ত।

গেহে থাকে লাজ্-রাণী
রাজ-রাণী, প্রাসাদে
কারে আমি বেশী মানি
ব'লে প্রাণে আশা দে
ভাণ্ডার ভরা কার
আদরে কে রিক্ত
রীতিতে কে অবিচল
প্রীতিতে কে সিক্ত
ভূষাতেই রূপ কার
রূপ্ই কার ভূষারে
বরণের ছটা কার
গ'লে পড়ে তুষারে

তোরে হেরে গগনের
  শশী মরে মরমে
সোহাগের চাঁদ মোর
  জাগ্ জাগ্ মরমে
ভুল ভুল, তুল তোর
  ফুল কভু নয়রে
চঞ্চল লীলা তোর
  পারাবার বয়রে
কত লোকে কত চায়
  হীরা, মণি, মুক্তা
আমি চাই, তুই থাক্
  মনে প্রাণে যুক্তা।

খোকা

(গল্প)

[শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির]

একদিন যখন সূর্য্য স'বে পূব আকাশে উঁকি দিয়েছে তখন খোকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে দেখ্‌লে সে মায়ের কোলে শুয়ে, আরও দেখ্‌লে জান্‌লা দিয়ে সুদূর মাঠের পর মাঠ আর তার মাঝ দিয়ে সাপের মত আঁকা বাঁকা পায়ে-চলা পথ চ'লে গেছে—

খোকা মাকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে পথ চল্‌তে সুরু কর্‌লে। প্রথমে খোকার বড় মন খারাপ হ'ল, কিন্তু মাঠের মাঝের সাপের মত রাস্তাটা শিগ্‌গীরই তার মন চুরি কর্‌লে,—সে সব ভুল্‌লে।

ছেলেকে বিদায় দিয়ে মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেন কিন্তু কি করা যায়,—ছেলেকে পথ চল্‌তে হবে তো!

খোকা চল্‌লো মাকে ছেড়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে। পথের পাশের সামান্য জিনিষগুলি তার মন আকর্ষণ ক'রে তার অজ্ঞাতেই যেন তাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো। একটা বড় রং চং এ প্রজাপতি তার দুটো হাল্‌কা ডানা প্রসারিত ক'রে দিয়ে খোকার সাম্‌নে দিয়ে উড়ে গেল। খোকা তার পেছনে ছুট্‌লে।——ছুট্‌তে ছুট্‌তে পার্‌লে না—ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লো। একটা বটগাছের তলায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলে। সবুজ সুকোমল ঘাসের ওপর সদ্য-ঝরা যেন একটি ফুল! লাল গোলাপের পাঁপ্‌ড়ির মত তার ঠোঁট্। সে ঘুমিয়ে পড়্‌লে।

সকাল হলে সে যখন চোখ খুল্‌লে

তখন দেখ্‌লে সে তার মায়েরই মত একজনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। খোকা প্রথমে একটু লজ্জা পেলে, কিন্তু শিগ্‌গীরই তার লজ্জা চলে গেল। খোকা তার একটি হাত ধ'রে বল্‌লে—"তুমি কে?" সে হেসে খোকার রাঙা গাল টিপে দিয়ে বল্‌লে,—"চিন্‌তে পার্‌লে না?—আমি যে তোমার মাসিমা!"

খোকা বল্‌লে,—"ও"।

মাসি মাকে ছেড়ে যেতেও প্রথম খোকার একটু কষ্ট হল কিন্তু তাকে যে অনেক দূর যেতে হবে! খোকা মাসিকে জড়িয়ে ধ'রে আদর নিয়ে, প্রণাম করে আবার পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে, সবুজ লম্বা ঘাস দু'হাতে ফাঁক করে এগিয়ে চল্‌লো। সূর্য্য ক্রমে মাথার ওপর এল। দূরে রাখালেরা বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছিল,—খোকার মন একটু চঞ্চল হয়ে গেল। সে চল্‌তে চল্‌তে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো ও এক মনে বাঁশী শুন্‌তে লাগ্‌লো। পথে চলার কথা ভুলে গেল। কতক্ষণ যে অমন ভাবে দাঁড়িয়েছিল তা সে নিজেই জান্‌তে পার্‌লে না। হঠাৎ সে দেখলে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে তারই মত একটি ছেলে আস্‌ছে।

খোকা তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বেশ সপ্রতিভ ভাবে তাকে জিজ্ঞেস্ করলে,—"তুমি কে ভাই?"

সে বল্‌লে,—"আমি তোমার বন্ধু।"

তারা দু'জনে পথ চল্‌তে সুরু করলে। তাদের কত রকম গল্প! খোকা বল্‌লে,—"তোমার ভাই ভাল লাগছে কি এই পথে যেতে?—আমার কিন্তু ভা-রী চমৎকার লাগছে"—

বন্ধু বল্‌লে, "আমারো খুব ভাল লাগ্‌ছে ভাই। জান ভাই, পথে আমি কেমন চমৎকার একটা পাখী দেখেছি—তার দু'টো পা, একটা লাল ঠোঁট—দু'টো ডানা—সে কেমন গান গায়—উড়ে বেড়ায়"।

খোকা ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌লে,—"আহ'-হাহা—আর বল্‌তে হবে না—কেনা জানে! আমি কেমন প্রজাপতি দেখেছিলুম, তার কেমন রং চং দু'টো বড় বড় ডানা—কেমন ফর্‌ফর্ করে উড়ছিল। চমৎকার ভাই!"

বন্ধু বল্‌লে,—"ধর্‌তে পার্‌লে না ভাই—খুব মজা হ'ত।—কেমন—না?"

খোকা বন্ধুর কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বল্‌লে,—"আমার কেমন মাসি—তোমার নেই—"

এই রকমে কত গল্প ক'রে তারা সে দিনটা কাটিয়ে দিলে। ক্রমে দিনের পর দিন কেটে গেল। খোকা আর তার বন্ধু দু'টো ভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলে গেল। যাবার আগে বন্ধু খোকার হাতটি ধ'রে বল্‌লে,—"ভুলো না ভাই।"

খোকা বল্‌লে, "তোমায় কি ভুল্‌তে পারি ভাই?"

তারপর বন্ধু বল্‌লে—"বিদায়"।

খোকাও উত্তর দিলে বিদায় করুণস্বরে,—"বিদায়।"

একলা প্রথম প্রথম খোকার মনটা খারাপ করতে লাগলো। খোকা এখন নামে খোকা, কিন্তু তার বুদ্ধিটা আর দেহটা ক্রমেই তার খোকা নামটার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। সে এখন সব বোঝে। সে গুন্‌গুনিয়ে গান গায় আর রাস্তা চলে। ক্রমে দিনের পর দিন কেটে গেল। বছরের পর বছর ঘুরে এল; বসন্তের আগমনে পৃথিবী প্রাণ পেয়ে তাজা হ'ল। গাছে গাছে কোকিল ডেকে উঠলো;—ডাকার বিরাম নেই। খোকার সমস্ত তরুণ অঙ্গ সেই কোকিলের ডাকে পুলক সঞ্চারিত হয়ে উঠতে লাগলো;—সে প্রতি-পদেই পুলকে শিউরে উঠে আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। হঠাৎ আকাশ কোণের কালো সর্ব্বনেশে মেঘের স্তূপ সূর্য্যকে ঢেকে ফেল্‌লে। খোকা বৃষ্টির ভয়ে গাছতলায় আশ্রয় নিলে। ক্রমে সূর্য্য মেঘের আড়াল দিয়েই অস্ত গেল। অন্ধকার সমস্ত বনটাকে গ্রাস করে ফেল্‌লে। খোকা সাম্‌নে তাকিয়ে ছিল,—কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিল না—ঘোর অন্ধকার! কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠলো,—খোকা দেখলে তারই দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। দুজনে সেদিন রাত্রি কাটালে গাছতলায়, অন্ধকার বাদল রাতে। সকালে উঠে খোকা বুঝলে, এর জন্যেই সে এত পথ এসেছে কষ্ট করে হেঁটে। খোকা বল্‌লে,—"চলো—আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে পথ এগোই—কেমন?

সে একটু হেসে নিজের হাতটি খোকার হাতে তুলে দিলে। তারা চল্‌তে লাগ্‌লো। সঙ্কোচের পর্দা কেটে গেল। কত কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা চলতে লাগলো।

মেয়েটি বল্‌লে,—"কি চমৎকার ফুল!"

খোকা ফুল তুলে মেয়েটীর খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে,—"তোমার নাম কি?

মেয়েটী একটুখানি হাস্‌লে। বল্‌লে,—'খুকী।"

নূতন যাত্রী খোকাখুকী আবার পথ চল্‌তে সুরু করলে। খোকার চোখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন আরো সুন্দর লাগ্‌লো, কিন্তু তারা পথ চলা থামালে না। ক্রমে ক্রমে দূরে তারা চমৎকার একটা জায়গা দেখতে পেলে। তারা মনের আনন্দে সেই খানে গিয়ে পৌঁছুলো। আর তাদের পথ চল্‌তে ভাল লাগ্‌ছিল না—তারা সেইখানে দুজনে মিলে কিছুদিন কাটাবে মনে ভাব্‌লে।

তারা সেইখানে পাতার কুটীর বেঁধে মনের সুখে কয়েক বছর কাটীয়ে দিলে। খুকীর কোলে ক্রমে একটী চমৎকার সুকোমল খোকার আবির্ভাব হল। এবার বাড়ীতে দুজনের নাম খোকা হয়ে যাওয়াতে এক জনের নাম হয়ে গেল—বাবা।

ক্রমে খুকীর কোলে আবার একটী খুকীর আবির্ভাব হ'ল। এবারেও বাড়ীতে দুজনের নাম খুকী হয়ে যাওয়াতে একজনের নাম হয়ে গেল—মা।

আর তাদের সেখানে থাকৃতে ভাল লাগছিল না। তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌লো—মা নিলেন ছোট্ট খুকীকে কোলে, আর বাবা নিলেন খোকাকে কোলে। খোকা কিন্তু অনভ্যস্ত পায়ে মাঝে মাঝে পথ চল্‌তে ছাড়্‌ছিল না। ক্রমে খোকা ভাল ক'রে হাঁটতে শিখ্‌লে পর তারা একটা চৌমাথা রাস্তার কাছে এসে পড়্‌লে। খোকার যাবার সময় হ'ল। সে উদাস ভাবে তার মা-বাবার দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটি রাস্তা ধ'রে চ'লে গেল। তার মা খানিক খোকার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর তিনিও এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে খুকীর কপালে চুমো খেয়ে খুকীকে বুকে চেপে ধরলেন।

মা-বাবা খুকীকে নিয়ে আবার চল্‌তে লাগ্‌লো। খুকীর মায়ের শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌লো। কয়েক বছর কাটলো—খুকী বড় হ'য়ে উঠ্‌লো। খুকী দেখ্‌তো তার বাবা দিন দিন যেন গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ছেন—কপালে তার চিন্তার রেখা দেখা দিচ্ছে। খুকী আরো দেখ্‌তো—তার বাবার কেমন যেন ছাড়াছাড়া ভাব। দেখে তার বড় দুঃখ হ'ত। খুকী পথে চল্‌তে চল্‌তে মা-বাবাকে নানা কথা জিজ্ঞেস্ ক'রে তাদের মনে এতটুকুও স্ফূর্ত্তি এনে দিতে কোনদিন দ্বিধা বোধ করে নি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা থেকেই প্রকৃতি-মা যেন কোন দুর্ঘটনার বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার করতে সুরু করেছিলেন। ক্রমে রাত্তির হ'ল—তারা একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছতলায় আশ্রয় নিলে।

সকাল হ'লে পর খুকী তার বাবাকে দেখ্‌তে না পেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। মায়ের দুঃখ দেখে সে আর স্থির থাকৃতে পার্‌লে না। কত খুঁজলে—পেলে না। দুর্ব্বল মাকে ধ'রে ধ'রে রাস্তা দিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করলে। কিছুদুর গিয়ে দেখ্‌লে রাস্তাটা দু'ভাগ হ'য়ে দু'দিকে চ'লে গেছে।—খুকী

কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলে না—তার বাবা কোন রাস্তায় গেছে। খুকী তার মাকে নিয়ে ঝোপের মাঝে ব্যাকুল দৃষ্টি ফেল্‌তে ফেল্‌তে ভুল রাস্তাটা দিয়েই চল্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

খুকীর বাবা চল্‌তে লাগ্‌লো একলা। দিন নাই, রাত নাই; শীতের প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস কোনদিন তার মনকে দমিয়ে বা হরণ কর্‌তে পার্‌লে না। সে নির্ব্বিঘ্নে চ'লে গেল জ্যোৎস্না রাতে, নিবিড় ঘন গহন বনের মধ্যে দিয়ে। চল্‌ছেই—বিরাম নেই—অনন্তকাল হাঁট-লেও বোধ হয় তার ধৈর্য্য হার মান্‌বে না।—

তার সেই সুকোমল মূর্ত্তি আর নাই। তার মুখের চাম্‌ড়া কুঁচ্‌কে গেছে, গলার মাংস ঝুলে প'ড়েছে—মাথার চুল পেকে গেছে—কেবল সেই চোখের জ্যো'তি যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

সে দিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মন আনন্দে ভ'রে গেল। সে জোরে জোরে পা ফেলে এগিযে যেতে লাগ্‌লো।—সোজা রাস্তা!—রাঙা মাটির পথ!—পথের পাশে নানা রকমের ফুল গাছে নানারকম ফুল ফুটেছে—চারিদিক গন্ধে আমোদিত হ'য়ে উঠেছে। ক্রমে সূর্য্যটা পূব আকাশ লাল ক'রে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মার্‌লে। সারাটা জায়গা আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার মন কোন অজানিত বস্তু পাবার আশায় যেন নেচে উঠ্‌লো।—সকাল বেলা সূর্য্যের আলো যখন কোনো মেঘখণ্ডের ওপর প'ড়ে তাকে সুন্দর ক'রে তোলে—উজ্জ্বল ক'রে তোলে;—দূর থেকে যেমন মনে হয় একটি সহর জ্বলছে,—ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে—অপরূপ তার বর্ণশোভা!—তেম্‌নিতর একটি সহর মরীচিকার মত তার চোখে দেখা দিলে। উৎসাহে উন্মত্ত হ'য়ে সে ছুটে চল্‌লে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সেখানে পৌছুলো।—কি চমৎকার কি পবিত্র!—সে আনন্দের আতিশায্যে চারিদিকে কৌতূহল দৃষ্টি ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলতে লাগ্‌লো। হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে কিছুদূরে একটা মস্ত গাছতলায় অনেকে দাঁড়িয়ে যেন তারই অপেক্ষা কর্‌ছে। সে

সেখানে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাদের দিকে চেয়ে রইলো।—চিন্‌তে পেরেও সে তাদের চিন্‌তে পারছিল না। অভদ্রের মত ওরকম ভাবে তাদের দিকে চেয়ে দেখতে সে লজ্জিত হয়ে পড়্‌লে। তাড়াতাড়ি জোরে জোরে পা ফেলে তাদের পাশ কাটিয়ে সে চ'লে যেতে আরম্ভ কর্‌লে। কিন্তু পেছন থেকে কে একজন ডাক্‌লে,—"খোকা"।

খোকা চ'ম্‌কে উঠে পেছন ফিরে খানিক অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।—তারপর ব্যাকুল ভাবে ডেকে উঠ্‌লো—"মা"।

মায়ের আর খোকার অনেকদিনের বিচ্ছেদ্-বেদনা তাদের নিজেদেরই স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ চোখের জল শান্তি দিলে।

ক্রমে খোকা সবাইকে চিন্‌তে পার্‌লে।—তার সেই মাসিমা আর বন্ধুকে সে সবার আগে চিন্‌তে পার্‌লে। পথের দেখা, পথের চেনা সকলের মুখ ক্রমে ক্রমে সে চিনে বার কর্‌লে।

হঠাৎ খোকা গম্ভীর হ'য়ে গেল—সকলের মধ্যে একটি মুখ খুঁজে বার কর্‌তে না পেরে। এই মিলনের মধ্যে খোকা যে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল তা, খোকার মা লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন,—"তারও আস্‌তে দেরী নাই।"

খোকা চম্‌কে উঠে বল্‌লে,—"কার?"

খোকার মা বল্‌লে,—"তোমার স্ত্রীর।"

খোকা বল্‌লে,—"কি ক'রে জান্‌লে?"

খোকার মা বল্‌লে,—"আমি সব জানি।"

খোকা আবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে,—"তবে খোকাখুকার?"

খোকার মা বল্‌লে,—"তাদের জীবনের কাজ যে এখনো শেষ হয় নি।"

খোকা বল্‌লে,—"ও"।

রবিবারে

[শ্রীনলিনীভূষণ দাশ গুপ্ত এম্-এ]

বোলো না মা আজ বোলো না
তোমার কথা শুন্‌তে—
একলা বসে ঘরের কোণে
'নামতা' 'কাহন গুণতে।
সাতটি দিনের একটি দিন এ,
চল্‌তে দে মা ও সব বিনে;
রবিবারটা কাটুক্ খালি
'নাটাই' 'ঘুড়ী' বুন্‌তে
নিত্য কি ছাই লাগে ভালো
'নামতা' 'কাহন' গুন্‌তে!

আজ্‌কে না হয় নাই বা এল
বাড়ীর গুরুমশাই
সবার ছুটি থাক্‌তে পারে
তার কি মা গো তা' নাই!
এবার এলে বলিস্ তারে
একটি দিন এ রবিবারে
খেলাধুলা করতে খালি
অমনি ছুটি চাই মা
সবার ছুটি থাক্‌তে পারে,
আমার কি তা নাই মা?

'রুটিন্'-বাঁধা নাওয়া খাওয়া
নিয়ে সুবোধ সঙ্গ
কক্ষণো তা হচ্ছে না মা
আজকে রুটিন্ ভঙ্গ।
ঝুপ্ ঝুপা ঝুপ্ আজ দুপুরে
ঝাঁপাই-ছোড়া 'তালপুকুরে'
গাছে চড়া ঝুলন-দোলা
আরো কতই রঙ্গ
আজকে মানা চল্‌বে না মা
আজ্‌কে রুটিন্ ভঙ্গ।

একটা ছোট গল্প

[শ্রীফণী গুপ্ত বি-এস্-সি]

বিলাসপুর একটি ছোট গাঁ। আগে এখানে বেশী লোকজন কোনদিনই ছিলনা। সমস্ত গাঁ টা ঘুরলে দেখতে পাওয়া যেত পুরাণো জমিদার ঘোষেদের হাড়-বার করা কঙ্কালের মত ইট-বার করা দু'তিন মহল বাড়ী ; আর আশে পাশে তাদেরই দু'চার ঘর আত্মীয় আর পাঁচ সাত ঘর বামুনদের বাস। অন্য একটা পাড়ায় বিশ ত্রিশ ঘর দুলে বাগ্দীদের বাস। গাঁয়ের লোকেরা ছিল ভারী বদ। পরস্পরে কারুর সঙ্গে তাদের সদ্ভাব ছিল না। এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করতো ; একজন আর একজনের মাথা ফাটিয়ে দিলে। কেউবা কারুর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে। এই ছিল তাদের নিত্য কর্ম্ম। তারা বুঝতো

না যে এ রকম ঝগড়া ঝাঁটি করলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি। সত্যিই তাই হ'ল। গাঁটি ছিল নদীর ধারে। গাঁয়ের মাটি ছিল খুব ফলন্ত। সেখানে বিস্তর ফসল হ'ত। একদিন দু চারজন অন্য দেশের লোক সেখানে এসে ভাবলে, "বাঃ দেশটি তো বেশ। তারপর

দলে দলে এসে তারা সেই দেশ ছেয়ে ফেল্‌লে। তবুও বিলাসপুরের লোকেরা নিজেদের অবস্থার কথা টের পেলে না। তাদের প্রকৃতি ঠিক আগেকার মতই রইলো। তাতে করে হল কি বাইরের লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলাসপুরে খুব বেড়ে উঠ্‌লো, বিলাসপুরের লোকেরা ভাবলে "বাইরের লোক বড় হয় তা সওয়া যায়; কিন্তু আমার ভাই আমার পাশের বাড়ীর লোক বড় হ'বে এ অসহ্য।" বাইরের বিদেশীরা এ দেখে হাসলে আর মনে মনে ভাবলে, "বেশ সুবিধেই হয়েছে।" জমিদার বাড়ীর ছোটবাবু প্রভাসবাবু ছিলেন ওরই মধ্যে ভাল লোক। তাঁর মনটা ছিল খুব উদার। তিনি দেখলেন দেশের এই অবস্থা, হয় তো দিন কতক বাদে দেশের লোকেরা খেতেই পাবেনা। বিলাসপুরে আলুটা আর ধানটা খুব জন্মাতো। এ দুটোই হ'ল এদেশের প্রধান খাদ্য। প্রভাসবাবু এ দুটো জিনিষ গুদামজাত কর্‌বার মনস্থ করলেন। তাঁর অবস্থা আজ কাল আর তেমন নয়। তাঁদের বিষয় সম্পত্তি সব ভাগাভাগি হয়ে গেছে আর এই ভাগাভাগির সময় বিবাদ ও মামলায় অনেক অর্থব্যয়ও হয়ে গেছে। এখন তালপুকুর নামটাই আছে কিন্তু তাতে ঘটিটি পর্য্যন্ত ডোবেনা। যা'হোক্ প্রভাসবাবু আলু আর ধান দু'টোই গোলাজাত করে ফেল্‌লেন। দেশের লোকেদের কথা আগেই বলেছি; তারা ভাবলে, "প্রভাসবাবুর মতলব খারাপ—দেশের লোকদের না খেতে দিয়ে মার্‌বার মতলব।" তাই ভেবে একদিন তারা তাঁর সেই গোলায় আগুণ লাগিয়ে দিলে। হু হু করে আগুণ জ্বলে উঠ্‌লো, প্রভাসবাবু এ বিপদে তাঁদের সাহায্য চাইলেন। তাঁর দু'চারজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ তাঁর সাহায্য করতে এলো না। সকালে উঠে দেখা-গেল প্রভাসবাবুর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। কেউ তাঁর প্রতি একটু সহানুভূতিও দেখালে না, বরং নুন দিয়ে পোড়াআলু খেতে খেতে প্রভাসবাবুর একটু অসাক্ষাতে বল্লে, "রোজ রোজ যদি এমন আলুর গোলা পোড়ে তো বেশ হয়।" প্রভাসবাবুর কাছে আকারে ইঙ্গিতে

খবরটা গেল। কে কে আগুণ লাগিয়েছে তা' তিনি জান্‌তে পারলেন, কিন্তু কাউকে তিনি কোন কথা বল্লেন না।

তাদের একটা শিক্ষা দেবার জন্য এবার প্রভাসবাবু একটা কেরোসিন তেলের গুদোম করলেন। গুদামটা শীঘ্রই ইনসিওরড্ করে নিলেন। তাঁর প্রতিবেশীরা আবার তাঁকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে বলে তাঁর গুদামে আগুণ লাগিয়ে দিলে। ঠিক সেই রকম অগ্নি জ্বলে লঠ্‌লো তবে এটা কেরোসিন তেলের আগুণ ব'লে তেজ হ'ল ঢের বেশী। আগুণ আধখানি গ্রাম তার লক্‌লকে জিভের ডগায় গ্রাস করে নিলে। আগুণ ক্রমশঃ এবাড়ীর চাল থেকে ওবাড়ীর চালে উড়ে উড়ে যেতে লাগ্‌লো। আগুণের হল্কায় আকাশের বুকটাও পুড়ে যেতে লাগলো। যারা আগুণ লাগিয়েছিল তাদের বাড়ী ছিল আশে পাশেই। সেই দাবানলে তাদের বাড়ীও ছাই হয়ে গেল। তারা সব হায় হায় করতে লাগলো। পরদিন প্রভাসবাবু ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোকদের ডেকে এনে আগুণের চরম কীর্ত্তি দেখালেন।—তিনি তাদের কাছ থেকে টাকা পেলেন। তাঁর আগের ক্ষতি এবারের ক্ষতি দুটোই পূরণ হয়ে গেল। প্রভাসবাবু কি শিক্ষা দিলেন বল'তো ?

"তোমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাস ; তাদের কোন ক্ষতি করো না কেননা তাদের ক্ষতিতে তোমারও সমূহ ক্ষতি।"

দেওয়ালী

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

১

আজ্‌কে রাতে বড্ড মজা ! ঘর বাড়ী ঘোর ঝক্‌ঝকে !
চৌদিকে আজ আলোর পাথার, আঁধার জগৎ ধক্‌ধকে !
ফানুস চলে আকাশ ঘুরে
হাউই ছোটে বোঁ-বোঁ সুরে,
থির দিঠিতে চেয়েই আছি, নিচ্ছি দেখে' প্রাণ ভরে' !
ওই বুঝি রে পড়্‌লো হাউই ! পড়্‌লো বুঝি শির' পরে !

২

চারদিকেতে পট্‌কা ফোটে, ভীতু যারা 'বাপ্‌' ডাকে।
কোলের ছেলে চম্‌কে ওঠে, তুব্‌ড়ি দেখে' মুখ ঢাকে।
হাস্য মুখে রাস্তা দিয়ে,
যাচ্ছে বুড়ো কন্যা নিয়ে,
নিচ্ছে দেখে'—নিচ্ছে এঁকে; এই বুঝি রে শেষ ত্থাখা!
দীর্ঘ নিশাস ছাড়্‌ছে আবার—ভাব্‌ছে সে যে আজ একা!

৩

ওইরে আবার হাউই ছোটে! ত্থাখ্‌না কেমন একগুঁয়ে!
লক্ষ্য পানে ঠিক ছুটেছে; কোথাও কি সে রয় নুয়ে?
বোঁ-বোঁ করে' আকুল প্রাণে,
ছুট্‌ছে কেমন আকাশ পানে,
ধরার ধূলোয় রইবে না সে; এই তুনিয়ায় সব ফাঁকা!
ওই শোনো, ভাই, ডাকছে কে ওই! ব্যর্থ কিগো তাঁর ডাকা?

৪

কি মজার ওই ফানুস আবার, ঊর্দ্ধে তাহার চাই ওঠা!
অল্প সময় রইবে বেঁচে, বিরাম-বিহীন চাই ছোটা!
মরা বাঁচার নেই ভাবনা,
একমনে তার চাই সাধনা,
ধীরে ধীরে যাচ্ছে উড়ে, নাম্‌তে নীচে নাই আশা।
এম্‌নি জীবন হোক্‌ না মোদের! জীবনটুকু হোক্‌ খাসা!

৫

হাউই ফানুস উড়্‌ছে দেখে' পট্‌কা মরে বুক ফেটে!
ফট্‌ ফটা ফট্‌ ফোটার পরে পিষ্‌ছে সবাই পায় হেঁটে!
গর্ব্বী যারা এম্‌নি তারা,
ঘরে বসেই ল্যাজটি নাড়া

নাইকো গতি, ধর্ম্মে মতি, নাইকো প্রাণে সেই আলো !
ভিতরে যার নাইরে কিছুই, বাইরে পোষাক জমকালো !

৬

ফানুস যেমন ঊর্দ্ধে ওঠে, হাউই ছোটে যেই পথে,
জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে নিয়ে ছুটবো মোরা সেই মতে !
ফিরবো না আর পেছন দিকে,
উজ্জ্বলতা যাবই লিখে,
প্রাণের খোরাক ফুরিয়ে গেলে মরবো তখন টপ্ করে' !
মিলিয়ে যাবো কোন্ অসীমে, কেউ পাবে না বুক ভরে' !

৭

আজ্‌কে রাতে বড্ড মজা ! আকাশেতে ফুলঝুরি !
ছেলে যুবা মাত্‌লো সবাই, তুবড়ি দেখে' তুড়্‌বুড়ি !
ছুটছে হাউই, উড়্‌ছে ফানুস,
হাঁ করে' রয় হাজার মানুষ,
তারার আলোয় নাইকো আলো, ব্যর্থ তাদের ফিক্‌ফিকি !
হাতের গড়া আলোয় আজি রূপের কেমন ঝিক্‌মিকি !

বীর সিং

(গল্প)

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী]

আমাদের গ্রামের মধ্যে চোর ডাকাত প্রায়ই উপদ্রব কর্‌ত। চোর ডাকাতের এত উপদ্রব দেখে, গ্রামের মধ্য হ'তে কতকগুলি নেতা জেগে উঠ্‌লেন।

তাঁরা রাত্রে কেবলই পাহারা দিতেন কিন্তু তাতে চোরের কোন অনিষ্ট হ'ত না। কেন না নেতারা তাঁদের বাড়ীর মধ্যে নিজের জিনিষ চুরি যাতে না' যায়, তাতেই তাঁরা ব্রতী ছিলেন। সেই জন্যই যাঁরা জাগ্‌তে পারতেন না, তাঁদের বাড়ীতেই চুরি হ'ত।

এটুকু ভাব যখন আমাদের প্রতিবেশী বীর সিং বুঝতে পারলেন, তখন তাঁর মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। গ্রামের সকল নেতাদের উপর ভয়ানক চটে গিয়ে তিনি পুলিশে সংবাদ দিলেন—"আমরা রোজ একশো পুলিশ চাই !"

পুলিশের লোকে তাঁর কথাগুলির মানে ভেদ করতে পেরে ; সেটা পাগলের প্রলাপ ব'লে ভেবে নিলেন।

তখন আর বীর সিং কি করেন ! নিজেই রাত জেগে চোর ধরবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন।

এই রকম ঠিক ক'রে তিনি যখন প্রথম রাত্রিতে পাহারা দিতে গ্রামে বাহির হলেন, তখন—একদল চোর তাঁকে একলা পেয়ে তাড়া কর্‌লে। তার ফলে তিনি একেবারে বাড়ীতে এসে হাজির হলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি পুলিশে ঠিক করে ফেল্‌লেন—"একশোটা পুলিশ চাই নহিলে

চোর ধরা যায় না। কাল রাতে আমি একলা অনেক চোর ধ'রে ফেলেছিলুম কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে কাউকে ও ধ'রে রাখতে পারলেম না।" । ক্রমে এ বীরত্ব কাহিনীটুকু গ্রামের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই বীর-সিংহের কাছে এসে রোজ রাত্রে পাহারা দিবে বলে স্বীকৃত হ'য়ে গেল।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকারে সারা পৃথিবী কালো হ'য়ে গেল। বীর সিং একটা মোটা লাটি নিয়ে, পাড়া প্রতিবেশীদের ডেকে পাহারা দিতে বেরুলেন।

বীর সিং খুব সাহসী ছিলেন ব'লে তিনিই সকলের আগে আগে এগুতে লাগলেন, আর সকলেই পেছিয়ে পড়ে' রইলেন।

পাহারা দিতে দিতে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে' এল। সহসা বীর সিং উদ্ধশ্বাসে পিছনে ছু'টে এলেন।

সকলে জিজ্ঞাসা করে উঠলো—"কি হয়েছে ?"

"ঐ ডাকাত এসেছে !"

"সেকিরে !"

"ঐ গ.ছটায় কি একটা শব্দ হ'ল"।

শুধু এই কথাটা বলে বারসিংহ হাওয়ার আগে আগে ছু'টে চল্‌লেন। পিছনে সকলে ছুটতে ছুটতে কেউ পা ভাঙলে, কেউ দম্ আটকে মরে' গেল, কেউ বা ছু'টে যে যার বাড়ীতে পালালো !

মুকুল বর্ষস্মৃতি বা বার্ষিক মুকুলে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এমন সময় একটা বন্দুকের ভয়ঙ্কর শব্দে বীর সিং আরও চমকে উঠ্‌লেন, ভাবলেন ডাকাত বুঝি আমায় ধরে ফেল্‌লে !

ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর কাছে এসে ডাকতে লাগ্‌লেন—"ওরে ! কে আছিস্, টপ্ করে দোর খুলে দে"

কিন্তু প্রথমে তিনি কারুর সাড়া পেলেন না। আবার একটা বন্দুকের শব্দ হ'ল; তখন তিনি আর ও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে দোর খুলে দে।"

বীর সিংএর সাড়া পেয়ে বাড়ী থেকে তাঁর ছোট মেয়ে উত্তর দিল "যাই"।

বীর সিং যদিও সাড়া পেয়ে চুপ করলেন, তথাপি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হ'ল। প্রতি এক মিনিট তাঁর এক যুগ বলে মনে হ'তে লাগলো।

তিনি আর একটা ভীষণ শব্দ শুনতে পেয়ে ভাবলেন, ডাকাত খুব কাছে এসেছে। এমন সময় একটা ভয়ানক বন্দুকের আওয়াজ উঠলো। তাতে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে দোরের সামনে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন।

তার পর তাঁর ছোট মেয়ে সদর দরজা খুলে তার পিতার জ্ঞান-হীন দেহখানিকে ও রকম অবস্থায় প'ড়ে থাকতে দেখে ভয়ানক শব্দে চেঁচিয়ে উঠলো।

বীরসিং তাঁর ছোট মেয়ের আর্তনাদে নিজ প্রাণে পুনরায় জ্ঞান পেলেন ও কন্যার হাত ধরে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলে' গেলেন। এদিকে সদর দরজা বন্ধ করা হ'লনা।

বীরসিংহকে সকলে রাতের খবর জিজ্ঞাসা করতেই তিনি গম্ভীরমুখে বললেন "ডাকাত এসেছে!" এই কথাটুকু বলে তিনি বিছানায় আশ্রয় নিলেন।

বিছানায় শয়ন ক'রে বীরসিংএর চোখে আর ঘুম এল না। তিনি শুয়ে শুধু মনে করতে লাগলেন, সেই বন্দুকের শব্দ! আর সেই মাঝে মাঝে কোলাহল-ধ্বনি!

ভাবতে ভাবতে যখন তিনি একটু তন্দ্রায় আধ-ঘুমন্ত হলেন, তখন বাহিরের ঘরে একটা হুড়মুড় করে শব্দ হ'ল।

তৎক্ষণাৎ তাঁর তন্দ্রাটুকু ভেঙ্গে গেল। তিনি ভাবলেন আর রক্ষা নেই, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। অস্ফুটস্বরে তিনি ডাক দিলেন তাঁর সেই ছোট মেয়েটিকে "ও মিনি ডাকাত এসেছে!"

মুকুল বর্ষস্মৃতি বা বার্ষিক মুকুলে
শ্রীঅনিল গঙ্গোপাধ্যায়

মিনি ছিল সজাগ। তাই যখন তার পিতার নীরব আহ্বানটুকু শুনলে তখন সে ভাবলে ডাকাত বুঝি একটা মজার জিনিষ। সে বললে—"বাবা কোথায়?"

"বাইরের ঘরে।"

"বাবা! চলনা ধরিগে।"

"শেষকালে মেরে ফেলুক আর কি?"

"সে কি বাবা! তুমি যে চোর ধরতে পার!"

"এ চোর নয়, ডাকাত—ডাকাত।"

মিনি চোর কাকে বলে জানতো কিন্তু ডাকাত যে কি জিনিষ সে মোটেই জানতো না। তাই সে বিছানা থেকে নেবে একটা আলো জ্বেলে বল্লে—"বাবা! বল তাড়িয়ে দিয়ে আসি।"

তখন আবার বাহিরের ঘর থেকে শব্দ হ'ল—ঝন্ ঝন্—ঝনাৎ।

বীরসিং মেয়ের কাছে নিজের মান বজায় রাখ্‌তে একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন—"আবার আবার সেই কামান—গর্জ্জন।" এই চেঁচানিটুকুতে বাড়ীর সকলেই জেগে উঠলো। বাড়ীময় গোলমাল পড়ে' গেল।

বীরসিংকে 'ঘটনা কি' জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বল্লেন "ডাকাত পড়েছে।"

এবার মিনি দৌড়ে বাহিরের ঘরের দিকে ছুটলো ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলেই তার অনুসরণ করলে এবং পিছনে ধীর-পদক্ষেপে বীর সিং আপনাকে বীরশ্রেষ্ঠ মনে করে "ডাকাত" ধরতে অগ্রসর হলেন।

সকলেই বাহিরের ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান। বীর সিং চেঁচিয়ে বল্লেন—"ঘরে ঢোক।"

এমন সময় আবার জোরে শিশি-বোতল ভাঙ্গার শব্দ হ'ল।

এবারে বীর সিং আপনার নামের মর্য্যাদা না রাখতে পেরে সকলের সাম্‌নেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন; তখন মহা হৈ চৈ বেঁধে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যখন বীর সিং আবার চৈতন্য লাভ করলেন তখন বহিরের ঘরের দ্বারে কে ঘা মারলে।

বীরসিংহের কনিষ্ঠা কন্যা বাহিরের ঘরে ঢুকতেই একটা ছোট্ট বেড়াল পালিয়ে গেল ঘরময় জিনিষ-পত্র ভেঙ্গে চুরমার ক'রে মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়ে।

খোকার ঝুম্‌ঝুমি

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়]

খোকা নাড়ে ঝুম্‌ঝুমি ঝম্ ঝম্ ঝম্,
আকাশেতে তারা কাঁপে থম্ থম্ থম্,
যেওনা কোথাও আজ,
ফেলে রাখ সব কাজ,
বিনা মেঘে ধারাজল ঝরে হর্‌দম্,
খোকা নাড়ে ঝুম্‌ঝুমি ঝম্ ঝম্ ঝম্।

রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্,
ভোমরা দেমাক্‌হারা কেঁদে হ'ল খুন,
রাঙা গালে টুল টুল
খুসির ফুটেছে ফুল,

লাখ্ মৌমাছি গায় গুন্ গুন্ গুন্,
রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্।

ঝুম্ ঝুম্ ঝন্ ঝন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্,
ঘুরে ফিরে সাত সুর গায় রাত দিন,
সভায় কদর হারা
তানসেন ভেবে সারা,
নীরব বেহালা বাঁশী তুম্বুরু বীণ্,
খোকা নাড়ে ঝুম্ঝমি ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্।

দু'বছরের খুকী

[শ্রীইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সেদিন বিকেলে বেড়িয়ে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে এসে দেখি, সকলে ভয়ানক কান্নাকাটি ক'রছে। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে আমার ছোট মামা বল্লেন যে খুকীকে পাওয়া যাচ্ছে না। খুকী হচ্ছে আমার ছোট বোন, তার বয়স মাত্র দু'বছর, তাও এখনও পূরো হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই সে বেশ পাকা পাকা কথা কইতে পারে, সুন্দর গড়্গড়্ করে চলে যেতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে কতক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না? মা বল্লেন—"প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে পাশের বাড়ীতে ওদের মিনির সঙ্গে খেলা করতে গিয়েছিল, তারপর আর এসেছিল কিনা জানি না, কিন্তু মিনির মা বল্লেন যে তিনি খুকীকে বাড়ীতে আসতে দেখেছেন।" আমি তখুনি একবার পাশের বাড়ীতে খোঁজ নিলুম, মিনির দাদা ভুলু বল্লে, যে—সে নিজে খুকীকে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তবে, তারপরে আবার সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে কিনা, তা' সে জানে না। আমি তো মহা চিন্তিত হয়ে পড়লুম। ছোট মামা ব'ললেন—যে তিনি সুকীয়া ষ্ট্রীট থানায় খানিক আগে টেলিফোন ক'রে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, কিন্তু তারা বলেছে যে কোনও ছোট মেয়ে বা ছেলে কিছু তা'রা পায়নি। আমি তখন বেরিয়ে প'ড়ে আশে-পাশের বাড়ীতে, আর দোকানে জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম। কিন্তু কেউই কিছু বল্‌তে পারলে না। তখন আমার কান্না পেতে লাগ'লো।

আমাদের বাড়ী সিমলা ষ্ট্রীটে। আমি সিমলা ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়লুম। সেখানেও অনেককে জিজ্ঞাসা করলুম যে কেউ একটী ছোট মেয়েকে একলা চলে যেতে দেখেছে কিনা? কেউ কিছু খবর দিতে পারলে না।

সুকীয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে, সে বল্লে—"নেহি, বাবু, হাম্ কই লেড়কী কো নেহি দেখা হ্যায়"। বলেই সে খানিকটা খৈনী নিয়ে টুক্ করে মুখের মধ্যে ফেলে দিলে।

এদিকে খুঁজেও পেলুম না, অথচ বাড়ীতে যেতেও পা সরছিল না। যা'হোক কোনও রকমে বাড়ীতে গেলুম। বাড়ী যেতেই আমাকে একলা ফিরে যেতে দেখে, মা ও অন্য সকলে আরো কেঁদে উঠলেন। আমি আর কি ব'লব! অবসন্ন-দেহে দোতালায় গিয়ে, ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। খানিকক্ষণ ছোটাছুটী করে শরীরটা এমন খারাপ হয়েছিল যে আমার ঘুম পেতে লা'গলো।

একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময়—ও, কি ও! কার কান্নার শব্দ না? হ্যাঁ, হ্যাঁ খুকীইতো, খুকীর কান্নাই বটে! ঘুম ভেঙ্গে গেল। তড়াক্ করে লাফ্ দিয়ে উঠ্‌লুম্। চারিধারে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখি, খাটের তলায় খুকী বসে কাঁদছে, চোখ দুটো ফুলো ফুলো, আর পাশে দুটো ভাঙ্গা পুতুল পড়ে।

রকম সকম দেখে বুঝতে পারলুম, যে খুকুমণি, খাটের তলায় গিয়ে পুতুল খেল্‌তে খেল্‌তে এক ঘুম দিয়ে তবে উঠলেন। তবে এত জায়গা থাক্‌তে খুকুমণি যে কেন খাটের তলাটা পছন্দ করলেন, তা' বুঝ্‌তে পারলুম না।

বন্‌রাণী

[শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য]

১

হাসে   লাল্ মেঘে লাল্ রবি পূব আকাশে !
বহে   বন্ জুড়' মঞ্জুরে ধীর্ বাতাসে !!
গাহে   ভোর্ বায়ে পক্ষীরা বৈতালী গান্ :—
ওঠে   চোখ্ মেলি' ঘুম্ থেকে বন্‌মাতা সে !!

২

সারা   দিন্ ভরি তা'র্ ক্রীড়া-কৌতুকে হায়,—
করী   সিংহ হরিণ্-শিশু সাথ্ কেটে' যায় !!
শত   ব্যাঘ্র মহিষ্ বৃষ তার্ গো বাহন :—
শ্যামা   শুক্ শারী চন্দনা বন্দনা গায় !!

৩

ওঠে   নীল্ নভে মেঘ্ কালো বিজ্‌লী হানি' !
শিখী   রঙ্গে বেড়ায় নাচি হর্ষ মানি' !!
যত   ফুল্‌গুলি রয় চেয়ে তার পানেতে : –
এলো   চুল্ মেলি ধায়্ রাণী মন্-হারাণি !!

৪

ধীরে   সাঁঝ এলো ম্লান করি ওই সারা বন্ !
নীড়ে   তন্দ্রায় চোখ্ ভরা ধায় পাখীগণ্ !!
আসে   শ্রম্ হরিবার্ পশু অঞ্চলে রে :—
কি-সে   ঘুম ঘোরে রাত ভরি রয় নিমগন্ !!

৫

কিবা ফুট্‌ফুটে জোছ্‌না গো, টুক্‌টুকে চান্‌!
কিবা ফুর্‌ফুরে ধীর্‌ বায়ে ভুর্‌ভুরে ঘ্রাণ্‌!!
কিবা ফুল্ল সে ফুল্‌রাশি ছায় তরু শির্‌ঃ—
শুয়ে তার্‌ ছায়ে বন্‌রাণী ঘুম যে রে যান্‌!!

—০—

দাড়ী-মাহাত্ম্য

(রঙ্গ-কবিতা)

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

মুন্‌সেফ্‌ মকবালী
হারায়েছে গাম্‌ছা,
বাত্‌লায় দিন্‌ রাত্‌
খাবে নাকো জ্যাম, চা'।
হিসেবেতে যেই টাকা
জমে যাবে মাস-শেষ্‌,
সেই থেকে যাবে মিলে
গাম্‌ছা তো খাসা বেশ্‌!
বিবি তার বি-এ পাশ
বুদ্ধিতে বিদ্যুদ,
ব্যাঙ্কেতে জমে টাকা,
ফি বছরে পায় সুদ্‌।
বলে ডেকে "ছেড়ে দাও—
নাপিতের নেই কাজ,

জমে যাবে বিস্তর,
　　দাড়ী রাখা নয় লাজ।
কেনো' তাতে গামছা গো
　　ঢের সোজা পথ সে!
ছেড়ে তুমি দেবে যে চা'?
　　মোর নয় মত সে।"
বিবির সে উপদেশ
　　বিস্তর করে কাজ,
মুন্‌সেফ হাতে যেন
　　অস্তর পেল আজ।

সেই থেকে নাপিতের
　　আনাগোনা বন্ধ;
লাভেরি সে ব্যব্‌সাতে
　　নাহি রয় সন্দ।

মুখময় দাড়ী তার
থাকে ক্রমে জ'মতে
পথে লোক চেয়ে রয়
বুক চায় দমতে।

একদিন মকুবালী
যায় ধারে গঙ্গার,
সঙ্গেতে চাপ্‌রাসী
নাম তার রংদার।

দেখে এক ব্রাহ্মণ
ইয়া বড়া দাড়ী তার!
লম্বা ও ওজনে যে
তারো দাড়ী মানে হার!

মুনসেফ্‌ ডাকি কয়—
"হারায়েছে শাল তোর—
নাপিতেরে ফাঁকি দাও
তিন-কুড়ি বচ্ছোর।"

মশা মারতে গালে চড়

(গল্প)

[শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়]

নাম ছিল তার বাপ্পু। সে যেমন হাসি-খুশী, তেমনি সুন্দর, দুষ্টুমি বুদ্ধিও তার বড় কম ছিল না। তাকে কেউ কখনো অখুশী দেখেছে, কেউ বলতে পারবে না।

দুনিয়ায় তার একমাত্র বিধবা মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। গরীবের সংসার, অনেক কষ্ট করে তাদের দিন চলত।

একদিন মা কি কাজে ব্যস্ত; ছেলেকে বল্লে, বাবা, ঘরের মেঝেটা একটু ঝাট দিয়ে ফেল ত লক্ষ্মী।

বাপ্পু খুশী হয়ে মায়ের কথা মত ঘরের মেঝে ঝাট দিতে দিতে এক কোণে একটি পয়সা কুড়িয়ে পেলে। তখ্‌খুনি যেয়ে মাকে বল্লে, মা, মেঝেয় একটা পয়সা পেলাম, এটা আমি নিই?

মা বল্লেন, বেশ, নাও। কথা শুনলে এমন পাবে। যা-খুশী কিনে খাও গে।

ছেলের আনন্দ দেখে কে! সে খুশীতে নাচতে সুরু করে দিলে। জীবনে সে ত কোনদিন একটা পয়সায় যা-খুশী করবার সুযোগ পায়নি। তাই পয়সা নিয়ে তার ভাবনা হল, কি করে, কি কিনে তা দিয়ে, সে কি মনে করে দৌড়ে বাজারে গেল।

দোকানে কত রকম রকম খাবার সাজিয়ে রেখেছে সবই দামী, এক পয়সায় কোন জিনিষই মেলে না। আর একটা দোকানে দেখল, দিশী খেঁজুর রয়েছে তাই এক পয়সার কিনে নিয়ে সে বাড়ীর পথে চল্ল। কি মনে করে সে বাড়ী না যেয়ে পাশের

একটা করবী ফুলের গাছে উঠে বসে আপনার মনে গান করতে করতে খেঁজুরগুলি খেতে লাগল। আঃ কি মজা!

এখন সে পথ দিয়ে এক খুন খুনে বুড়ো যাচ্ছিল। গাছের উপর একটি সুন্দর ফুটফুটে নাদুসনুদুস ছেলেকে বসে থাকতে দেখে তার মনে শয়তানী বুদ্ধি জেগে উঠল। আসলে সেই বুড়োটা আর কেউ নয়—একটা রাক্ষস। সে এমনি মানুষের চেহারায় গ্রামে এসে বেছে বেছে এক একদিন এক একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে। সে বাপ্পুকে খেঁজুর খেতে দেখে মনে মনে ভারী খুসী হল। বাঃ, বেশ ছেলটি ত! তখন সে বাপ্পুকে বল্লে, বাপ্পু, লক্ষ্মীটি, আমায় একটি খেঁজুর দিবে না?

বাপ্পু অবশ্য আর সব ছেলেদের মত লোভী নয়, তাই বুড়ো চাইতেই তাকে একটি খেঁজুর নীচে ফেলে দিল। কিন্তু বুড়োটা তা লুফে নিতে পারলে না, ফলে খেঁজুরটা গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ে গেল। কাজেই বুড়োর আর খেঁজুরটা খাওয়া হল না। তাই রাক্ষসটা আবার তাকে বল্লে, আর একটী দাও কিন্তু সেটিও গিয়ে কাদায় মাখা হয়ে গেল।

বাপ্পু ভারী বিরক্ত হয়ে রাক্ষসটাকে বল্লে, বাঃ রে মজার লোক। বার বার তোমাকে দিব আর তুমি একবারও লুফে নিতে পারবে না! এত নষ্ট করতে পারি নে।

রাক্ষসটা বল্লে, লুফে নিব কি করে? তুমি ত হাতের উপর ফেলতে পার না। আচ্ছা এক কাজ কর, হাতে হাতে দাও, একটু নেমে এলেই পারবে। বাপ্পুর মত ভাল ছেলে আর দেখিনি!

বাপ্পু সরল মনে একটু নেমে হাত বাড়াতেই বুড়োটা খপ্ করে তাকে ধরে হিড় হিড় করে গাছ থেকে টেনে নামাল। বাপ্পু প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই বুড়োটার হাত ছাড়াতে পারলে না। বুড়ো তাড়াতাড়ি একটা থলের মধ্যে বাপ্পুকে পূরে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে, তারপর সেটা পিঠে ফেলে হন্ হন করে ঘরের দিকে চল্ল।

বাপ্পুর মত একটী ছেলেকে ব'য়ে নেবার মত গায়ের জোর কিন্তু বুড়োটার ছিল না। তাই বেশী দূর যেতে না যেতেই সে হয়রাণ হয়ে পড়ল, আর একটুও এগুতে পারছে না। তখন উপায় না দেখে সে একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে বসে পড়ল। একটু জিরুতেই তার শরীরটা অতিরিক্ত মেহনতে একেবারে এলিয়ে পড়ল, আর বসে থাকতে পারে না, সে গাছের নীচেই ঘাসের উপর শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য যে, বেশী সময় জিরুবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না কিন্তু উপায় কি ?

এদিকে বাপ্পু যেই বুড়োটার নাকডাকার ঘর্ ঘর্ শব্দ শুনতে পেল তখন আস্তে আস্তে পকেট থেকে ছুরিখানা বার করে চুপি চুপি থলের একটা দিক কেটে ফেলে গুড়িমেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে এসেই বাপ্পুর মনে হল যে, থলেটা খালি রেখে গেলে জেগে উঠেই সে তার চালাকি ধরে ফেলবে, তা কিছুতেই হতে দেওয়া ঠিক নয়। তখন সে তাড়াতাড়ি কতকগুলি মাটির ঢেলা এনে থলেটা ভর্ত্তি করে রেখে একটা সরু দড়ি দিয়ে কাটা দিকটা বেঁধে রেখে এক দৌড়ে বাড়ী চলে এল। সারাটা পথ তার কেবলি হাসি পাচ্ছিল। বুড়োটা যখন বাড়ী গিয়ে ছালাটা খুলবে তখন তাতে বাপ্পুর বদলে যখন মাটির ঢেলা দেখবে তখন কি মজাই না হবে! যেমন বদমায়েস, তেমন জব্দ! যা ব্যাটা, বাড়ী গিয়ে মাটির ঢেলার শুক্ত পাকিয়ে খা গে!

এদিকে বুড়ো রাক্ষসটা অনেকক্ষণ ঘুমোল। ঘুম ভেঙে উঠতেই তার শরীরটা বেশ তাজা হাল্কা বোধ হল। তখুনি সে থলেটা পিঠে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্ল। একবার এ কাঁধে আরবার সে কাঁধে, এমনি করে কাঁধ

বদলিয়ে বদলিয়ে সে পথ চল্ল। কিন্তু এত ভারী বোঝা নিয়ে সে ভারী মুশকিলে পড়ল, পথ চলতে ভারী কষ্ট যাই হোক, কষ্ট করে সটান বাড়ী গিয়ে পৌঁছল, পথে আর কোথাও জিরুলে না। বাড়ীতে ঢুকেই রাক্ষুসীটাকে আনন্দে চীৎকার করে বলে

উঠল, যা যা, শীগ্‌গির গিয়ে বড় ডেকৃচিটায় জল ভরে চুল্লীতে বসিয়ে দে। আজ ভারী ভোজ হবে, এমন ভোজ তুই কখনো খাসনি। আজ এমন সুন্দর নাদুস নুদুস একটি ছেলে এনেছি, অনেক দিন এমন আরাম করে খেতে পাই নি।

বুড়ী রাক্ষুসীটা খুসীতে ডগমগ হয়ে তাড়াতাড়ি উনুনে ডেকচি বসিয়ে দিলে। এদিকে বুড়োটা তখন মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি থলের বাঁধা দড়িটার ফাঁস খুলতে পারছিল না। বুড়ী এসে তাকে সাহায্য করতে লেগে গেল। যথাকালে থলের বাঁধ খুলে উপুড় করতেই নাদুসনুদুস সুন্দর ছেলের বদলে কতকগুলি মাটির ঢেলা বেরিয়ে পড়ল।

বুড়োটা চোখ দুটো কপালে তুলে সেই ঢেলাগুলির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল; বুড়ী কিন্তু এ দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। তার মনে হল, বুড়ো নিশ্চয়ই তাকে রাগাবার জন্যে এরকম বদমায়েসী করেছে। তাই সে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে বল্লে, কই তোর ছেলে কই? বার কর শীগ্‌গির, নইলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন। রোজ রোজ আমায় নিয়ে চালাকী! বল্‌তে বল্‌তে, বুড়ী রেগে কাঁই হয়ে গেল, এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামনেই একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা ছিল, তাই নিয়ে সে বুড়োকে তেড়ে গেল মারবার জন্যে। বুড়ো প্রাণের ভয়ে এক লাফে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল এবং মিঠে-সুরে বল্লে, সত্যি বলছি আমি, খুব সুন্দর মোটাসোটা একটি ছেলেকেই নিয়ে আসছিলুম। কি করে যে সে ছেলে মাটীর ঢেলা হয়ে পড়ল তা ত বুঝছি নে। ছেলেটার নাম বাপ্পু। পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখি সে একটা করবী-গাছে বসে বসে খেঁজুর খাচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ বদমায়েসী করেছে। আচ্ছা, তুই থাম্, আমি এখনি আবার

গিয়ে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসি। সে ছেলেটাও বদমায়েসী করে বেরিয়ে পড়ে এ কর্ম্ম করতে পারে।

বুড়ো রাক্ষসটা আবার তখনি বেরিয়ে পড়ল। সে যেয়ে বাগানে খুঁজল কিন্তু বাপ্পুর দেখা পেলে না। মাঠেও তাকে পেলে না। তখন সে যত পথ-ঘাট ছিল সব তন্ন

তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু কোথাও তাকে পেলে না। হঠাৎ উপরে চোখ পড়তেই দেখে বাপ্পু ছাদের উপর বসে দিব্য আরাম করছে।

সে যে বাপ্পুর উপর রেগেছে এটা কিছুতেই না জানিয়ে বেশ হাসি-মুখে মিঠে-গলায় বল্লে, কি হে বাপ্পু, খবর কি? ওখানে কি হচ্ছে, কি করে অত উঁচুতে উঠলে তুমি?

বাপ্পু বল্লে, কি করে উঠেছি তা তুমি সত্যই জানতে চাও?

রাক্ষস বল্লে, হাঁ। ছাদের উপর বসলে রোদ পোয়াতে ভারী আরাম, নীচেয় এত আরাম হয় না। কেমন, কি বল?

বাপ্পু বল্লে, আচ্ছা বলছি। কিন্তু তার মুখে হাসির ফাঁকে শয়তানির মতলবটা ফুটে উঠল। সে মনে মনে বল্লে, দাঁড়া-ব্যাটা তোকে মজা দেখাচ্ছি। কিন্তু মুখে বল্লে, এক কাজ কর। যতগুলি পার হাঁড়ি পাতিল জোগাড় কর এবং সেগুলি পর পর একটার উপর আর একটা সাজিয়ে একটা মই তৈরী করে ফেল এবং তা বেয়ে এখানে উঠে এসো। এ আর এমন কি শক্ত, খুব সোজা।

বেচারা রাক্ষস বাপ্পুর দুষ্টুমি ধরতে পারলে না। সে সত্যিই তার কথা বিশ্বাস করলে। ঘরের মধ্য দিয়ে যে একটা সিঁড়ি আছে তা তার জানা ছিল না। সে যাই হোক সে বাপ্পুর কথা মেনেই দৌড়ে পাশের বাড়ীতে যেয়ে যত হাঁড়ি পাতিল পেল নিয়ে গিয়ে সেখানে জড় করল। পাশের বাড়ীর লোকেরা তখন ভাগ্যিস বাড়ী ছিল না। পর পর একটার উপর আর একটা সাজিয়ে উঁচু একটা মইয়ের মত হতেই যেই সে তা বেয়ে উপরে উঠতে গেল অমনি তার ভারে সবগুলি একেবারে চুরমার হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ওর উপর দাঁড়ানও খুব সোজা নয়, হাত পা শরীর সবই কাঁপে। কিন্তু বুড়ো নিরাশ হল না, আবার উঠে সাহসের সঙ্গে হাড়ি পাতিল জমা করতে লাগল। কিন্তু সেগুলি তার ভর কিছুতেই সইতে পারে না।

শেষটায় তার ভারী রাগ হল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, উঠবই আমি যে করে হোক্, উঠবই। তাই সে যেই একটা লাফ দিয়ে গিয়ে ছাদে উঠবে মনে করে লাফ দিলে অমনি একদিকে সব হাঁড়ি পাতিল একেবারে ভেঙ্গে চুরমার; আবার দেওয়ালে মাথা ঠুকে সেও যেয়ে নীচে ধুপ্ করে পড়ে গেল। পাড়ার লোকজন শব্দ পেয়ে সব দৌড়ে এল। এসে দেখে তাদের হাঁড়ি পাতিলের অবস্থা, মেজাজ ভারী গরম করে তারাই

তাকে মেরে ফেলছিল কিন্তু ওই যে দেয়ালে মাথা ঠুকে সে অত উঁচু থেকে ভাঙা হাঁড়ি পাতিলের স্তূপের উপর পড়ে গেল, তাতেই বেচারার কর্ম্ম সাবার হয়ে গেল। সেই খানেই তার শেষ !

শিশুর সোহাগ

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার]

ডাক দিল কে আজ ভোরে ওই গহন কাননে
সুদূর হতে মন্দ মধুর বাঁশীর স্বননে ?
 হাওয়ায় ভাসা সুরটি সবুজ
 কর্‌ল আমার মনটি অবুঝ ;
গেলাম ছুটে আত্মহারা উদাস নয়নে !

মৃদু হেসে বল্‌ল ধীরে কদম কামিনী,—
"তোমার তরেই আছি জেগে সারা যামিনী" ;
 অপ্‌রাজিতা নয়ন খুলে
 বল্‌ল নেচে দুলে দুলে,—
"ওগো শিশু ! হ'ব তোমার অনুগামিনী।"

নিশাস আমার লাগ্‌ল গিয়ে শিউলী বকুলে,
জাগার পালা সুরু হ'ল তাদের মুকুলে ;
 হাতের সাজি হাতেই ছিল
 ভিড় করে সব তায় জুটিল ;
বল্‌ল,—"ক্ষতি নেইক মোদের পাপ্‌ড়ি শুকুলে।"

মল্লিকা বেল যুঁই চামেলী ছোট্ট বালিকা
বল্‌ল,—"ওগো শিশু, তোমার গাঁথ্‌ব মালিকা;
লও আমাদের কোঁচড় ভ'রে
বোনের মতন যতন ক'রে
পূজ্‌ব মোরা তোমার হিতেই মহেশ কালিকা।"

এমন সময় কে এল ওই বনের শিয়রে,
সুরের তালে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিহরে
এসেছে মোর এবার স্মৃতি ;—
এ সেই 'কুহু'—কোকিল-গীতি,
লেগে আছে এখনো যা' কর্ণ-কুহরে !
ছুটব আবার উহার পিছু দিবস দুপুরে ! !

আমাদের দুর্গোৎসব

(পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

[শ্রীদেবব্রত লাহিড়ী]

সেদিন নবমী পূজা নদী থেকে স্নান করে ফিরে আসছি, দেখি মুখুয্যে বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে হরে দুলের ছেলেমেয়ে দুটী ঠাকুর দেখ্‌তে দাঁড়িয়েছে; অমনি চারিদিক থেকে কর্কশ কণ্ঠে কতজন বলে উঠ্‌ল, "একি হতচ্ছাড়া দুটো যে একবারে প্রতিমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এখুনি সব জিনিসপত্র আনতে ছোঁয়া-নাড়া হয়ে যাবে। দূর করে দে, এই সরে যা তোরা তফাতে যা" আহা দুঃখী ছেলেমেয়ে দুটী থতমত খেয়ে জলভরা চোখে বাইরে এসে দাঁড়াল।

তারা পিতৃহীন ছিল, সম্প্রতি মাকেও হারিয়েছে।

হায়রে দুর্ভাগ্য শিশু, আজ জগতে কত আনন্দ উৎসব, তাতে ওদের স্থান নেই ওদের মুখের দিকে আজ কে তাকাবে ?"

মা দুর্গা তো জগতের মা, তিনি কি ওদের ভাল বাসবেন না, ঘৃণা করবেন। হঠাৎ কি জানি আমার মনটা যেন ব্যথায় টন টন করে উঠল; মা-দুর্গা কি কখনও ছোট লোক বলে ঘৃণা করেন কক্ষনো না,—তথাপি ছেলে মেয়ে দুটীকে ডেকে নিয়ে গেলাম আমাদের বাড়ী ঠাকুর দেখবে বলে।

মুকুল বর্ষস্মৃতি বা বার্ষিক মুকুলে
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২

আমাদের ঠাকুর দালানের নীচে একপাশে তাদের রেখে ভিতরে গেলাম, কিছুক্ষণ পরে গোলমাল শুনে বাইরে এসে দেখি এখানেও সেই ব্যাপার, সবাই ওদের দূর দূর করছে, আমি বললাম "না এদের কেউ তাড়িয়ে দিও না, ওদের কেউ নেই, ওরা থাকলে ঠাকুর কখনও রাগ করবেন না, তিনিতো ওদেরও মা।

পুরোহিত চেঁচিয়ে বললেন "অজয় ছেলেমানুষী করো না, এসময় ওদের থাকতে নেই, চলে যেতে বলো।"

ছেলে মেয়ে দুটী কি রকম অসহায় করুণ মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল যেন মা বলছেন আহা! ওরা থাক। বাবা এসে দাঁড়ালেন, আমি কাঁদো কাঁদো মুখে জোড় হাতে একবার ঠাকুরকে একবার বাবাকে বললাম "ওদের তাড়িয়ে দিও না ওরা ঠাকুর দেখবে,: ওদের যে কেউ নেই।" হঠাৎ কাতর কণ্ঠে বাবাও বলে উঠলেন "আচ্ছা ভট্‌চায মশায় ওরা থাক না নিতান্ত শিশু কোন দোষ হবে না।"

মুকুল বর্ষস্মৃতি বা বার্ষিক মুকুলে
শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পুরোহিত রেগে বললেন "একি অন্যায় কথা এ সব অনাচার তো কোথাও হতে দেখিনি; আপনাদের বুদ্ধি লোপ হয়েছে এরকম পূজা আমি করতে পারব না।"

বাবা কত হাতে পায়ে ধরলেন কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না চলে গেলেন,

তখনই গ্রামে প্রচার করে দিলেন আমরা 'একঘরে' জাত মানি না। বাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে প্রতিমার দিকে চেয়ে বললেন "আচ্ছা মা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ এই অধম সন্তানের হাতেই আজ পূজা গ্রহণ করো।"

আমাদের বললেন মার আদেশ আজ আমিই পূজা করব।

৩

পূজা সাঙ্গ হয়ে গেল কিন্তু আমাদের বাড়ী কেউ প্রসাদ গ্রহণ করলেন না, বাবা কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বললেন "বেশ ভদ্রলোকেরা নাই বা খেলেন! যেখানে যত গরীব দুঃখী আছে—খবর দাও তাদের তৃপ্তি হ'লেই আমার আজিকার 'দুর্গোৎসব' সম্পূর্ণ হবে।

সন্ধ্যার পর থেকে অনবরত ভিখারীর দল আসতে লাগল, আমরা মহা আনন্দে তাদের পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে লাগলাম, বাস্তবিক প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণ, ভোজনে কিন্তু আমরা এত আনন্দ অনুভব করিনি, উৎসাহে কিছুতেই যেন শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল না।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও শ্রীনরেন্দ্র দেব
মুকুল বর্ষস্মৃতি বা বার্ষিক মুকুলের
সম্পাদক

অনেক রাত্রে সমস্ত ব্যাপার মিটে গেলে আমরা সবাই প্রতিমাকে প্রণাম করলাম, বাবা আমাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "অজয়, আজ তুমি আমায় যে আনন্দের পথ দেখিয়ে দিয়েছ, জীবনে তার সন্ধান কখনও পাইনি। আজ জগৎ-জননীর কাছে প্রার্থনা করি, চিরদিন তোমার এইরকম পরদুঃখে কাতর প্রাণ যেন থাকে। নিজের মর্য্যাদা ও নিজের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কখনও যেন কারো প্রাণে কষ্ট না দাও, পরের দুঃখ দূর করে তোমার ভবিষ্যৎ যেন উজ্জ্বল ও সার্থক হয়। এই আমার সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ।" চেয়ে দেখি প্রতিমার মুখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

---

* শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও শ্রীনরেন্দ্র দেবের মতে মৌলিক গল্পের জন্য "ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় স্মৃতি রৌপ্যপদক" শ্রীদেবব্রত লাহিড়ীকে (বয়স সাড়ে বারো) মেছুয়া বাজার, কলিকাতা, দেওয়া হইল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[প্রভাংশুকুমার গুপ্ত]

"মোদের গরব, মোদের আশা
আ' মরি বাংলা ভাষা—"

[শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন]

দেশবন্ধুর মাতৃভাষার দিকে কি রকম প্রাণের টান ছিল তা' তাঁর সাহিত্যিক জীবন সংক্ষেপে আলোচনা কর্‌লে সহজে বুঝ্‌তে পারা যায়। তাঁর স্বদেশ-প্রীতি যে মাপে ছিল,—তাঁর কাছে মাতৃভাষা-প্রীতি কোনও অংশে তার চেয়ে এক তিল কম ছিল না।

তিনি নিজে অপরাপর কর্ত্তব্যের সহিত সাহিত্য-সেবায়ও কাটিয়ে ছিলেন ও নিজে "নারায়ন" নামে একখানি মাসিক-পত্র গৌরবের সহিত পরিচালনা করে ছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর যে-সব রচনা প্রকাশিত হ'য়েছে তা' যে বাংলা ভাষার গৌরব, শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি ক'রেছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

তিনি কবি ছিলেন। কবিতার পর কবিতা যে তিনি লিখেছেন,—তা নয়; ছোট ছোট খান চার পাঁচ বইয়ের মধ্যে একটি একটি ক'রে সব কবিতা জড়ো কর্‌লেও বোধ করি শ'খানেকের বেশী হবে না, কিন্তু খুব বেশী লিখ্‌লেই যে একজন মস্ত বড় নামজাদা কবি বা সত্যিকারের সাহিত্যিক হওয়া যায় তা' একেবারে নিছক্ ভুল ধারণা।

তাঁর সমস্ত কবিতাগুলিই প্রাণের ভাষা ও আবেগ নিংড়ে লেখা। মালঞ্চ তাঁর প্রথম কবিতার বই, এতে যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে তা ঠিক নদীর স্রোতের মতই জীবন্ত, সরল সুন্দর, মোটেই ধোঁয়াটে নয়। ভাষার মিষ্টতায়, মাধুর্য্যে ভরপুর।

'আপনার মাঝে' শীর্ষক কবিতায় তিনি একেবারে শাদা কথায় চমৎকার সন্ধ্যার ছবি বর্ণনা ক'রেছেন,—

"ওরে পাখি সন্ধ্যা হ'ল আয়রে কুলায়
সমস্ত গগন ভরি
আঁধার পড়িছে ঝরি
ওরে পাখী অন্ধকারে! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয়রে কুলায়।"

এই সন্ধ্যার ছবি কি পরিষ্কারই কবির তুলিকাতে ফুটে উঠেছে! কিন্তু নেই এতে কটমট কথার ছড়াছড়ি, উপমার কাড়াকাড়ি, ভাবের গড়াগড়ি বা আড়ম্বর; অথচ কি সরল, সহজ, সুন্দর!

দুঃখীর অশ্রুজল, আর্ত্তের হতাশাস্বর, পীড়িতের কাতরধ্বনি তাঁর মনে আঘাত দিতেই তিনি মালঞ্চে বলেছিলেন,—

"আনন্দে বধির হ'য়ে শুনি নাই এতদিন
ক্রন্দন ধরার
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মভার"

তাঁর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি এ পৃথিবীতে একটা গুরুতর কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে অর্থাৎ দেশের দুঃখ দূর করতেই জন্মগ্রহণ করেছেন ও যখন তিনি এই কর্ত্তব্য হাতে-কলমে করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে হায়রাণ হ'য়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি পথের পাবার আশায় হাল ছেড়ে না দিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে "অন্তর্যামীতে" লিখেছিলেন—

"যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোরে
যেমন ক'রেই হউক যেতে হবে মোরে,
পথখানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,
যেমন ক'রেই হোক যাব আমি যাব"

তিনি টাকা রোজগার ক'রেছিলেন বিস্তর; যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ অংশ কেটে গেছে দেশের দুঃখ মোছ্‌বার জন্য।

মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় তিনি যে তাঁর কর্ত্তব্যের পথ খুঁজ্‌তে গিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না তা বুঝ্‌তে পারা যায় এই কয় ছত্র পড়লেই—

জীবন, জীবন কোথা ? যেন নিরবধি
মরণ নিশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া—

তাঁর মত মানুষ কোনও কালে বেশী দিন নিরাশ হয়ে থাকেন না, কাজ ক'রে নিরাশকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দেন,—'মালা' নামক কবিতায় তার প্রমাণ—

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতা সম যদি ও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার সরবস্ব বিশ্বে ঢেলে দাও।

বড় হ'লে তোমরা তাঁর বইগুলি পড়্‌বে।

সাহিত্যিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কবি ও দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের বন্ধু ! সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা বহু সাহিতিক সাহায্যপ্রাপ্ত হ'য়েছেন,—তার মধ্যে স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একজন।

যাদুকর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীকমলবাসিনী দেবী]

যদু বাড়ীতে পা দিতেই তাকে একলা ফিরতে দেখে প্রথমটা তো গিন্নি হাউ হাউ কোরে খুব খানিকটা চেঁচিয়ে নিলে। খানিকক্ষণ এমনি ভাবে চেঁচিয়ে যখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়লো তখন ছেলের কি ব্যবস্থা করা হলো যদুকে সেই কথা জিজ্ঞেস করলে। যদু সবজান্তার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যা যা ঘটেছিল সব একে একে বলে গেল। আর সে যে খুব ভাল লোক ও পয়সাওয়ালা লোক সে কথা বলতেও ভুললো না। যদুর সব কথা শেষ হোতে না হোতেই গিন্নি আবার সপ্তমে সুর ধরলে——ওগো বাবাগো তুমি আমার ছেলেকে কোন ডাইনের হাতে দিয়ে এলে গো। এতক্ষণ কি আর সে বেঁচে আছে। তাকে সে চিবিয়ে খেয়ে শেষ কোরে ফেলেছে। জ্যান্ত ফিরিয়ে না আনতে পার তার হাড় কখানাও ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তা না হোলে আমি এই খানে মাথা খুঁড়ে মরবো।

গোবরার মার চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক যে যেখানে ছিল সবাই এসে তাদের বাড়ীতে জড়ো হোলো। ব্যাপার সব শুনে তারাও সবাই গালে হাত দিয়ে বসলো, বল্লে—তাইতো বাপ হোয়ে এরকম কাজ তুমি কি কোরে করলে যদু। যাও শিগ্‌গির ছেলেকে খুঁজে পেতে নিয়ে এসো। আজকালকার দিনে কি লোককে আর বিশ্বাস আছে, যে যার তার হাতে ছেলে ছেড়ে দিলেই হোলো।

সবাই এই রকম কোরে বলাতে যদুর ও মনে বড় ভয় হোলো। সে ভাবলে তাই তো সত্যিই কি ছেলেটা গেলো আর তাকে ফিরে পাবো না। কেন তাকে দিয়ে এলুম! খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট কোরে সে এই সব কথা ভাবতে লাগলো। যে যা বল্লে সে তা' শুনে গেলো, কারো কোন কথার জবাব দিলে না। তারপর হঠাৎ উঠে পাগলের মত সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় বলে গেলো যদি গোবরাকে খুঁজে আন্‌তে পারি, তবেই বাড়ী ফিরবো আর না পেলে বাড়ী ফিরে আসবো না।

(ক্রমশঃ)

ধাঁধাঁ

(১) তিন অক্ষরে নাম মোর থাকি সর্ব্ব দেশে
বিভিন্ন-রূপেতে দেখা দিই আমি এসে
আমার অভাবে শিক্ষা না হয় প্রচার
ছাড়িলে প্রথমে, করে ছুতারে ব্যবহার
দ্বিতীয় বিহনে হই কর্ম্ম রূপান্তর
বল বল নাম মোর বল অতঃপর

শ্রীগোবিন্দলাল চাটার্জ্জি
গ্রাহক :—রূপপুর।

(২) নামটি মোর তিন অক্ষরে
জন্মি আমি লতা পরে।
মধ্য হীন হলে তায়
সময় তখন বুঝা যায়
অন্তশূন্য হলে পরে
চিত্রের রূপ তখন ধরে
লতাসহ খাদ্য আমি
নামটী এখন বল তুমি।

শ্রীসুধাংশুভূষণ মিত্র
গ্রাহক

(৩) ল্যাজ কাট্‌লে কথা কই না, কোমর
কাট্‌লে মেয়েদের পাণিগ্রহণ করি,
মাথা কাট্‌লে আছাড় খাই।

(৪) ছাড়াইলে কর্ কর্
আঁখি জল ঝর্ ঝর্

শ্রীউষাপতি ঘটক

সম্পাদকের চিঠি ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা

মুকুলের পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা আমাদের বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ নিও। আশা করি তোমরা পূজোর ছুটীটা ভালো করেই কাটিয়েছ। এবার পূজোয় তোমরা যে যে দেশে বেড়িয়ে এসেছ, সেই দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্য একটী পুরস্কার দেওয়া হবে, যার প্রবন্ধ (১৬ বছর পর্য্যন্ত বয়সের) ভালো হবে তাকে পাঁচ টাকার বই দেওয়া হবে। এবারে যে কুপন আছে সেটী প্রবন্ধের সঙ্গে ২৫শে কার্ত্তিকের পূর্ব্বে আমাদের আফিসে পাঠিয়ে দিও। বিচারক—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও শ্রীনরেন্দ্র দেব।

ইতি—তোমাদের সম্পাদক।

ছেলেদের তৈরি　　ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক　　ছেলেদের নিজস্ব

"বিশ্ববার্ত্তা"

ফাল্গুনে বর্ষারম্ভ, নগদ দাম ছ'পয়সা

কয়েকজন লেখক :—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য সম্রাট)	শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীজলধর সেন বাহাদুর (ভারতবর্ষ)	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (বিজলী)
রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর	শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ	শ্রীবারেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক)	শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার (বাঙলা)	শ্রীশোকহরণ রায়

আর প্রায় প্রতি মাসেই "পুরস্কার প্রতিযোগিতা" থাকে। প্রথম সংখ্যা ফুরাইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই ছাপা হইবে। ছেলেমেয়েদের হাতে ছেলেদেরই গড়া জিনিষ তুলে দিন।

বিশ্ববার্ত্তা কার্য্যালয়ঃ—বেহালা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী।

বেহালা, কলিকাতা।

শ্রীঅখিল নিয়োগীর ছেলেদের গল্পের বই

পাতায় পাতায় ছবি, সুন্দর মলাট, দাম ছ'আনা।

৭২নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে সন্দেশ কার্য্যালয়ে পাবেন।

মুকুল বর্ষস্মৃতি
বা
বার্ষিক মুকুল
নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হচ্ছে

বর্ষ স্মৃতিতে—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
? ? ?

ঝরণা

১ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ { পঞ্চম সংখ্যা

মন্দিরে

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

আমরা সেদিন গিয়েছিলেম তারা দেবীর মন্দিরে,
গিয়ে দেখিনা দেব্‌তা যেন কারাগারে বন্দীরে।
ছোট্ট ঘরে আঁধার ভরা সূর্য্য-আলো যান না,
চামর-নাড়া বাতাস ছাড়া অন্য হাওয়া পান না,
ঠাণ্ডা গারদ, স্যাঁৎ সেঁতে আর গঙ্গা জলে ভাপ্‌সা,
দিনের বেলা প্রদীপ জ্বলে, ধূনোর ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা।
ভাগ্যে ছিল ধূপের সুবাস, ফুলের মৃদু গন্ধ,
নইলে সেথা থাক্‌তে হ'তো নাকটি করে বন্ধ!

পুরুত ব'সে পূজো করেন আসন পেতে নিত্য
পূজোর চেয়ে ভোজের দিকেই নিবিষ্ট তাঁর চিত্ত
দেব্‌তা স্বয়ং সাম্‌নে খাড়া দিন-রাত্রি দাঁড়িয়ে
ব্যাপার দেখে ইচ্ছা করে বামুনকে দিই তাড়িয়ে

ঠাকুর ব'লে হয়না কিগো পা'দুটি তাঁর শ্রান্ত
সেটা কিন্তু ভাবিনি কেউ আমরা এতই ভ্রান্ত !
নৈবেদ্যের চালটা কাঁচা,—চিনির ঢিবি মিষ্টি !
তাইত ঠাকুর খায়না কিছু, পড়েই থাকে সৃষ্টি ।

যতই কর আরতি আর যতই নাড়ো ঘণ্টা
'মা' 'মা' বলে চেঁচিয়ে তোমার শুকিয়ে গেলেও কণ্ঠা
দেয় না সাড়া রাগ ক'রে মা কয়না কথা একটি
অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে যেন সাপের মুখে ভেকটি !
বলিদানের নাম ক'রে সব যতই পাঁটা কাট্‌ছো,
স্বর্গে যাবার দোরটি ওগো ততই জোরে আঁট্‌ছো ।
পয়সা ফেলে কেউবা দেখি পূজোর কাজও চোকান,
দেব-দেবীদের মন্দির কি পুণ্য বেচার দোকান ?

(এক)

সকাল হ'তেই কাঁচা আমের লোভে খোকা আম বাগানে ঢুকেছিল।

আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে খানিকটা এগিয়েই সে দেখ্‌লে তাদের বড় আম গাছটার ওপর পাখীদের একটা মস্ত সভা বসে গেছে।

কোকিল বল্লে, আমি খবর পেয়েছি সমুদ্রের ওপারে দক্ষিণ দ্বীপে এবার অমৃত-ফল ফলেছে লাখো লাখো। যদি তোমরা যেতে চাও আমার সঙ্গে আজই চলো।

কাকের সব তাতেই সন্দেহ। সে কা—আ—কা করে শুধলে তুমি কি করে খবর পেলে?

কোকিল বিরক্ত হ'য়ে বল্লে, আঃ সব তাতেই তোমার টিপ্পনী!—আমার খুড়ো বৌ-কথা-কও সেই দেশ থেকে আসছে; না হয় তার মুখ থেকেই খবরটা শোন। বলনা খুড়ো। তুমিই সব খুলে বল। এই বলে কোকিল তার পাশে-বসা বৌ-কথা কওকে ঠোঁট দিয়ে এক ঠেলা দিলে।

বৌ-কথা-কও ভাবছিল অন্য কথা। আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে পড়ি পড়ি ভাবে ডানা ঝটপট্ করে আপনাকে সামলে নিয়ে সে বল্লে, তবে শোন।

নতুন কিছু শোনবার আশায় পাখীর দল কিচি-মিচি থামিয়ে সব শান্ত হ'য়ে বস্‌ল।

বউ-কথা-কও সুরু কল্লে :—

আমার বৌ যখন মারা গেল, তখন আমি বিশ্ব-সংসার অন্ধকার দেখ্‌লুম। সকলে এসে বল্লে, আর কেন বৌ তো আর চির দিন থাকে না! নতুন একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হও।

আমার মন কিন্তু তা চাইলে না। কেমন যেন মনে হ'ল বৌ আমার মরেনি সে বেঁচেই আছে। আমি স্থির করলুম—দেশে দেশে আমি ঘুরে বেড়াব তার সন্ধানে। সেই থেকেই অনেক দেশ আমি ঘুরেছি না খেয়ে না দেয়ে কিন্তু তার দেখা পাইনি।

শেষটা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শ্রান্ত হ'য়ে আমি দক্ষিণ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছি। দেখি মস্ত এক বন, বনের শেষ নেই ; আর সেই সব গাছে লাল লাল থোকো থোকো এত ফল ফলেছে যে গাছের পাতা দেখা যায় না।

আমার ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। একটি ফল খেতেই যেন আমার সব শ্রান্তি দূর হ'য়ে গেল। আরোও একটি ফল খেলুম। আমার মনের অবসাদ সব কেটে গেল। আমার গলা থেকে আপনা আপনি গান বেরুতে লাগ্‌লো—বৌ কথা—কও—বৌ—ক—থা কও—

গল্প শুনে সকলেই উৎসুক হ'য়ে ডানা ঝট্-পট্ করে ভাল হ'য়ে বস্‌ল।

দোয়েল শুধোলে ফলটি খেতে কেমন লাগল দাদা ?

বউ-কথা-কও মুখচট্‌কে বল্‌লে সে আর তোমায় কি বল্‌বো ভাই-স্বর্গের সুধাও বোধ হয় তার কছে হার মানে নইলে শুধুই কি তার নাম হ'য়েছে অমৃত ফল ?

সকলেই একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল চল দাদা চল সেই খানেই যাওয়া যাক্।

বক এক পাশে চুপ করে বসেছিল।

সারস তাকে শুধোলে—কি মামা, চুপ ক'রে যে ? তুমি যাবে না ? বক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—না ভাই আমার যাওয়া হবে না! আমার খুড়ো শ্বশুর চিলের আজ সাতদিন পর জ্বর ছেড়েছে ; তাঁকে মাছ না মেরে দিলেই হ'বে না।

ততক্ষণ চারদিকে সাড়া পরে গেছে।

বৌ-কথা-কও সকলকে সারি বন্দি ক'রে গাছের ডালে বসিয়ে দিয়ে বল্লে,

সব আমার পেছু পেছু আসবে। এদিক সেদিক ছুটোছুটি কল্লে দক্ষিণ সমুদ্রের ঈগলপাখী ছোমেরে নিয়ে যাবে। সব একসঙ্গে থাক্‌লে সে ভয় নেই।

সকলেই বৌ-কথা-কওয়ের কথায় সায় দিয়ে ডানা ঝট্‌ পট্‌ করতে লাগ্‌লো।

খোকা এতক্ষণ মজা দেখছিল। এইবার এগিয়ে এসে তার ছোট্ট হাত দুটি ওপর দিকে তুলে চেঁচিয়ে বল্লে—ওগো ছোট্ট পাখীরা, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।

কোকিল নীচের দিকে চেয়ে খোকাকে দেখে শুধোলে, কোথায় যাবি রে পুঁট্‌কে ছোঁড়া?

খোকা বল্লে, সমুদ্রের ওপারে যাবো ফল খেতে।

পাখীরা সব কিচির মিচির ক'রে আপত্তি জানালে।

বউ কথা কও ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কোকিলকে বল্লে, ওহে ভায়া নাও ওকে মানুষের বাচ্চা তো? বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, সময়ে কাজ দেবে।

কোকিল বল্লে, তা কি করে যাবি আমাদের সঙ্গে ? তোর কি পাখা আছে যে আমাদের সঙ্গে উড়বি।

খোকা উত্তর দিলে—কেন তোমাদের পিঠে চ'ড়ে যাবো।

তাই ঠিক হ'ল।

কোকিলের পিঠে চেপে পাখীর দলের সঙ্গে খোকা দক্ষিণ দ্বীপের উদ্দেশে ছুট্‌লো।

যখন তারা দক্ষিণ সমুদ্রের ঠিক ওপরে এসে পৌঁছল, তখন নিশুতি রাত। পূর্ণিমার চাঁদ সমুদ্রের ওপর এক ঝলক্ আলো ফেলে একা একা পাহারা দিচ্ছিল।

খোকা সেই আলোর খেলা দেখে চেচিয়ে উঠ্‌ল—বাঃ কি মজা !—এটা কি জ্যোৎস্নার সাগর ?

কোকিল ধমক্ দিয়ে বল্লে—এই চুপ্ ! একটু নড়েছ কি একেবারে সমুদ্রের তলে।

শুনে খোকা চুপ করে রইল।

কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দুটো পিট্ পিট্ ক'রে ঢেউয়ের সঙ্গে জ্যোৎস্নার খেলা প্রাণ ভরে দেখে নিলে।

সমুদ্রের দিব্যি ফুরফুরে হাওয়ায় খোকা কোকিলের পিঠের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল, জাগল বৌ-কথা-কওয়ের ডাকে।

সে ডাক্‌ছিল—ওগো একরত্তি খোকা, যত্তপার অমৃত ফল খেয়ে নাও এই বেলা, দেশে ফিরে গেলে একটুক্‌রোও মিল্‌বেনা।

খোকা লাফিয়ে উঠে বসে পাখীদের সঙ্গে ফল খেতে সুরু করে দিলে।

* * * * *

ভোরের সূয্যি যখন গাছের মাথায় ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে—খোকার তখন ঘুম ভাঙ্‌ল।

ফল খেয়ে পাখীরা খুব খুসী। ডালে বসে তারা গলা খুলে খুব গান গাইতে সুরু করে দিয়েছে।

কোকিলের কাছে গিয়ে খোকা বল্লে, ভাই, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

কোকিল তখন নিজের গানেই মসগুল। সে শুধু গেয়েই চলেছে কুহু—কুহু—কুহু

খোকা রাগ ক'রে বল্লে, তুমি গান গাও, আমি কিন্তু চল্লুম।—এই বলে হন্-হন্ ক'রে খানিকটা এগিয়ে গেল।

কোকিল গান থামিয়ে মুচ্‌কি হেসে বল্লে, আহা রাগ কর কেন? তা কোথায় যাবে শুনি? খোকা বল্লে—এই, দেশটা একটু ঘুরে দেখ্‌বো।

কোকিল বল্লে- তুমি একা যাবে কি করে?

খোকা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, একা না'তো কি? একা আমি যেখানে সেখানে যেতে পারি; তোমাদের মতো পাখী তো আর নই যে ভয়েই সারা হবো।

এই বলে সে আবার রওনা হ'ল।

কোকিল পেছন থেকে ডেকে বল্লে, ওহে খোকা শোনো—শোনো—কথা আছে।

খোকা ফিরে আস্‌তে কোকিল বল্লে, যাচ্ছ তো, কিন্তু এখানে যে ভূতের ভয় আছে তা জানো?

খোকা আস্তে আস্তে কোকিলকে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে, অ্যাঁ? ভূত? বলকি?

কোকিল মাথা নেড়ে বল্লে—হ্যাঁ গো হ্যা, ভূত।

যতক্ষণ দিনের আলো আছে ভয় পাবার ততক্ষণ কিছুই নেই, তাই বুক ঢিপ্-ঢিপ্ কর্‌তে থাক্‌লেও খোকা বুক ঠুঁকে বল্লে, ও ভূত ফুত আমি থোরাই কেয়ার করি এই বলে বেড়াতে বেড়িয়ে গেল।

মুখে যতই কেন না বলুক, ভূতের কথা শুনে খোকার মনে মনে ভয় ছিল যথেষ্ট, তাই বেশী দূর যাওয়ার সাহস তার হ'লনা।

খানিকটা ঘুরেই সুবোধ ছেলের মতো সে বাড়ী ফিরে এলো।

সমস্তটা দিন ফল খেয়ে আর পাখীদের সঙ্গে কিচিমিচি ক'রে একরকম কেটে গেল।

সন্ধ্যা হ'তে গোটাকয়েক ফল খেয়ে, গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে খোকা সকাল সকাল শুয়ে পড়ল।

ডুপুর রাতে একটা শোঁ-শোঁ শব্দ শুনে খোকার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বৌ-কথা-কও ফিস্-ফিস্ ক'রে বল্লে, সব হুসিয়ার—হয়তো কোনো 'উপদেবতা' গাছে ভর কর্চ্ছে—

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে গাছটা ভয়ানক নড়ে উঠ্‌ল, তার পর আকাশ দিয়ে হু-হু করে উড়ে (চল্‌ল)।

লুকোচুরি

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

তুমি ব'সে গান গাও
লোকে বলে "মিষ্টি"
আমারে আসিয়া কয়
"বেশ্ ওর গলা, নয় ?"
মুখে বলি, "হ'তে পারে"
মনে, "সুধাবৃষ্টি"

তুমি চল, বলে সবে
"ওগো, কি অভাব্য"
মোরে এসে কহে "ওর
চলাটি কি সুন্দর"
ঠোঁট বলে, "কি এমন"
প্রাণ বলে, "কাব্য" ।

তুমি যবে কথা কও
লোকে বলে "সুধা গো" !
প্রশ্নেরই উত্তরে
আমি রহি চুপ্ ক'রে
হিয়া বলে "মিট্‌লো যে
পীযূষের ক্ষুধা গো" ।

ছল্ ক'রে মিছে কই
ভান্ মোর প্রিয় সে
বুকে যা লুকান আছে
আর কেউ জানে পাছে
তাই সাজি উদাসীন
তুমি বুঝে নিয়ো সে ।

হোদের কথা

[আলোক—চিত্র-শিল্পী—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু]

[শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু]

বাংলাদেশে যেমন সমতলভূমি, উড়িষ্যায় তেমন নয়। উড়িষ্যায় বড় বড় নদীর মোহানায় অথবা সমুদ্রের ধারে সমতল জমি, আর সব উঁচু নীচু পাহাড়। এই সব পাহাড়ে খুব ঘন বন, আর তাতে বাঘ ভাল্লুক থাকে বলিয়া লোকজনের বাস কম। বুনো হরিণ, হাতী, ময়ূর এসব ছাড়া সেখানে অনেক বুনো মানুষ থাকে। বুনো মানুষ বলিতে যেন রাক্ষসের মতন কিছু ভাবিও না। ইহারা সহরের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে না, নিজেদের যা' কিছু খাবার জিনিষ, তা' জঙ্গলেই চাষ বাস করিয়া পায়, আর পরণের কাপড়ের দরকার হইলে বনের মধু, হলুদ, গালা প্রভৃতি কোনো হাটে গিয়া বিক্রী করিয়া কাপড় কেনে। যারা সভ্যলোকের বাস থেকে অনেক দূরে থাকে, তাদের কাপড়ের অভাব আরো কম; পুরুষেরা নেংটী পরে আর মেয়েরা কোথাও নেংটী আর গাছের পাতা বুনিয়া জামা পরে; কোথাও বা কাপড় জামা দুইই পাতা দিয়া তৈয়ারী করে।
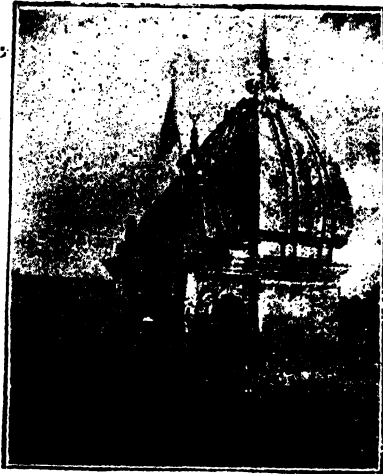
মন্দির

উড়িষ্যার জঙ্গলে পাহাড়ে এইরকম অনেক জাত আছে, তাহাদের কেহ কম কেহ বেশী সভ্য।

সকলেরই চেহারা মোটামুটি একরকমের কিন্তু তাদের কথাবার্ত্তার ধরণধারণ আলাদা রকমের। তারা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না। ইহাদের ভিতর একজনদের নাম হো। আমরা বলি হো, তারা বলে হঃ, আর তার মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'মানুষ', যেন বনের ভিতর তারাই কেবল মানুষ, আর সবাই পশু।

উড়িষ্যায় এই জঙ্গলীদেশে অনেক রাজা থাকেন; তাঁদের ভিতর সেরাইকেলার রাজা একজন। আমরা তাঁর রাজ্যে আর বছর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ছোট্ট সহরটি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আর তার পাশ দিয়া খড়কাই নদী বহিয়া গিয়াছে। খড়কাই নদী পাহাড়ী বলিয়া বর্ষার সময়ে দুকুল ভাসাইয়া জল আসে, তারই কাছে ছোট রাঢ়ো নদী, তাহাতেও এত জলের স্রোত হয় যে ২।৩ দিন ধরিয়া লোকে তা পার হইতে পারে না, এমন কি অন্যদেশ হইতে চিঠিপত্র পর্য্যন্ত আসা বন্ধ হইয়া যায়। আমরা প্রায়ই এইসব নদীর ধারে হো, সাঁওতাল প্রভৃতি লোকেদের গ্রামে বেড়াইতে যাইতাম আর তাদের সঙ্গে ভাব করিয়া কেমন করিয়া তারা থাকে, তা' দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া আসিতাম। সেরাইকেলা সহরের কাছে যারা থাকে, তারা বাংলা বা উড়িয়া বুঝিতে পারে; কিন্তু যারা দূরে থাকে তাদের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে সঙ্গে একজন দোভাষী লইয়া যাইতে হয়।

একদিন সকাল বেলা আমরা ৬।৭ বন্ধুতে মিলিয়া সঙ্গে একজন দোভাষীকে লইয়া খড়কাই নদী ধরিয়া বাহির হইলাম। নদীর জল তখন কম, তাই তার তলাকার যত সব কাল কাল পাথর ঘুমন্ত কুমীরের দলের মত দেখা যাইতেছিল। নদীর ওপারে সাঁওতালদের ছেলেরা মাঠে ছড়ি লইয়া মহিষ চরাইতে বাহির হইয়াছিল। সকালবেলার রৌদ্রে চক্‌চকে নীলরঙের মাছরাঙ্গা, নদীর জলে মাছ ধরিতেছিল, কোথাও বা শুখনো পাথরের উপর ছিপ্‌ছিপে খঞ্জন পাখী লেজ নাচাইয়া শিষ দিতেছিল। এই সব দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় ৬।৭ মাইল পরে একটি ছোট পাহাড়ের পাশে পঁহুছিলাম। পাহাড়ের উপর গাছপালা কিছু নাই, কেবল কাল কাল পাথরের গায়ে মাঝে মাঝে ফাটার দাগ দেখা যায়, আর ফাঁকে কোথাও বা কাঁটাগাছ কোথাও বা অন্য কোনো বুনো গাছ জন্মিয়াছে। এই পাহাড়ের পরে আর একটি, তার পর আবার একটি, এম্‌নি করিয়া শেষে আমরা একেবারে পাহারের মেলার ভিতর আসিয়া পঁহুছিলাম। আরো ৩ মাইল আন্দাজ যাবার পর কিছুদূরে গ্রাম দেখা গেল, ও সেখান হইতে মাদলের আওয়াজ শোনা গেল। ধানের ক্ষেতে কয়েকজন লোক কাজ করিতেছিল, তাহাদের ডাকিয়া জানা গেল যে আজ হোদের একটি পরব আছে, তারই নাচ-গানের আওয়াজ আসিতেছে। গ্রামটির নাম কোপেং, সেখানে পঁহুছিতে প্রায় বেলা ৯টা হইল।

আমরা কোপেঃ গ্রামের বুড়া সর্দ্দারের বাড়ীতে পঁহুছিয়া দেখি যে বাড়ীর সামনের জমিটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিকাইয়া তার উপর ছেলে মেয়েরা মিলিয়া খুব নাচিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহাদের নাচগান থামিয়া গেল। তাদের সর্দ্দারকে ডাকিয়া দোভাষী বুঝাইয়া দিল যে আমরা এই গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছি, এইখানেই—আজ খাওয়াদাওয়া করিয়া বিকালবেলা সহরে ফিরিব। সর্দ্দার খুব খুসী হইয়া ঘর থেকে খাটিয়া আনিয়া দিল, হাত পা ধুইবার জল দিল ও খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে নিজেই বাহির হইল। আমরা একটু জিরাইয়া লইতে তখন আবার হোদের নাচ আরম্ভ হইল; পুরুষেরা সবাই এক একটি বেহালা বাজাইতে লাগিল আর মেয়েরা কোমর ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিল।

বুড়ো সর্দ্দার

তারা একই গান অনেকক্ষণ করিয়া গাইতে লাগিল। গানগুলি ছোট, আর কোন কোনটি তখনই তৈরী করা। একটি গান ছিল যে আমাদের গ্রামে আজ দিকুরা পরব দেখিতে আসিয়াছে; এরা হিন্দুদের সবাইকে দিকু বলে। আর একটি গান মনে আছে,

'পুকুরে আনিরে বারিপদ রাজাহন্ দুরুং তানা
দুরুং আয়ুং আয়ুং তে সরইকোলা রাণীহন্ উজু লেনা'।

'পুকুরের ধারে বারিপদার রাজপুত্র বসিয়া গান গাহিতেছিলেন, এবং সেই গান শুনিয়া সরাইকেলার রাণীর মেয়ে সেখানে আসিলেন।' হোরা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া গান গাওয়া বা একসঙ্গে নাচাকে লজ্জার কথা মনে করে না; সবাই বেশ মিলিয়া মিশিয়া মনের সুখে থাকে। আমাদের দেখিয়া মেয়েদের প্রথমে একটু সঙ্কোচ হইয়াছিল, কিন্তু পরে তারা বেশ স্বচ্ছন্দে নাচিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুএকটী দুষ্টু ছেলে কোনো মেয়েকে লজ্জায় পলাইতে দেখিলে তাহাকে টানিয়া আনিতেছিল অথবা তার কানের কাছে বেহালা বাজাইয়া কানে তালা ধরাইয়া দিতেছিল।

দুপুর বেলা আমরা দুই বন্ধু খড়কাই নদীতে নাইতে গেলাম। সেখানে একজনদের বিলাতী বেগুনের ক্ষেতে পাকা বিলাতীবেগুন খাইয়া নদীতে অনেকক্ষণ সাঁতার দিয়া উঠিলাম। একটি কুল-গাছের নীচে ৩.৪ জন হো বসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ভাব করার মৎলবে আমরা তাদের কাছে গেলাম। তারা অল্প অল্প হিন্দী বোঝে, আমরা তাই হিন্দী বলিতে লাগিলাম, আমাদের তারা জিজ্ঞাসা

করিল আমরা হিন্দুস্থানী লোক কিনা, কোথায় বাড়ী, এই সব। আর আমরা তাদের নদীর কথা, পাহাড়ের কথা, তাদের গ্রামের কথা এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তারা যা বলে আমরা তার অর্দ্ধেক বুঝি না; আমরা যা বলি তাও তারা সব বুঝিতে পারে না; আমরাও হাসি, তারাও হাসে, এমনি করিয়া ভাব হইয়া গেল। তাদের একজন শালপাতায় তামাক মুড়িয়া চুরুটের মতন করিয়া খাইতেছিল। তার কাছে দেশালাই ছিল না বলিয়া সে নিজের আগুন তৈরী করার কল বাহির করিল। একখানি ছোট শুকনো কাঠ, উপু হইয়া বসিয়া দুপায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিল, আর একখানি কাঠ, পেন্সিলের মতন লম্বা, তার উপরে বসাইয়া ঘোল মউনির মতন খুব তাড়াতাড়ি দুহাতের চেটো দিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরাইতে লাগিল, দুটী কাঠ ঘসিয়া গুড়ো বাহির হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ এমনি ঘোরানোর পরে কাঠের গুঁড়া বাদামি রঙ্গের হইয়া আসিল, তার পরে তাহা আরো ঘোর রঙ্গের হইতে হইতে শেষে তাহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইল। তখন সেই কাল কাঠের গুঁড়ায় ফুঁ দিতেই তাহাতে টিকের আগুনের মতন আগুন ধরিয়া উঠিল।

হোদোর মেয়ে

এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমরা গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু জিরাইয়া আমরা হোদের সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া খাতায় লিখিয়া লইলাম; কেমন করিয়া তাদের দেশে বিবাহ হয়, মানুষ মরিয়া গেলে তাহারা কি করে, তাদের রাজাকে কত খাজনা দিতে হয়, এই সব। একদিনে যতদূর সম্ভব লিখিয়া বিকালের দিকে আমরা হোদের ফটো তুলিতে লাগিলাম। তাতে ইহাদের এত আমোদ হইল যে শেষে গ্রামের সবাইকার ফটো তুলিয়া দিবার জন্য টানাটানি পড়িয়া গেল। আমাদের কাছে যতগুলি কাঁচ ছিল, সবগুলি তোলা শেষ হইলে আমরা বিকালবেলা তাহাদের কাছে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

এদিকে আমরা যে কোপেঃ গ্রামে সবাইকার সঙ্গে খুব মেলামেশা করিয়াছি এ খবর কাছে আরো দু'একটি গ্রামে পৌছিয়াছিল। পথে একটি ছোট গ্রামে দেখি স্ত্রীপুরুষেরা বন থেকে সাদা সাদা ফুলের থোকা তুলিয়া মাথায় ও খোঁপায় পরিয়া নাচিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাদের এত আহ্লাদ হইল যে সামনের দুতিনজনের হাত ধরিয়া তাহারা টানাটানি আরম্ভ করিল, এই বলিয়া যে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নাচিতে হইবে। তাহাদের নিমন্ত্রণ রাখা হইল না, কেননা আমাদের মধ্যে কেহই নাচিতে শেখে নাই। তাই বিদায় লইয়া আমরা সবাই আবার সেই পাহাড় ও বনের ভিতর অগ্রসর হইলাম।

খোকার ব্যথা

[শ্রীনলিনীভূষণ দাশ গুপ্ত এম্-এ]

নীল আকাশের কোন্‌খানে মা, নীল সাগরের কোন বাঁকে !
বোন্‌টি আমার খেল্‌তে গেল ? কার সনে, মা কোন ফাঁকে ?
আর কি ফিরে' আস্‌বে না ?
ডাগর দুটি চপল চোখে তেম্‌নি চেয়ে, হাস্‌বে না ?
জড়িয়ে গলা সোহাগ ভরে দুইটি হাতে নিস্‌পিসে
"সবাল চেয়ে ভালোবাছি" বল্‌বে না মা আর কি সে ?

(২)

দেখ্‌তে আমি পাব নাক' আর কি মা সে ফুল্ল মুখ ?
মেঘের ফাঁকে লুকিয়ে-চলা পূর্ণ চাঁদের টুক্‌রাটুক্ !
বল্ মা আমায়—সয়না ছল্
খেলার শেষে আবার ফিরে' আস্‌বে কবে ? সত্যি বল্ ।
এমন ক'রে দূরে দূরে—কেমন ক'রে রয় খুকু !
তোমায় ছেড়ে ! আমায় ছেড়ে !—পায় না কি দুখ্ একটুকু ।

(৩)

ঝাপ্‌সা গাছে তেমনি আছে, মাগো, মোদের ফুল্ বাগান ।
সদ্য ফোটা টগর চাঁপার খোস-সুবাসে মুগ্ধ প্রাণ ।
ওই শোনো মা যায় ধেয়ে—
মাতাল বায়ু বেণুর বনে—খোস খেয়ালে গান গেয়ে ।
কেবল হাসি—আলোর রাশি—খুসীর তুফান বয় যেন,
এমন দিনে, বল্‌ত মাগো, খুকুই শুধু নাই কেন ?

(৪)

একলা ঘরে, এমন ক'রে রইব:মা আর কোন্ সুখে !
নাই যে খুকু খেলতে কাছে—মন কাঁদে মোর সেই দুখে।
ইচ্ছা করে চোখ্ বুজে'
আকাশ পাতাল হাত্ড়ে দেখি—পাই কিনা মা পাই খুঁজে'।
চলবে না ত মাগো আমার একটি দিনও বোন্টি বই।
সবাই আছি—বাবা, তুমি, আমি, মেনী—খুকীই কই !

(৫)

বল্লি কি মা ? ওই যে তারা—সাঁঝের তারার ঠিক্ নীচে
বোনটি আমার—জাগছে কি মা, ওই তারাটির ঠিক্ পিছে,
কাঁদিস্‌নে মা—বল্ খুলে—
যা ক'রে হোক্ আজকে আমি যাবোই যাবো ঐই কূলে।
ছেড়ে আমায় একলা দু'দিন থাকতে মাগো পারবি তুই ?
আকাশ বুড়ীর বুকের মাণিক আন্‌বো ছিনে, গগন ছুঁই।

স্মৃতির উৎসব

[শ্রীভূপতি চৌধুরী]

[চিত্র-শিল্পী—শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত]

ছেলেবেলায় সকল পূজোর আনন্দ উৎসবের সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা পূজোর দিনটা ও আমাদের উৎসব দিনের তালিকায় খুব ভাল করে লেখা থাকত। পূজোয় নতুন কাপড় প'রে যতটা আনন্দ পেতুম, এই বিশ্বকর্ম্মা পূজোর দিন ঘুড়ি উড়িয়ে তার চেয়ে যে কম আনন্দ পেতুম এমন ত মনে হয় না। ঘুড়ি ওড়ানোটা ছিল আমার নেশার মতো। রোজ ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যে পয়সা পেতুম না বলে, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ঘুড়ি কিনে আনতুম। এজন্যে মার কাছে বকুনিটা খেয়েছি কি কম? কিন্তু সে সব বকুনিকে আমলই দিতাম না; ঘুড়ি যেমন ওড়াবার উড়িয়ে যেতুম। রোজই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে যখন সেদিনকার কেনা ঘুড়িটা ছিঁড়ে যেত বা 'প্যাঁচ' লেগে কেটে যেত তখন বাকী সময়টা আকাশের হাজারটা উড়ন্ত ঘুড়ীর দিকে চেয়ে ভাবতুম—বিশ্বকর্ম্মা পূজোটা এলে হয়, সেদিন যা ঘুড়ী ওড়াব!

কিন্তু একবার এমন হ'ল যে এই বিশ্বকর্ম্মা পূজোয় ঘুড়ি ওড়ান আর হয়ে উঠল না। একমাস ধরে অসুখে ভুগে, বিছানা থেকে ওঠবারই শক্তি ছিল না, ত ঘুড়ি ওড়াব কেমন করে? কিন্তু ওড়াতে না পারলেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুড়ি ওড়ান দেখতে না পেলে আমার অস্বস্তির সীমা থাকত না। আমি বিছানায় শুয়ে থাকতুম, রোদ পড়ে এলে মা আমার ঘরের জানালাগুলো খুলে দিতেন। আর

আমি শুয়ে শুয়ে ঘুড়ি ওড়ানর আনন্দটা শুধু ঘুড়ি উড়তে দেখেই উপভোগ করতুম। এমনি ভাবে সেবারের, দিন যেতে যেতে বিশ্বকর্ম্মা পূজো এসে পড়ল। স্কুলে সেদিন 'হাফ-হলিডে' দিয়েছে। আমাদের সামনের বাড়ীর নরু, দেখি, দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে এসেই, সুতোয় মাঞ্জা দেবার যোগাড়ে লেগে গেছে। হামানদিস্তেয় 'কাঁচ-গুড়ান'র একঘেয়ে শব্দ আমার কাণে এসে লাগছে। অন্য দিন যদি কেউ আমার কাণের কাছে এমন বিশ্রী ভাবে শব্দ করত তাহ'লে আমার বিরক্তির সীমা থাকত না, কিন্তু আজ এই শব্দ আমার খুব ভাল লাগছিল। মনে মনে ভাবছিলুম আমিও যেন এই সঙ্গে ওদের দলে মিশে গেছি। ... ...

তখনও ছাদে কী রোদ! একেবারে যেন কাঠ ফাটছে। কিন্তু সে রোদ্দুর অগ্রাহ্য ক'রে, আমারই বয়সী ছেলেরা মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধে ছাদে মাঞ্জা দিতে সুরু করেছে। আকাশটা সেদিন কি চমৎকার। আকাশটা যেন একটা প্রকাণ্ড সাদা কাগজ, আর কে যেন তাতে গাঢ় নীল কালি ঢেলে দিয়েছে।

রাস্তা দিয়ে পাঁউরুটী-বিসকুটওয়ালা হেঁকে গেল—পাঁউরোটী বিসকুট্। নীচের কল থেকে জল পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। বুঝলুম তিনটে বেজে গেল। আকাশে এরি মধ্যে দু একখানা ক'রে ঘুড়ি উড়তে সুরু হয়ে গিয়েছে।

আমাদের পাশের বাড়ীর দস্যি মেয়ে বিনি কোথা থেকে একটা 'লগি' যোগাড় ক'রে এনে, সেটাকে নিয়ে ছাদের ওপর নিষ্ফল আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে।

তার মা, তাঁকে আমি মাসীমা বলি, নীচে থেকে ডাকলেন—বিনি, ছাতে এই রোদ্দুরে কি কচ্ছিস্! কাণ মাথা ফেটে গেল মুখপুড়ী। নেবে আয় শীগগির।

দস্যিমেয়ে বিনি, তাঁর কথার জবাব দিলে—পরে, আজ যে বিশ্বকর্ম্মা পূজো, ঘুড়ি ধরবো না।—

মাসীমা আবার গর্জ্জন করে বললেন—ঘুড়ি ধরাচ্ছি হতভাগী। নেবে আয় শীগগির নইলে পিঠের ছালচামড়া তুলে দেব একেবারে।

বিনি কোনো জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে 'লগি'টা দোলাতে লাগল।

এই বিনি মেয়েটা, তার নাম বীণা টীণা কিছু হবে হয়ত কিন্তু কেউ ভাল নাম ধরে তাকে ডাকে না, সবাই বলে বিনি। ঘুড়ি ওড়ান, গুলিখেলা, ছোটাছুটী, আমরা ছেলেরা যা কিছু খেলতুম, তার কোনটাই সে বাদ দিত না। এজন্যে তার প্রহার হত কি কম? এমন দিন যেত না যেদিন বিনি, তার দস্যিপনার জন্যে ঠেঙ্গানি না খেয়েছে, কিন্তু পরের দিন আবার থেকে সেই। গোমড়া মুখ করে বসে থাকা তার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। মন ভাল থাকলে তার মুখে সব সময়েই হাসিটী লেগে থাকত, আর রাগ হ'লে কেঁদে কেটে সে বাড়ী সরগরম করে তুলত।

খোলা জানালাটা দিয়ে হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে বিনি চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলে—কি মণ্টুদা, এখনও তুমি সেরে উঠলে না। বিশ্বকর্ম্মা পূজো যে হয়ে গেল, ঘুড়ি ওড়াবে কবে?

ম্লান হাসি হাসলুম

মাসীমা আবার চেঁচালেন—বিনি নেবে আয় ছাত থেকে; রোদে যে সানে পা দেবার জো নেই, আর তুই পোড়ারমুখী, নির্ব্বিকার হয়ে ছাতে দাঁড়িয়ে পুড়ছিস্।

বিনি হো হো করে হেসে উঠল—বারে কোথায় পুড়ে যাচ্ছি। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—এমন আর কি রোদ আজকে ? কি বল মণ্টুদা—

মাসীমা এসে বিনিকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। বিনির লগিটা ছাতের রেলিঙে ভর দিয়ে দুলতে লাগল।

বিনিটাকে মাসীমা ধরে নিয়ে গেলেন বলে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

মাসীমা বিনিকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দিলেন কারণ ও বাড়ী থেকে দরজায় দুমদুম করে ঘা দেওয়ার শব্দ আর বিনির আকাশ-ফাটানো বাড়ী কাঁপানো গলার শব্দ, দুইই টের পাচ্ছিলাম। একটু পরে গলার শব্দ আর পেলুম না। বিনির যখন খুব রাগ হয় তখন প্রতীকারের উপায় না থাকলে সে ঘুমিয়ে পড়ে জানতুম। আজও বুঝলুম সে রাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিনির জন্যে আমার ভারী দুঃখু হচ্ছিল। বেচারী আজকের দিনে ঘুড়ী ওড়াতে বা ধরতে পাচ্ছে না। মাসীমার কি অন্যায় !

সামনের বাড়ীর নরুর বিজয়োল্লাস কাণে এল 'ভোঃ কাট্টা' মুহূর্ত্তে সব ভাবনা কোথায় সরে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম—কাদের ঘুড়ি কেটে দিয়ে নরু তার পঙ্খি ঘুড়িটাকে চচ্চড় করে টান্‌ছে।

একে একে আকাশে ঘুড়ির সংখ্যা বেড়ে উঠল। লাল, নীল, মুখপোড়া, বাহারি, সতরঞ্চি কত ঘুড়িই উড়ছে। আকাশটা যেন ঘুড়িতে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। হন্যে কুকুরের মতো একটা ঘুড়ি আর একটাকে তেড়ে যাচ্ছে, আবার অন্য একটা সেটাকে তেড়ে যাচ্ছে। দস্তুর মতো ঘুড়ির লড়াই লেগে গেছে। কত ঘুড়ি কেটে যাচ্ছে। বাড়ীর ছাতে কত যে 'হাতা' পড়ছে তার ঠিক নেই, অথচ কেউ নেই যে ধরে। বিনিটাও ছাতে নেই।

একটা ভারী চমৎকার সতরঞ্চি ঘুড়ি অনেক সুতোর মাথায় কেটে গিয়ে অনেক উঁচু দিয়ে আসছিল। চার পাঁচখানা ঘুড়ি সেটাকে লট্‌কাতে গিয়ে কেটে গেল। সতরঞ্চি ঘুড়িটা মাতালের মতো টল্‌তে টলতে কত হাত পেরিয়ে, আমাদের ছাত টপকে, বিনিদের ছাতের ওপরে এসে তার লগিটাতে একটা

ঠোক্কর দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। দশবারোটা ছোটলোকের ছেলের কাড়া-কাড়িতে ঘুড়িটা ফেঁসে গেল।······বিনি বেচারী ছাতে নেই সে থাকলে অমন সুন্দর ঘুড়িটাকি নষ্ট হয়।·········

অগুন্তি ঘুড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে চোখটা যেন ব্যথা করছিল। জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। এমন সময় আমার ঘরের দরজা থেকে বিনি ডাকলে—মণ্টুদা!

চমকে উঠলুম। বললুম—কিরে বিনি তুই এখানে এলি যে। যা, ছাতে যা।

বিনি নিরস স্বরে বললে—কেন?

আমি উৎসাহের সুরে বললুম—একটা যা গ্র্যাণ্ড সতরঞ্চি ঘুড়ি তোদের ছাতের ওপর দিয়ে চলে গেল। বিনি তখনি তাচ্ছিল্যভাবে বললে—যাক্ গে!

তার এমনি বৈরাগ্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—বললুম—ঘুড়ি ধরবি না।

'নাঃ' তারপর এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে এবার বিনি একটা চোখ টিপে বললে—আচ্ছা মণ্টুদা, শুয়ে শুয়ে তোমার বিরক্তি ধরে না।

কোনো উত্তর দিলুম না।

বিনি বললে—আচ্ছা, তুমি কি শুয়ে শুয়ে খালি ঘুড়ি ওড়া দেখ?

বললুম—কি আর করি?

খুব উৎসাহের সঙ্গে বিনি বললে—আচ্ছা, ঘুড়ি ওড়া দেখতে কি খুব ভাল লাগে?

কতলোকে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, আর আমি ঘুড়ি ওড়াতে পারি না। শুধু ঘুড়ি ওড়ান দেখেই আমায় খুসী হতে হচ্ছে একি কম দুঃখু। তবুও বিনির কথা শুনে হাসি এল। বললুম—হ্যাঁ।

আর ঘুড়ি ওড়ান দেখবে না?

চোখটা টনটন কচ্ছিল; তাই ঘুড়ি ওড়ান দেখতে ইচ্ছে করলেও সেদিকে চেয়ে থাকতে পাচ্ছিলুম না। তাই বিনির কথায় বললুম—না ভাই, চোখটা যেন টনটন করছে।

'তবে ও ছাইয়ের ঘুড়ি ওড়ান আর দেখে না, এস আমরা গল্প করি। অপরের ঘুড়ি ওড়াতে সে আমাদের দেখে কি হবে? আমরা ত আর ওড়াচ্ছি না।

কত দুঃখে যে বেচারী এ কথাগুলো বললে তা খালি আমিই বুঝতে পারলুম। তার সঙ্গে সহানুভূতির সুরে বললুম—সেই ভালো,—

নরুর বিজয় হুঙ্কার কাণে এল আবার। উৎকণ্ঠিতভাবে বিনিকে জিজ্ঞেস করলুম—নরুরা কাদের কেটে দিলে রে? বিনি আকাশের দিকে মুখটা ফিরিয়ে বললে—পেঁচোদের বোধ হয়।

বললুম—ওরা তাহ'লে অনেকগুলো ঘুড়ি কাটল আজ! 'গেলবারে, মন্টুদা, তুমি যা কেটে দিলে তার চেয়েও বেশী? গেলবারের কথা সুরু হল। ক 'কাটিম' সুতোর মাঞ্জা দিয়ে দিলুম, কখানা ক রকমের ঘুড়ি কিনে দিলুম, এক এক করে সে সব ঘটনাগুলো বেশ গল্পের মতো সাজিয়ে বিনি বলে যেতে লাগল। বিকেল কেটে সন্ধ্যে হ'য়ে এল। আকাশে আর চোখ চলে না। থেমে গেছে। সে বছরের মধ্যে ঘুড়ির উৎসব শেষ হল। কিন্তু ঘুড়ি না উড়িয়েও আমাতে আর বিনিতে শুধু ঘুড়ি ও বিনির গল্প করেই তার সকল আনন্দটুকু লুটে নিলুম।......

এই যে ছোট বেলাকার একদিনের উৎসব না করেও উৎসবের স্মৃতি, এটুকু আমার মনে চিরকালের জন্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জঙ্গ্লি

[চিত্রশিল্পী—শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত]

[শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর]

সে ছিল কেমন যেন মানুষ! তার সখগুলি ছিল বেজায় বিদ্‌ঘুটে। যা' কারুর মাথায় আসে নি, সে সব কাজ করা আর যেখানে কেউ কোনদিনও যায় নি,—নামও শোনে নি, এমন কি স্বপ্নেও ভাবে নি এমন সব জায়গায় বেড়াবার তার একটা মস্ত সখ ছিল। বয়স তার বেশী নয়—গোটা উনিশ, কুড়ি। লম্বা দেখতে, মাথায় লম্বা চুল, তাও কোনদিন আঁচরায় না। ঝাঁক্‌রা ঝাঁক্‌রা চুল মাথায় ভর্ত্তি। লোকে তার নাম দিয়েছিল—জঙ্গ্‌লি।

একদিন সকালে দেখা গেল জঙ্গলি বাড়ী নেই। কেউ তার জন্যে ভয়ে আঁতকে উঠলো না কারণ এরকম অনেকবার হয়েছে; অনেকবার সে বাড়ী থেকে পালিয়েছে, আবার কিছুদিন পরে ফিরে এসেছে।

যেদিন গ্রামে সেই পাগলা সন্ন্যাসীটা এসেছিল, সেইদিন থেকেই জঙ্গ্‌লি তার কাছে যেতে আরম্ভ করেছিল। যে দিন সে সন্ন্যাসীর কাছে সেই অদ্ভুদ দেশের কথা শুন্‌লে, সেদিন থেকে জঙ্গলি রোজ সে দেশে যাবার উপায় ভাবতে আরম্ভ কর্‌লে—গালে হাত দিয়ে।

সে এক মজার দেশ! সহরটা রংচং করা যেন স্বর্গটি। নানান্ রঙের পাখী নানান্ রঙের ফল-ফুলের গাছে উড়ে উড়ে বেড়ায়—বড় সুন্দর!

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে আমাদের দেশের লোক যদি সে দেশে যায় তো মাসখানেক তাকে চোখবন্ধ ক'রে হাঁট্‌তে হবে, তা না হ'লে চোখ ঝল্‌সে দেবে। সে দেশের ফলফুলের বাহার হ'লে কি!—সুন্দর হ'লে কি!—নেই গন্ধ। কোনো জিনিষের কোনো কিছুরই গন্ধ নেই। সব সমান। রূপের বাহার, গুণে লবডঙ্গা। সে দেশের লোকেরা গন্ধ কাকে বলে মোটে জানে না, বোঝে না। অন্য দেশের একজন লোক একবার তাদের গন্ধের বিষয় বোঝাতে গিয়েছিল তাতে তারা সেই লোকটির কথা শুনে ত' বুঝতে পারেই নি,—রেগে মেগে এমন সকলে গিলে

নেচে উঠে লোকটিকে রংচং ফুল ছুঁড়ে মেরেছিল যে কাপড়ের রঙে ও ঝল্‌মলে আর ফুলের রঙে লোকটার চোখ ঝল্‌সে যায় আর কি!

জঙ্গ্‌লি সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সব খবর জেনে শুনে ভোরের বেলা, যখন সবে পূবের আকাশ ফর্‌সা হ'তে আরম্ভ করেছে এমনই সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়েছিল সঙ্গে আতর মাখানো রুমালটা নিয়ে। গ্রামের সেই মেটে রাস্তা ধ'রে সে যাচ্ছিল—গুন্‌গুনিয়ে গান কর্‌তে কর্‌তে—

রঙিন নেশায় হয়েছি আমি অন্ধ;
সুন্দরই চাই, চাইনে আমি গন্ধ।—

ক্রমে গ্রামের পর গ্রাম সে এগিয়ে চল্‌লো। গ্রীষ্মতে সে পাগলের মত ছুটে চল্‌লো। বর্ষাও গেল। ঋতুর পর ঋতু কেটে গেল। বসন্তের বাতাস সবে বইতে সুরু করেছে; কোকিলও ঘনঘন গাইতে সুরু করেছে; গাছগুলি নতুন সাজে সেজেছে। এসব দেখে শুনে একটা দু'ধার গাছে-ঢাকা রাঙা মাটির পথ দিয়ে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সে চম্‌কে উঠলো। সে বুঝলে—বসন্তকাল এসেছে। সে দেখলে—দূরে বাগানে কত গোলাপ জবা পদ্ম বেল ফুল ফুটেছে। জঙ্গলি অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখছিল। পাশ দিয়ে একটি মেয়ে লাল নীল রেশমী কাপড় ঝল্‌মল্‌ ক'রে বাগানের দিকে যাচ্ছিল, যেন ফুলরাণী! সে জঙ্গলির দিকে তাকালে। কেমন যেন অবাক চোখে জঙ্গলিকে সে দেখলে। জঙ্গলি সাহস পেয়ে তার মুখের ওপর চোখ রেখে বল্‌লে,—"তুমি তোমার বাগান থেকে আমায় কয়েকটা গোলাপ ফুল তুলে দেবে?"

মেয়েটি তার কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"কে গা তুমি, একি রকম তোমার জামা। জামার ছিরি দেখে হাস্‌বো কি কাঁদবো তাত' বুঝতে পার্‌ছি না। না আছে রঙ না আছে কিছু। এস না, তোমার জামায় রঙ ক'রে দি—হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে না—ও—ফুল দেব কি ক'রে, আর নেবেই বা কি কর্‌তে?—কি চমৎকার দেখাচ্ছে আমার বাগানটা—না?"

জঙ্গলি বল্‌লে, "হ্যাঁ, সত্যি বেশ দেখাচ্ছে তবে আমার কেমন জানি লাগছে।

বাগানটা দেখছি বটে কিন্তু বাগানের মধ্যে যেন প্রাণ খুঁজে পাচ্ছি না,—বাগানটার আদ্ধেক বুঝলাম না মনে হচ্ছে”—

মেয়েটি বল্‌লে,—“কি যে ব'লো তুমি তার নাই ঠিক—বাঃ ও ওসব আজে বাজে শুনবার আমার সময় নেই মোটে।”—সে চ'লে গেল গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে আঁচল উড়িয়ে একটা পাক্ খেয়ে।

জঙ্গলি দ'মে গেল। কিন্তু সে আবার চল্‌তে লাগলো। দূরে লাল নীল হল্‌দে সবুজ রং করা সিল্কের কাপড় পরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দল হাত ধরাধরি ক'রে আস্‌ছে—জঙ্গলি দেখতে পেলে। জঙ্গলি এগিয়ে গিয়ে একটি ছোট্ট মেয়েকে ধ'রে ফেলে বল্‌লে,—“খুকুমণি, তোমার নাম কি ?”

খুকুমণি ভয় পেয়ে টুকটুকে মুখখানি ভার ক'রে এঁকে বেঁকে জঙ্গলির কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল ; একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে তার ছোট্ট চক্‌চকে কাঠের তলোয়ারটা ঝাঁক্‌রাণি দিয়ে বল্‌লে—"তুমি কে হে ?—বলা নাই, কওয়া নেই—আমার বন্ধুকে ধরেছ ?—ছেড়ে দাও ওকে।"—এই কথাগুলি ব'লে সে জঙ্গলির দিকে অবাক হ'য়ে তাকালে ; তারপর বল্‌লে,—"ওকি রকম তোমার জামা—না আছে রং না আছে কিছু—"

সবাই অবাক হ'য়ে জঙ্গলির দিকে তাকিয়েছিল। একটি মেয়ে বল্‌লে,—"তোমাকে আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না।" জঙ্গলি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে—"তোমাদের দেশে এত ফুল, তোমরা দেখছি ফুলটুল মাথায় গুঁজে রাখ না—তুমি যদি ঐ বাগানের শাদা ফুলগুলি মাথায় পর্‌তে ত তোমায় দেখ্‌তে চমৎকার লাগতো আর চারিদিকের বাতাসটা গন্ধে ভ'রে যেতো।"—

জঙ্গলির কথা শেষ না হ'তেই একটি মেয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"গন্ধ কিরকম দেখতে ?"

জঙ্গলি চারিদিক তাকিয়ে কাছে ফুলের গাছ না দেখতে পেয়ে পকেট থেকে তার আতর মাখানো রুমালটি বার ক'রে সেই ছেলেটির নাকের কাছে ধর্‌তেই সে লাফিয়ে উঠে তার কোঁক্‌ড়া কালো চুলের গুচ্ছ নাচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"বাপরে এ আবার কি!—ভীষণ ঝাঁঝ।' ব'লে অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে পড়লো। আর রুমালটা পকেট থেকে বের কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই কেন যে জঙ্গলির কাছ থেকে সরে পড়লো তা' জঙ্গলি কিছুতেই বুঝতে পার্‌লে না।—

সেই কোমরে চক্‌চকে তলোয়ার ঝোলানো ছেলেটি 'দিদি' 'দিদি' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ছুটে বাগানের দিকে চ'লে গেল। খানিক পরে জঙ্গলি দেখলে—সেই ছেলেটী, যার কাছে সে প্রথম বাগান থেকে ফুল চেয়েছিল, সেই মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে তাড়াতাড়ি সেই দিকে আস্‌ছে। জঙ্গলির কাছে তারা আস্‌তে পার্‌লে না কারণ আতর মাখানো রুমালটা জঙ্গলির কাছেই প'ড়েছিল।—তাদের বড় ঝাঁঝ লাগলো। খানিক পরে দেখা গেল দূরে লালটুপি পরা, সবুজ জামা পরা দশবারো জন গট্‌গট্‌ ক'রে তাদের দিকে আস্‌ছে। জঙ্গলি বুঝলে—এরা হচ্ছে পুলিশ।

তারাও জঙ্গলির কাছে আস্‌তে পার্‌লে না। জঙ্গলি হেসে রুমালটা পকেটে রেখে দিল। তখন গন্ধটা একটু কম পাওয়া যেতে লাগলো। যেটুকু গন্ধ তবু পাওয়া যাচ্ছিল সেটুকু পুলিশরা কোনোরকমে সয়ে জঙ্গলিকে বেঁধে ফেললে;—লাল নীল সুতোর মোটা দড়ি দিয়ে। তারপর রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে নানান রঙ বেরঙের পোষাক দরকার পড়লো। মেয়েটি—অর্থাৎ সেই তলোয়ার ঝোলানো ছোট্ট ছেলেটির দিদি বাড়ী থেকে পোষাক নিয়ে এলো। সেই নানান্ রঙের পোষাক প'রে জঙ্গলিকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। জঙ্গলির দিকে সেই মেয়েটি খানিক তাকিয়ে বল্‌লে,—"বাঃ এইবার তোমায় বেশ দেখাচ্ছে ত'?"—তারপর সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—"কি জানি, রাজা তোমায় কি শাস্তি দেবেন।

পুলিশরা জঙ্গলিকে নিয়ে চ'লে গেল। মেয়েটি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো তারপর সেও চ'লে গেল।

রাজসভায় রাজা ব'সেছিলেন। তার মাথায় সোনার মুকুট,—লাল নীল হীরে জহরত মুকুটের গায়ে বসানো। তিনি লাল জামা প'রে রয়েছেন। কোমরে তার চমৎকার একটা কোমরবন্ধ। সেটা কালো রঙের;—তার ওপর জরির কাজ করা। জঙ্গলি রাজসভায় যেতেই রাজা তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—"বাঃ—তোমার ত চমৎকার খাপসুরৎ চেহারা! তোমার নাম কি হে?"

জঙ্গলি বল্‌লে,—"মহারাজ, আমার নাম জঙ্গলি।" পুলিশ যখন সব খবর ভাল ক'রে রাজাকে বললে তখন রাজা একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—"তোমার শাস্তি পেতে হবে কিন্তু,—তুমি এমন জিনিষ তৈরী ক'রেছ যা' এই প্রথম শোনা গেল। তা' ছাড়া তুমি একজন ছোট্ট ছেলেকে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছিলে।—তোমাকে ছু'মাস রঙ করা জামা পর্‌তে দেওয়া হবে না—বুঝলে?"

রাজসভার সব লোক অবাক হ'য়ে গেল। লোকটাকে এত বড় শাস্তি দেওয়া হ'ল তবু লোকটা হাস্‌ছে কেন?" তারা ত' আর জানে না জঙ্গলি কোন্ দেশের মানুষ।

যাদুকর

(বড়গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীকমলবাসিনী দেবী]

যদু পাগলের মত ছুটে চলেছে। পথের দুধারে যাকে পায় সে তাকেই জিজ্ঞেস করে ভাই সবজান্তকে চেনো? তার দেশ কোথায় বলতে পার? বেশীর ভাগ লোকই বলে—এরকম নামই কখনও শুনিনি, কি কোরে আর তাকে চিনাবো বল। কেউ কেউ আবার পাগল ভেবে ঠাট্টা কোরে তার কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। তার ঐ রকম কালো চেহারা দেখে অনেকের আবার দয়া ও হয়, ভাবে আহা বেচারী শোকে দুঃখে বোধ হয় পাগলের মত হয়ে গেছে, এই ভেবে বাড়ী নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দেয়। ভগবানের দয়ায় এমনি কোরে রোজই যদুর কিছু না কিছু খাবার জুটেই যায়, তাকে একেবারে উপোস কোরে থাকতে হয় না।

কতদিন হোয়ে গেছে যদু বাড়ী থেকে বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তার নিজের মনে হচ্ছে, যেন সে মোটে দুচার দিন হোলো বাড়ী ছাড়া হয়েছে। তাই সে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলেছে, আস্তে হাঁটলে পাছে দেরী হয়ে যায়, তা হলে তো আর গোবরাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পক্ষীরাজ-বেগে গোবরা যে এক ঘণ্টার পথ এক মিনিটে পার হোয়ে গেছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। পা দুখানা ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সেদিকে তার নজরই নেই, সে ছুটেই চলেছে। আজ সারাদিন যদুর পেটে এক কনা খাবার ও পড়েনি। তবু সে ছুটতে কম করেনি। কিন্তু সারাদিন ছুটে ছুটে সন্ধ্যের দিকে তার শরীর একেবারে এলিয়ে পড়লো। সামনে একটী গাছ দেখতে পেয়ে সে সেই গাছতলায় একটু বিশ্রাম করবার জন্য কোন প্রকারে পা টেনে টেনে সেখানে এসে বসতে যাবে, হঠাৎ মাথা ঘুরে সেই খানে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে গেল। এই অবস্থায় যে যদু কতক্ষণ পড়েছিল তা তার মনে নেই। যখন তার জ্ঞান হোলো তখন সে চোখ চাইলে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না। কোথায়ই বা সেই গাছতলা আর কোথায়ই বা সেই বন। সে একে-

বারে একটী রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হয়েছে, আর রাজারই শোবার ঘরে বোধ হয় শুয়ে আছে। কারণ এ রকম সুন্দর সাজানো বড় ঘরে রাজা রাজড়া ছাড়া আর কেউ-যে শুতে কিম্বা থাকতে পারে, চিরদিন কুঁড়ে ঘরে বাস করায় অভ্যস্ত যদুর মাথায় সে কথা কিছুতেই ঢুকলো না। এযে একেবারে স্বপ্নের ও অতীত বলে মনে হোতে লাগল। ঘুমের ঘোর তখনও তার ভাল কোরে কাটেনি সেই অবস্থাতেই সে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলে। মস্ত বড় ঘর, ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক ঝাড় ঝুলছে, আর সেই ঝাড়ের আলোয় ঘরটা একেবারে দিনের আলোর মত আলোয় ভরে গেছে। রাত কি দিন বোঝবার যো নেই। গরীব যদু এসব জিনিস গল্প কথায়ই শুনেছে, চোখে দেখবার সৌভাগ্য তার কখনও হয়নি। রেড়ীর তেলের মিটমিটে আলোয় তাদের চিরকাল থাকা অভ্যেস, তাই এত আলো তার চোখে সহ্য হচ্ছিল না, চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। সে আর আলোর দিকে চেয়ে থাকতে পারলে না অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। চোখ ফেরাতেই ঘরের দেওয়ালের দিকে তার নজর পড়লো। যদু অবাক হোয়ে সেদিকে চেয়ে রইলো। এতো ভারি মজা, দেওয়ালের ওপর যদুর নিজের চেহারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কি কোরে যে এ রকম হোলো প্রথমটা যদু তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলে না। শেষে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে যদু বুঝতে পারলে, ওদেয়ালে যে এক খানা মস্ত বড় আয়না টাঙ্গনো রয়েছে ; সেই আয়নাতেই সে নিজের চেহারা দেখতে পেয়েছে। বাবা একি আয়না এযে একখানা মস্ত বড় ঘরের দরজা। তারপর ঘরের চারিদিকে চাইতে দেখে যে ঘরের আর তিন দিকে দেওয়ালেও ঠিক ঐ রকম আরো তিনখানা আয়না টাঙ্গনো। তারপর আরো কতরকম দামী জিনিসে যে ঘর সাজানো সে সব চোখে দেখা তো দূরের কথা সে সবের নামও কখন সে শোনেনি। বিছানার দিকে চোখ পড়তে, যদুর ইচ্ছে করলো এক লাফে বিছানা থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। ওরে বাপরে! এযে রাজা রাজড়ার বিছানা। একি তার মত গরীব লোকের শোয়ার জন্য। মস্ত বড় রূপোর পালকি, তার ওপর খুব পুরু গদিপাতা। গদিটীর ওপরে শাদা ধপধপে চাদর পাতা। বিছানার চারি-দিকে এই মোটা মোটা সব বালিশ। এত বালিশে যে কি দরকার হয় যদু তা

ভেবেই ঠিক করতে পারলে না। ময়লা একখানা কাঁথা পেতে ছোট্ট একটা বালিশ মাথায় দিয়ে তার শোওয়া অভ্যেস, এসব দেখে তার ভয় করতে লাগলো। ভয়ে তার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হোয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার তার হাসি পেল এই ভেবে যে, এসব কিছুই সত্যি নয় সবই স্বপ্ন। সে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে। তাই এই সব বাজে স্বপ্নের হাত এড়াবার জন্য সে দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধড়মড় কোরে বিছানার ওপর উঠে বসলো। কিন্তু কি বিপদ চোখ চাইতে আবার সেই সব। স্বপ্ন বোলেই বা কি কোরে বিশ্বাস করা যায়। এসব তবে কি ভোজবাজি। গাছতলায় তো পড়েছিল সে, ভূত প্রেতেই কি তাকে এই রকম সব দেখাচ্ছে ? ভয়ে যদুর হাত পা ঠাণ্ডা হোয়ে, মুখখানা তাকিয়ে এতটুকু হোয়ে গেল। তখন তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কাঁদবার ও যোগাড় প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় কে একজন যদুর মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—বাবা বড় ভয় পেয়েছো ? তোমার কোন ভয় নেই। এটা হচ্ছে আমার বাড়ী। আমি ভূত কিম্বা দানব নই, সে পরিচয় তুমি আস্তে আস্তে পাবে। তোমার উপকার ছাড়া আমার দ্বারা তোমার কোন প্রকার অপকার হবে না। তোমায় অসহায় ভাবে গাছতলায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমিই তোমাকে সেইখান থেকে তুলে এখানে নিয়ে এসেছি। তোমায় কেউ কিছু বলবে না। তোমার দরকার মত সব জিনিসই তুমি এখানে পাবে। এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। কেন তুমি ঐরকম অসহায় অবস্থায় ঐ গাছতলায় পড়েছিলে ? কোথায়ই বা যাচ্ছিলে ? তোমার বাড়ীই বা কোথায় ? সব আমায় বল শুনি।

যদু ভাল কোরে চোখ চেয়ে দেখলে যে এক সৌম্যমূর্ত্তি বুড় ভদ্রলোক তার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যদু তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে নেমে দুইহাত দিয়ে সেই ভদ্রলোকের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—হুজুর আপনি কেন আমার ওপর এত দয়া করলেন। সেই গাছতলায়ই পড়ে থাকতুম, বাঘ ভাল্লুকে আমায় খেয়ে ফেলতো, সেই আমার পক্ষে ভাল ছিল। আমার মত পুত্র-ঘাতীর মরাই মঙ্গল। ভদ্রলোকটী 'বল্লেন—সে কি ব্যাপার আমায় সব খুলে বল, কিছুই আমার কাছে লুকিও না। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

তোমার বিপদে আমি সাধ্যমত তোমার সাহায্য করবো। তখন যদু তার ছেলেকে সবজান্তার কাছে চাকরী করতে দেওয়ার ব্যাপার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব একে একে বোলে গেল। সব শুনে ভদ্রলোকটীর মুখখানা গম্ভীর হোয়ে উঠলো।

তিনি বল্লেন—তোমার ছেলে একজন নামজাদা যাদুকরের হাতে পড়েছে। এই কথা শুনেই তো যদুর মূর্চ্ছা হবারই উপক্রম হোলো। তিনি যদুর পিঠ চাপড়ে বললেন,—আরে তুমি যে যাদুকরের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলে। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি সব ঠিক কোরে দেবো। আমি হচ্ছি যাদুবিদ্যের ওঝা, যাদুকরদের পরম শত্রু। আমার কাছে তাদের চালাকি ঘটবে না। আমি ঠিক তোমার ছেলের উদ্ধারের ব্যবস্থা কোরে দেবো। তোমার ভাগ্যি ভাল যে তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছো। আর দিন পনের দেরী হলে পর আর ছেলেকে পাবার আশা তোমার থাকতো না। তখন তাকে যাদুকরের হাত থেকে উদ্ধার করতে বেশ একটু বেগ পেতে হোতো। কারণ একবচ্ছর পূর্ণ হোয়ে গেলে পর তোমার ছেলে সেই যাদুকরের যাদুবিদ্যার মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তো যে, তার নিজের ইচ্ছা কিম্বা শক্তি বল কিছুই থাকতো না। তখন যাদুকরের কথায় তাকে উঠতে বসতে হোতো। একবচ্ছর পরে ঠিক সেইদিন সেইখানে তুমি তোমার ছেলেকে দেখতে পেতে বটে, কিন্তু বাড়ী নিয়ে যেতে পারতে না। তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেই, সে এমন মূর্ত্তি ধরতো যে, তার সে মূর্ত্তি দেখে তুমি পালাতে পথ পেতে না। হয়তো সে সাপ হোয়ে তোমায় ছোবল মারতে আসতো কিম্বা বাঘ হোয়ে তোমায় কামড়াতে যেতো। তাতেও যদি ভয় না পেয়ে শক্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে, তাহলে হয় সাপের ছোবলে, কিম্বা বাঘের মুখে তোমার প্রাণ যেতো; এ জীবনে আর কখনও তোমায় বাড়ী ফিরতে হোতো না।

এমনিভাবে যখন কোন লোক কোন যাদুকরের আয়ত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন আমরা খুব সহজে সেই লোকের কোন উপকার করতে পারি না। তবে যাদুকরকে এমন করে জব্দ কোরে দিতে পারি যে, সে সেই লোককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে যাদুকরকে জব্দ করতে সময়ও লাগে ঢের। এমন কি দশ বার বছরই হয়তো কেটে যায়। যাক তোমার ছেলের যাবার দিন তুমি যেভাবে হিসেব

কোরে বলেছ, সেইভাবেই হিসেব কোরে দেখছি যে, কাল তার যাওয়ার এগার মাস পুরবে। তারপর কাল তুমি এখান থেকে রওনা হোলে, সেখানে গিয়ে পেঁছতে তোমার চোদ্দ দিন ও ফিরে আসতে চোদ্দ দিন সব সমেত আটাশ দিন লাগবে। বছর পোরবার দিন দুই আগে থাকতেই তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে এখানে ফিরে আসতে পারবে। যাতে তুমি নিরাপদে সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে পার তার ব্যবস্থা আমি কোরে দেবো, তোমার কোন ভাবনা নেই। আজ নিশ্চিন্ত মনে খাও দাও ফুর্ত্তি কর ঘুম যাও, কাল ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়বে।

যদু আমতা আমতা কোরে বল্লে—হুজুর আমি নিজেই যেতে পারবো। শুধু পথটার কথা আমায় বোলে দেবেন তাহলেই হবে। আপনাকে আর আমার জন্য কষ্ট করতে হবে না। আপনি এমনিতেই এ গরীবের যথেষ্ট উপকার করেছেন। সেজন্য এ গরীব আপনার কাছে চির ঋণী।

ভদ্রলোকটী হো হো কোরে হাসতে হাসতে বল্লন—পায়ে হেঁটে তুমি সেখানে যাবে? পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে পেঁছতে কতদিন লাগবে জানো? খুব কম কোরে পুরো চারটী বচ্ছর ব্যাপার শুনে তো যদুর চক্ষু স্থির। ভয়ে তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। যদুর মুখ দেখে ভদ্রলোকটী বেশ বুঝতে পারলেন যে এই সব শুনে সে বড্ড ভয় পেয়েছে। তিনি যদুর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—কোন ভয় নেই তোমার, আমি যখন তোমায় ভরসা দিয়েছি তখন যে কোন উপায়ে হোক ঠিক সময়ে আমি তোমায় সেখানে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। আজ তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাও দাও বিশ্রাম কর। তোমার খাবার আনতে বলে দিয়েছি, এখনি খাবার এসে পড়বে। যদি বড় ক্লান্তিবোধ কর তাহলে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পোড়ো। আর তা না হোলে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, গান বাজনা কিম্বা আর যে কোন রকম ফুর্ত্তি করতে ইচ্ছে হয় কোরো, কেউ তোমায় বাধা দেবে না। রাত্রে তোমার ঘরে আমার একজন কর্ম্মচারীও শুয়ে থাকবে; যদি কিছু দরকার হয় তাহলে তাকে বোলো সে তখনি এনে দেবে। এবার আমি যাই। আজ আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। কাল ভোরে আবার আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। এই বোলে ভদ্রলোকটী ঘর থেকে বেরিয়ে চোলে গেলেন। (ক্রমশঃ)

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধাঁর উত্তর—

(১) কাগজ। (২) পটল। (৩) চুপড়ি। (৪) পিঁয়াজ।

যাঁহাদের ৪টী ধাঁধাঁর উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—শ্রীঅজিতকুমার সরকার; হাওড়া; কুমারীভক্তি রায়, রায়গঞ্জ, নৈহাটী; শ্রীপ্রমথনাথ দে, কুমারী তরুলতা, শিবানী ও রেখা দে, কলিকাতা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু বর্দ্ধমান; সংকর্ম্ম সমিতির ছাত্রবৃন্দ; শ্রীবিমলকুমার রায়, পাটনা; শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীসন্ধ্যারাণী সান্যাল. শ্রীঅশোকরঞ্জন মুখার্জ্জী, কলিকাতা; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গুহ, গয়া; শ্রীবাণী দেবী, বর্দ্ধমান; শ্রীশিশির ও অজিতকুমার মিত্র, শ্রীগৌরিপদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা শ্রীশান্তিপ্রিয়া বসু, পেগু (বর্ম্মা) দেবব্রত, প্রিয়ব্রত, তরুণ, তপন, গীতা, ইভা, ইলা, নেড়ু, কলিকাতা।

যাহাদের ৩টী ধাঁধাঁর উত্তর ঠিক হইয়াছে—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা; শ্রীঅমিয় ও নিমাইরতন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিঃপ্রসাদ মিত্র, বলাইচন্দ্র ঘোষ, মলিন্দ্রনাথ গোস্বামী, গৌরচন্দ্র দাস ও অমৃত লাইব্রেরীর মেম্বারগণ, শালিখা; শ্রীমতী সুষমা, প্রতিমা ঘোষ, উষারাণী মিত্র ও শ্রীরমণীমোহন মিত্র; হাওড়া; কুমারী উষারাণী সোম, কলিকাতা; শ্রীহেমাঙ্গমোহন ও শ্রীননীগোপাল বরকাকতী, জোরহাট (আসাম) শ্রীবিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা; শ্রীউষাপতি ঘটক, কালীঘাট; শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, আভা, শোভা, শান্তি কলিকাতা; শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, ঢাকা; শ্রীমান্ অনিলকুমার সান্যাল ও শ্রমতী শোভা দেবী কলিকাতা; শ্রীগোবিন্দলাল চাটার্জ্জি, রূপপুর; বাসন্তীলতা দেবী, লংলেবিন (বর্ম্মা; দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, কালী, জিতেনদা, শৈলেনদা, ভক্তিবাবু, হরেনবাবু, ভুলো ইত্যাদি।

যাহাদের ২টী ধাঁধাঁর উত্তর ঠিক হইয়াছে—

শ্রীগোলাপচাঁদ বর্ম্মন, কলিকাতা; শ্রীসুবোধচন্দ্র কর্ম্মকার, জালিয়াহাটী, শ্রীঅমিয় কুমার, সুনিলকুমার, রেণুপ্রভা ও হেমপ্রভা সিংহ, শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার ও শ্রীঅনিলকুমার সিংহ. ইটিলি; বাবু, ভাকু. সুকু, গুপি, শান্তি, এবং রেণু; কলিকাতা; শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা।

যাহাদের ১টী ধাঁধাঁর উত্তর ঠিক হইয়াছে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, নারায়ণ সন্থ, শ্রীনিখিলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কালীঘাট; হাকিমপুর মধ্য ইংবাজী স্কুলের ৬ষ্ঠমানের ছাত্রগণ।

সম্পাদকের চিঠি ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা

মুকুলের পাঠক-পাঠিকাগণ !

এবারে পুরস্কার পেয়েছেন বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেনের (কলিকাতা) শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী বয়স (১৪ বছর) তাঁর প্রবন্ধ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এবারের অর্থাৎ অগ্রহায়ণের পুরস্কার প্রতিযোগিতায় "বসন্ত" সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখতে হবে। যার কবিতা (১৬ বছর পর্য্যন্ত বয়সের) ভালো হবে তাকে পাঁচ টাকার বই পুরস্কার দেওয়া হবে। এবারে যে কুপন আছে সেটী কবিতার সঙ্গে আমাদের আফিসে ২৫শের মধ্যে পৌঁছানো চাই। বিচারক শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও শ্রীনরেন্দ্র দেব।

দেশবন্ধুর জীবন-চরিত এবারে নানা কারণে লিখে উঠ্‌তে পারিনি—পৌষ সংখ্যা থেকে আবার প্রকাশিত হবে। এবারে "ভূতুড়ে দ্বীপ" নামে একখানি নতুন উপন্যাস দেওয়া হ'ল।

"মুকুল" তোমাদের কেমন লাগছে,—কি দিলে তোমাদের মতে মুকুল আরও সুগন্ধযুক্ত হয়, সে-সম্বন্ধে তোমাদের চিঠি পেলে আমরা বাধিত হব।

মনে রেখো "মুকুল" তোমাদের পত্রিকা—তোমরা যা বল্‌বে আমরা তাই করবো। এবারে নতুন রকমের একটী ধাঁধাঁ দেওয়া হ'ল আশা করি, তোমাদের ভালো লাগবে।

ইতি—

তোমাদের—সম্পাদক।
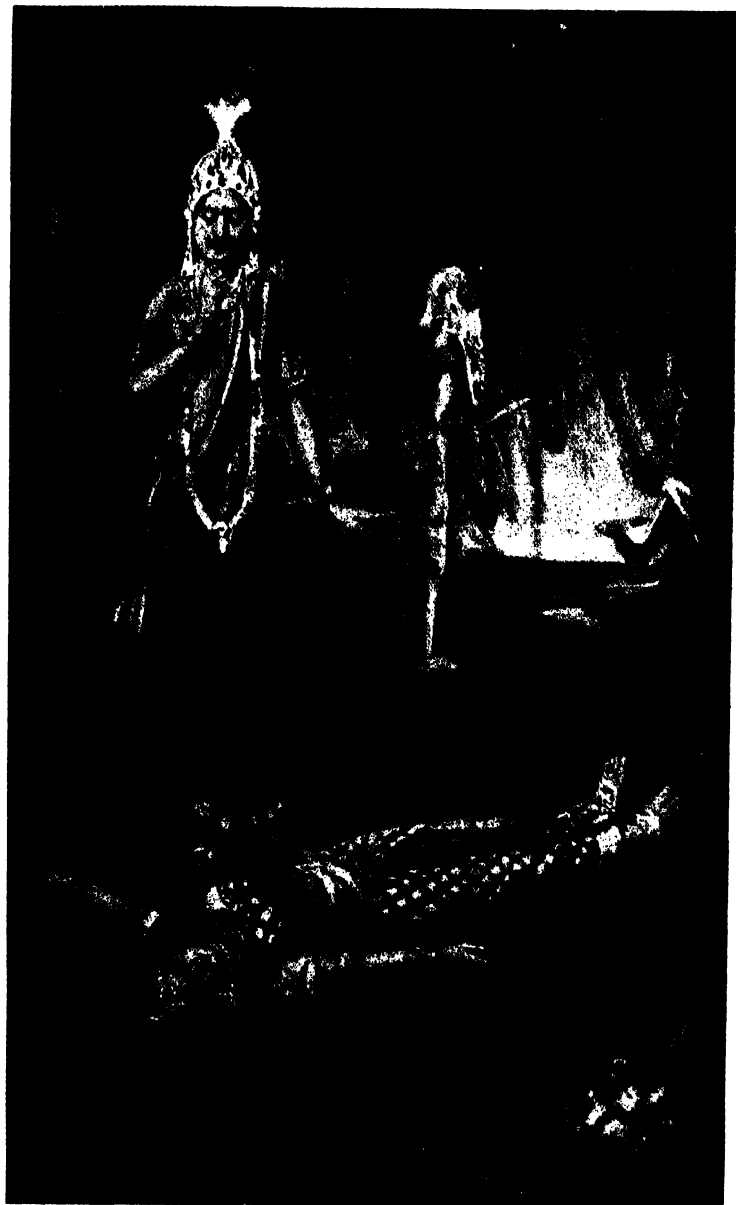
সতীর দেহত্যাগ।

১ম বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩২ { অষ্টম সংখ্যা

ফাল্গুনে

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

তোমাদের সাধের মুকুল
দখিনের হাওয়া এসে
ছুঁয়ে যাক্ ভালোবেসে
রূপে রসে করিয়া আকুল।

তোমাদের স্নেহের মুকুল
কোকিল-পাপিয়া-তানে
ভ্রমরগুঞ্জন গানে
সুষমায় হউক্ অতুল।

তোমাদের প্রাণের মুকুল
সবুজের লীলা মাঝে
ফাগুন-পূর্ণিমা-সাঁঝে
তুমি' জ্যো'স্না-ধোয়া ফোটা ফুল।

যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল

[ইটালিয়ান লেখক 'Ortensio Lando'র 'Evil for Evil'এর অনুবাদ]

[শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়]

ইটালীর টস্কানি নগরে "রিকার্ডো-কাপ্পনি (Riccard Copponi) নামে একজন লোক ব্যবসা করে অনেক টাকাকড়ি জমিয়েছিল। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরও ভেঙ্গে পড়েছিল তাই তার ছেলে 'ভিন্সেন্টি'কে (Vincenti) সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, দোকানপত্তর বুঝিয়ে দিয়ে, সে বিছানায় আশ্রয় নিল।

তার ছেলে কিন্তু বাপকে মোটেই ভক্তি করতো না, তাঁর সেবা করতেও আদৌ ইচ্ছুক নয় তাই একদিন 'ভাল ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা হবে' এই কথা বাপকে বুঝিয়ে, তাঁকে সহরের এক হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে।

ব্যবসা খুব জোরেই চল্‌তে লাগ্‌লো কিন্তু সেই কৃতঘ্ন পুত্র বুড়ো বাপের যার দৌলতে এই ব্যবসা, এত টাকাকড়ি প্রতিপত্তি—তার আদৌ খোঁজ খবর রাখ্‌তো না, হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি।

পাপ আর কত দিন চাপা থাকে তাই তার পাড়ার লোক বন্ধুবান্ধবরা—তার বাপের প্রতি এই রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে তাকে ছ্যা ছ্যা কর্‌তে লাগ্‌লো। সে তা'দের কত বোঝাতে চেষ্টা করলে,- 'সেখানে তিনি বেশ আছেন, ভাল ডাক্তার, ভাল ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা হচ্ছে ;' কিন্তু তা'রা তা শোনে না,—বলে,—'তুমি এত বড় লোক, বাড়ীতেই ত টাকা ফেল্‌লে সে সবের ব্যবস্থা সহজেই কর্‌তে পার্‌তে...'

'ভিন্সিন্টি' মহা মুস্কিলে পড়লো ; বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে পায় না, প্রতি-বেশীদের মুখ দেখাতে পারে না। কি জানি হঠাৎ কি খেয়াল হল একদিন, সে ভাবলে বাপকে কিছু জামা কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

তার ছ'বছরের ছেলের হাতে দুটো ভাল সার্ট দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলে হাঁস-পাতালে তার ঠাকুর্দ্দার কাছে। ছোট্ট ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে ভক্তি-ভরে তার ঠাকুর্দ্দার কাছে ছুট্‌লো সেই জামা দুটো নিয়ে।

সন্ধ্যার সময় হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এলে 'ভিল্লিন্টি' ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে,—"কিরে সার্ট-দুটো ঠিক দিয়ে আসতে পেরেছিস্ ত?'

"আমি একটা সার্ট তাঁকে দিয়েছি বাবা।" ছেলেটি উত্তর দিলে।

"কি!" রাগের সঙ্গে চেঁচিয়ে 'ভিল্লিন্টি' বল্লে; "তোমাকে কি বলিনি যে ওদুটো সার্টই তোমার ঠাকুর্দ্দার?"

"হ্যাঁ," ছোট্ট ছেলেটী বেশ নির্ভয়ে তাড়াতাড়ি বাপকে উত্তর দিলে,—"কিন্তু আমি ভাবলুম ওদুটো' থেকে তোমার জন্যে একটা রেখে দিই, বাবা, কারণ তুমি যখন হাঁসপাতালে যাবে তখন আমার আবার তোমাকেও কিছু পাঠাতে হবে।"

"কি রকম!" 'ভিল্লিন্টি' গম্ভীর স্বরে বল্লে,—"আমায় হাঁসপাতালে পাঠাবে, তুমি কি পরে এমনিই নিষ্ঠুর হবে, খোকা?"

"কেন হব না?" খোকা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো,—"যে অপরের মন্দ করে, প্রতিদানে তাকেও মন্দ ভোগ করতে হবে। তুমি তোমার অসুস্থ বুড়ো বাপকে পাঠিয়ে দিয়েছ হাঁসপাতালে, তিনি ত জীবনে কারুর মন্দ করেন নি; তুমি কি ভাব আমি যখন বড় হব আমিও তোমাকে হাঁসপাতালে পাঠাব না? সত্যি বলছি বাবা আমি নিশ্চয়ই পাঠাব কারণ আগেই ত বল্লুম, যে অপরের মন্দ করে তাকেও মন্দ সইতে হয়।"

ছেলের কথা শুনে 'ভিল্লিন্টি' চমকে উঠল, উঃ সে কি অন্যায়ই করেছে, মনে মনে ভয়ানক অনুতাপ করতে লাগ্‌লো। সেই দিনই সে হাঁসপাতালে গিয়ে বাপের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে তক্ষুনি বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপর থেকে সে বাপকে ভয়ানক ভক্তি করতে লাগ্‌লো, তাঁর অভাব অনুযোগ নিজের হাতে মোচন করতো, বাপের বড় বাধ্য ছেলে হয়ে উঠল।

এই ঘটনার পরে সমস্ত 'টস্কেনির' মধ্যে একটা প্রবাদ রটে গেল 'অপরের মন্দ ক'রলে নিজেরও মন্দ হয়' (Let him that does evil expecect in return) তারপর এই প্রবাদটি ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইটালীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌লো।

(চার)

সে হাতখানায় কী ঘন ঘন লোমে ভরা! লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলোতে কী বিশ্রী বড় বড় ন'খ! হাতখানা এগিয়ে আসতে লাগল আস্তে আস্তে,—যেন একটা জীবন্ত হিংস্র অক্টোপস তার সমস্ত দাড়াগুলো ছড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আস্ছে।

খোকা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিল, পাশেই পাখীগুলো ডানা ছড়িয়ে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে সেই পাতালপুরীতে শুয়েছিল,—ঠিক মরার মতো। হাতখানা এগিয়ে এসে খোকার নাকের সাম্নে এসে থেমে গেল। তারপর হাতখানা একনিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে সেখানে উদয় হলো একটি তালগাছের মতো লম্বা লোক। চেহারাখানা তার রোগা কালো বিশ্রী হ'লে হবে কি! তার পোষাকের জাঁকজমক, বাহার দেখবার মতো! বড় বড় নামজাদা রাজা - মহারাজার পোষাককেও হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু এই রকম ঝক্ঝকে দামী পোষাক পরাতে তাকে আরও খারাপ দেখাচ্ছিল। চোখদুটো তার ভয়ানক ছোট,—ঠিক মটরের মত গোল গোল দেখতে; নাকটা ধারালো তরোয়ালের মতো খাড়া উঁচু। শরীরের অনুপাতে হাতদুটোও বেশ লম্বা। পা দুটো কিন্তু অদ্ভুত রকমের,—ভয়ানক ছোট। সেই কুৎসিত লোকটা এসে দাঁড়াতেই খোকার জ্ঞান হ'ল; পাখীরাও ডানা সরিয়ে মুখ তুলে মিটির মিটির তাকাতে লাগ্লো।

সে লোকটা মুখখানা নীচু ক'রে শরীরটা আধখানা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ব'ল্তে লাগ্লো—আমি তোমাদের সেই বিট্‌কেল হাতের কবল থেকে বাঁচালাম,—আর একটু দেরী হ'লে তোমাদের আর চোখ খুলে তাকাতে হ'ত না। খোকা! তোমার নিজের ও তোমার সঙ্গীদের প্রাণ বাঁচানোর বদলে আমায় কি

উপহার দিতে চাও বল! হ্যাঁ—আগে তোমাদের কাছে আমার পরিচয় দেওয়াটা দরকার ব'লে মনে করি। তার পোষাকের বাহার দেখে খোকার তো চোখ ঝ'ল্সে যাবার উপক্রম হ'ল! সে চুপ ক'রে বসে রইলো!

লোকটা একগাল হেসে তার তামাকের মতো কালো কালো দাঁতগুলো বের ক'রে বল্লে—তোমরা যেখানে এসেছ, এ জায়গাটার নাম পাতালপুরী; এই পাতালপুরীর সম্রাট আমি, ঐশ্বর্য্যে—বলে আমার এই রাজ্য,—তোমাদের দেশ তো কোন্ ছাড়, স্বর্গ রাজ্যের চেয়ে ও সেরা। আজ পর্য্যন্ত কেউই আমায় যুদ্ধে হারাতে পারে-নি। একবার যদি আমার এই পাতালপুরীর চারিদিক বেড়িয়ে দেখ, তা'হলে এর সৌন্দর্য্য ও অফুরন্ত সোণা-দানা তোমায় বিমুগ্ধ ক'রবে। ঐ যে হাত তোমাদের মুঠোর ভেতর চেপে মেরে ফেল্বার মতলব ক'রেছিল,—সে হচ্ছে আমার পাতালপুরীর সতর্ক প্রহরীর। আমি ঘটনা-চক্রে এখানে এসে প'ড়েছিলাম ব'লেই তোমাদের কাঁচা প্রাণগুলো আজ বেঁচে গেছে। এর জন্যে হে আমার ছোট ছোট বন্ধুরা!—তোমরা কি আমার কাছে উপকৃত নও?

চেহারা তার বিদ্‌ঘুটে হ'লে হবে কি তার গলার স্বর ভারী মিষ্টি,—মধুর গানের মতোই। কথা বল্বার ভঙ্গী ও সুন্দর।

খোকার প্রথমটা ভয়ে প্রাণ ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছিল বটে কিন্তু লোকটার বক্তৃতার বহর শুনে ও সেই তাদের প্রাণ ঐ হাতের কবল থেকে বাঁচিয়েছে জান্‌তে পেরে তার মনে সাহস এলো।

কোকিল ফিস ফিস্ ক'রে বল্লে—ওর লম্বা চেহারার মতন লম্বা লম্বা কথা শুনে ভুলো না খোকা! বেটার সব বাজে কথা, কোন বদ্ মতলব আছে।

বৌ-কথা-কও চুপি চুপি খোকার কানের কাছে ঠোঁট উঁচু ক'রে বল্লে—এ তোমার নিশ্চয়ই সেই নকল বুড়ী ঠাকুমা। আগেকার মতলব কোন কারণে ফেঁসে যাওয়াতে আবার অন্য একটা মূর্ত্তি ধ'রে এসে লোভ দেখাতে আরম্ভ করেছে।

খোকার ম'নের ভেতর কিন্তু একটা কথা কেবলই ঘুরে-ফিরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল; সেটা হচ্ছে যে ঐ লোকটা তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। লোমে-ভরা বড় বড় ন'খশুদ্ধ হাতখানা মনে প'ড়তেই সে শিউরে উঠলো,—তারা তো ঐ হাতের খপ্পরের ভেতর

এসে প'ড়েছিল,—ঐ লোকটাই তো এ দেশের সম্রাট ব'লে অসময়ে এসে তাদের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে। তার মন জীবন-দাতার কাছে কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠ্‌লো।

সে ভুলে গেল কোকিলের কথা,—সে ভুলে গেল বৌ-কথা-কওয়ের সতর্ক হবার কথা।—

একবার কেশে নিয়ে গলাটা পরিস্কার ক'রে সে বল্লে—আপনি আমার মত মানুষের কাছে কি চান? আমার কি এমন জিনিষ আছে যে আপনার মত সম্রাটকে উপহার দিতে পারি?

বিট্‌কেল লোকটা এবার তার মুখের ওপর খুসীর রস ঢেলে দিয়ে হাসতে হাসতে বল্লে—খোকা! তুমি ছেলে মানুষ, জীবনের অনেক কথা তোমার জানতে বাকি আছে। সম্রাট হ'লে হবে কি! সোনা-হীরে দেখে দেখে চোখ প'চে যাবার মতো হ'লে হবে কি,—আমার একটা দারুণ অভাব আছে। সম্রাট আমি, বছর পাঁচেক আগে এক খেয়াল হ'ল যে আমার ভাণ্ডারে নাম-জানা নামা-না-জানা সমস্ত জিনিষ সঞ্চয় ক'রতে হবে। অর্থ ব্যয় ক'রতে লাগলুম জলের মতো। প্রথমে পৃথিবী অর্থাৎ তোমাদের দেশে গেলুম,—তারপর ইন্দ্রের রাজ্যে গেলুম কিন্তু সেখানে আমাকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে হারিয়ে দিয়ে তবে স্বর্গ-রাজ্যের সমস্ত জিনিষ সঞ্চয় ক'রতে হলো।

তারপর রোজ সন্ধ্যা বেলায় আমার ভাণ্ডার একবার ক'রে দেখে থাকি,—দেখে বড়ই তৃপ্তি পাই। সত্য কথা ব'লতে কি মনে একটা অহঙ্কারও জেগে ওঠে। কোন কথা লুকোবো না তোমাদের কাছে,—তোমরা আমার বন্ধু।

তার পর আজ এখানে এসে তোমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে হঠাৎ আবিস্কার করলুম, এখনোও আমার ভাণ্ডারে একটা অভাব আছে। কৈ পৃথিবীতে গিয়ে এ রকম জিনিষতো আর কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না,—কেবল একমাত্র তোমার কাছেই রয়েছে দেখ্‌ছি।

খোকা বল্লে—কৈ আমার কাছে সে-রকম জিনিষ!—আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

লোকটা বেদম হাসতে হাসতে বল্লে—তা বটে! না দেখতে পাবার মতোই বটে, যদিও ওটা একটা তুচ্ছ জিনিষ,—কিন্তু আমার খেয়ালের কাছে ওর দাম

বহুমূল্য। যদি তুমি আমায় ওটা দাও তা'হলে আমার এই পাতাল রাজ্যে তোমায় ও তোমার সঙ্গীদের বেড়াতে নিয়ে যাবো ও তুমি যে জিনিষ চাইবে তোমায় দোব। জিনিষটা আর কিছু নয়—তোমার হাতের সোণার তাবিজটা।

কোকিল আস্তে আস্তে বল্লে—খবরদার খোকা! তাবিজ তোমার হাতে আছে ব'লে ভূত বেটারা কিছুই ক'রতে পারে নি। ও ভাণ্ডার-ফাণ্ডার কিছুই নয়,—একটা ছুতো ক'রে তাবিজটা তোমার হাত থেকে খুলে নেওয়ার চেষ্টা। তারপর আর কি! ঘপাৎ ক'রে একদম ঘাড়ে চাপবে।—

বৌ-কথা-কও ঘাড় নেড়ে কোকিলের কথায় সায় দিয়ে বল্লে—ঠিক্ বটে! ঠিক্ বটে!

লম্বা লোকটা আপন মনে এতক্ষণ তার খোঁচা খোঁচা কটা গোঁপে তা' দিচ্ছিল।

খোকা তখন মাথা চুলকে বল্লে—আচ্ছা! এ জিনিষটী ছাড়া আপনি অন্য যা জিনিষ আমার কাছে আছে দয়া ক'রে নিন।

ব্যস্ আর যাবে কোথায়! লম্বা লোকটা ছোট ছোট চোখদুটো করমচার মতো লাল ক'রে বল্লে—তবে তোমরা মরোগে যাও,—দেখ্ছি নেহাৎই কাঁচা প্রাণগুলো দেবে। আমি তবে চল্লুম কিন্তু সেই লোমে-ভরা হাতখানা এলে আমায় পরে দোষ দিও না।

কোকিল খোকাকে বল্লে—যতক্ষণ তাবিজ আছে ততক্ষণ কোন ভয় নেই খোকা,—তুমি চুপ্ চাপ বসে থাকো।

এইবার লোকটা বল্লে—তা' হলে ছোট ছোট বন্ধুরা আমার! চল্লুম আমি। বল্তেই চারিদিক থেকে এবার একখানা হাত নয়, একেবারে এগারোখানা হাত তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগ্লো।

খোকার শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে লাগলো।

ওপর থেকে কে যেন বল্লে—এখনোও ভেবে দেখ।—এ গলার স্বর সেই লম্বা লোকটার।

পাখীগুলো চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো—ডানাগুলো কে যেন ছেঁচে দিচ্ছে—গেলুম—গেলুম।

খোকা বলে উঠ্‌লো—নিয়ে যাও তাবিজ—তোমার কথায় রাজী হলুম।

সঙ্গে সঙ্গে হাত কখানা অদৃশ্য হয়ে চলে এলো সেই লম্বা লোকটা হাস্‌তে হাস্‌তে।

সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—এই তো বুদ্ধিমানের কাজ। দাও এখন তাবিজটা। যাক্ আমার ভাণ্ডারে আজ আর কিছুই অভাব রইলো না। চল তোমরা আমার রাজ্যে—যে জিনিষ তোমার পছন্দ হবে,--চাইলেই আমি দোব।

খোকা বল্লে—আচ্ছা। আগে আমাদের আপনার রাজ্যে বেড়ানো হোক্,—তারপর আমি তাবিজ দোব।

লম্বা লোকটা তাতেই রাজী হ'য়ে গেল। সে খোকা ও পাখীদের নিয়ে গিয়ে যে জায়গাটায় উপস্থিত হ'ল সেটা আলোয়—আলোয় পরিপূর্ণ। সুন্দর প্রাসাদ,—তার ভেতরে অসংখ্য স্বর্ণ মুদ্রা ঝক্ ঝক্ ক'রছে। কত রকম জিনিষে যে সে প্রাসাদ ভরা তার ইয়ত্তা নেই।

লোকটা বল্লে—দাও এইবার তাবিজটা খুলে আমার হাতে। এইবার আমি তোমাদের আমার সেই নাম-জানা, নাম-না-জানা জিনিষে ভরা ঘরে নিয়ে যাবো।

খোকা এইবার তার তাবিজটা খুলে দিলে।—

সঙ্গে সঙ্গে আলোর তেজ ক'মে আস্‌তে লাগলো,—খোকা সভয়ে দেখ্‌লে একলা সে একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী।—

* * * * * * * *

রাতে যখন তার চোখ ঘুমে ঢুলে প'ড়ে তাকিয়ে থাক্‌তে চাইছে না,—তখন সে শুন্‌তে পেলে কে যেন ঘরের ওপরে খস্ খস্ শব্দ ক'রছে।

তার পরই কে যেন বল্‌তে লাগ্‌লো—খোকা! তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না,—আমি তোমাদের বাড়ীরই চাকর ছিলাম অনেকদিন আগে,—তোমাদের বাড়ীতে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। মাঠে আমি যে—দিন বজ্রাঘাতে মারা যাই, সেইদিন থেকে আমি এই ভুতুড়ে দ্বীপে। তুমি আজ এই দ্বীপের রাজার পাল্লায় প'ড়েছ। তাবিজ তোমার হাতে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তোমায় প্রাণে মারতে পারে—নি।

কিন্তু আজ তাবিজ সে ভুলিয়ে চালাকি ক'রে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে,—তুমি আজ বিপদগ্রস্থ। আজ রাত্রেই বোধ হয় তোমায় সে মেরে ফেল্‌বে। তোমার ওপর আক্রোশের কারণ আর কিছুই নয়,—তোমায় মেরে ফেলে তোমার বাপের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। এ লোকটা বছর দুয়েক আগে ও তোমাদের পৃথিবীতেই ছিল,—তখন সে ছিল সেরা পাপী। তোমার বাবার এজলাসে একবার সে ডাকাতি কর্‌বার অপরাধে দু'বছর টানা জেল খাট্‌তে বাধ্য হয়। জেলেই সে যায় মারা—তারপর সে এই ভুতুড়ে দ্বীপে আসে ও তখনকার রাজার চেয়ে সেরা পাপী বলে সেই তাকে টপ্‌কে রাজা হয়। একমাত্র রাজারই এখানে অনেক ক্ষমতা আছে। সে আরও একটু চেঁচিয়ে বল্লে—আমি আর কি ক'রবো,—আমি সামান্য একজন ভূত, আমার সাধ্য কি আমি তোমায় বাঁচাই।

তারপর চারিদিক সব চুপ্‌ চাপ্‌—নিস্তব্ধ—নিঝুম হ'য়ে গেল। ঘণ্টা তিনেক কেটে গেলে ওপরে মূহুর্ত্তের জন্য আলো জ্বলে উঠ্‌লো—খোকা চেয়ে দেখ্‌লে সেই লম্বা লোকটা।—

পরক্ষণেই তার শরীরে কে যেন শত শত ধারালো ছুঁচ ফুটিয়ে দিতে লাগলো। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কে আছ আমায় বাঁচাও—

কিন্তু সেই আর্ত্ত চীৎকার এক পৈশাচিক হাসির আড়ালে চাপা প'ড়ে গেল। ঘরখানা ভ'রে গেল এক অট্টহাসির হা হা শব্দে ;—ঘর কাঁপিয়ে সেই হাসির প্রতিধ্বনি আবার উঠ্‌লো হা—হা—

সে কি এম্নি ক'রেই মরণের পথে এগিয়ে চল্‌লো ?

(চল্‌বে)

বিচ্ছু

[শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম, এ]

পুঁটে ছোঁড়া ছেঁড়া পাটি,
নাম গোরা— ভাঙা লাঠী,
বাঁকা-চোরা থালা, বাটি,
ভঙ্গী, ভাণ্ড—
"ভুলো" আর, এই মত
"হুলো" তার —কই কত !—
খেলাবার আছে শত
সঙ্গী। কাণ্ড !

খাই-খাই, থর্ থর্
আরো চাই— নাই তর্,
পাঠে নাই ভয়-ডর্
চিত্ত ; কিচ্ছু—
দিন্-রাত্ গুর্ গুর্
উৎপাত্ স্বর্-স্বর্—
মা'র সাথ্ বাস্তর
—নিত্য ! বিচ্ছু !!

যাদুকর

[শ্রীকমলবাসিনী দেবী]

ঈগলপাখী যদুকে পিঠে নিয়ে উড়তে উড়তে কত বনজঙ্গল নদ, নদী পেরিয়ে সেইদিন দুপুরবেলা এক পাহাড়ের ওপর নেমে যদুকে বল্লে—ভাই তোমার নিশ্চয় বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমি যাই তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ এই খানে বসে থাক।

এই বলে ঈগল গা ঝাড়া দিলে। গা ঝাড়া দিতেই তার পালকের ভেতর থেকে ছোট একটী বাঁশী বেরিয়ে পড়লো। যদুকে তুলে নিতে বলে সে বল্লে—দেখ আমি ফিরে আসার আগে যদি তুমি কোন রকম বিপদে পড় তা হলে, তখুনি এই বাশীটী বাজিও, আমি যেখানেই থাকি না কেন এ বাঁশীর আওয়াজ আমার কানে পৌঁছবেই, আমি তখনি ছুটে আসবো। এটি খুব সাবধানে রেখো, হারিয়ে ফেলো না যেন। আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই বাঁশীটী তোমার কাছেই থাকবে। তারপর আমি যখন চাইব, তখন ফিরিয়ে দিও। এই বলে ঈগল খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেল।

ঈগল চলে যেতেই যদু উঠে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই ঈগল এক ঠোঙা খাবার মুখে কোরে এসে হাজির হোলো। খাবারের ঠোঙাটা যদুর সামনে রেখে সে বল্লে—নাও এবার খেতে বোসো।

যদু বল্লে—এস ভাই দুজনেই খাওয়া যাক্। ঈগল বল্লে—আরে আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, আমি খেয়ে এসেছি। শুধু তোমার খাবারটা নিয়ে এলুম। যদুর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। লুচী তরকারী ও নানা রকমের মিষ্টি সে বেশ পেট ভরে খেলে। খাওয়া হয়ে গেলে ঈগল যদুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে যে ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল সেইখান থেকে জল খাইয়ে আনলে। তারপর তারা দুজনে সেই পাহাড়ের ওপর একটু বিশ্রাম কোরে, আবার বেরিয়ে পড়লো।

উড়্তে উড়্তে তারা কত মুল্লুক ছাড়িয়ে, শেষে সন্ধ্যের সময় একটা সরাইখানার কাছে এসে পৌঁছলো। যদুকে সেইখানে নামিয়ে দিয়ে ঈগল আবার একবার গা ঝাড়া

দিলে। এবার তার পালকের ভেতর থেকে কতগুলো টাকা ঝন্ ঝন্ শব্দে মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। টাকাগুলো যদুকে কুড়িয়ে নিতে বলে সে বল্লে—আজকের রাতটা ঐ সরাইখানায় বিশ্রাম কর। খাওয়া ও থাকার জন্য যা টাকা লাগে এই টাকা থেকে দিও। আমি এই সামনের গাছটীর ওপর শুয়ে থাকবো। তোমার কোন ভয় নেই। আর বাঁশীটী তো তোমার কাছেই আছে। বিপদে পড়লেই বাজিও, আমি তখনি ছুটে আসবো। আর দেখ একটী বিষয়ে তোমায় খুব সাবধান থাকতে হবে। রাত্রি বাসের জন্যে সরাইখানায় অনেক লোক আসে। তোমাকে দেখলেই তাদের মধ্যে অনেকে তোমায় অনেক রকম প্রশ্ন করবে। কিন্তু সাবধান আমাদের এই সব ব্যাপার তাদের কাছে যেন কিছু ফাঁস কোরে ফেলো না। আমরা কোথা থেকে আসছি আর কোথায়ই বা যাবো, তারা যেন একথা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কারণ কথাটা সকলের মধ্যে জানাজানি হোয়ে গেলে এ খবর সবজান্তার কছে পৌঁছতে বেশীক্ষণ লাগবে না। এসব কথা জানতে পেলেই সে সাবধান হোয়ে যাবে। তাহলে আর সহজে তোমার ছেলেটীকে তার কবল থেকে উদ্ধার করতে পারা যাবে না। তবে আমাদের বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। কারণ এই সব লোক সেখানে গিয়ে পৌঁছবার অনেক আগে আমারা গিয়ে সেখানে পৌছবো। তবুও সাবধান থাকা ভাল, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। হ্যাঁ আর একটী কথা দেখ—সরাইখানায় লোকজন ঘুম থেকে ওঠবার আগেই আমাদের এখান থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়তে হবে, সেইজন্য খুব ভোরে তোমায় ঘুম থেকে উঠতে হবে। বাড়ীর বাঁদিকে ঐ যে ঝোপটী দেখছো, আমি ঐ ঝোপটীর আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। তুমি ঘুম থেকে উঠে বরাবর সিধে ঐখানে চলে যেও। দেখো উঠে আসবার সময় যেন কোন রকম শব্দ টব্দ কোরোনা, খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসবে। তা না হোলে ঐ সব লোকজন টের পেয়ে যাবে। এই বলে ঈগল উড়ে গিয়ে সেই গাছটীর ওপর বসলো। যদু ও আস্তে আস্তে সরাইখানার দরজায় গিয়ে হাজির হোলো।

যদু সরাইখানায় দরজার কাছে যেতেই সরাইওয়ালা এসে তাকে অভ্যর্থনা কোরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালে; বসিয়ে সে তাকে জিজ্ঞেস করলে—বাবু খাবার দরকার হবে কি?

যদু বল্লে—হ্যাঁ।

তখন সেই সরাইওয়ালা যদুকে সঙ্গে কোরে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। এ ঘরটী বেশ বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে খানচারেক টেবিল পাতা ও এক একটী টেবিলের চারদিকে চারখানা কোরে চেয়ার বসানো আছে। প্রত্যেক টেবিলে চারজন কোরে লোক খেতে বসে গেছে। ঘরের মধ্যে ভয়ানক সোর গোল চলেছে। হাসি গল্পের অন্ত নেই। সরাইওয়ালা যদুকে সঙ্গে কোরে ঘরের মধ্যে ঢুকুতেই মিনিট খানেকের জন্য সব নিস্তব্ধ হোয়ে গেল। সবাই একবার যদুর দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর—আবার যে যার কাজে মন দিলে। ঘরটী আবার তেমনি জম-জমাটী হোয়ে উঠলো। একখানা টেবিল একেবারে খালি পড়েছিল, সরাইওয়ালা যদুকে সেইখানে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তার জন্য কি কি খাবার আনতে হবে। যদুতো খাবারের নাম টাম অত কিছু জানে না তাই সে বুদ্ধি কোরে বল্লে—আরে বাপু তোমাদের এখানে সব চেয়ে ভাল খাবার যা তাই নিয়ে এসো না। সরাইওয়ালা মনে মনে ভাবলে খুব পয়সা-ওয়ালা—লোক নিশ্চয়ই। সে যদুকে এক সেলাম ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সরাইওয়ালা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেই একজন লোক ভাল ভাল খাবার এনে টেবিলের ওপর যদুর সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল। যদুর খুব খিদে পেয়েছিল। সে ঐসব খাবার বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেলে। খাওয়া দাওয়ার পর সরাইওয়ালা এসে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

এ ঘরটীও বেশ বড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট খাট পাড়া, আর সেই সব খাটের ওপর দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানাও পাড়া আছে। জন কয়েক এরিমধ্যে এসে গোটাকয়েক খাট দখল কোরে কেউবা দিব্যি আরামে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে, আবার কেউ কেউ বা জেগে বসে একজন আর একজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সরাইওয়ালা যদুকে সঙ্গে কোরে ঘরে ঢুকতেই মিনিট কয়েকের—জন্য সব চুপচাপ হোয়ে গেল। সবাই একবার যদুর দিকে চেয়ে দেখলে। সামনের দিকেই একটা খাট খালি ছিল, সেইটেতেই যদুর শোবার বাবস্থা কোরে দিয়ে সরাইওয়ালা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সরাইওয়ালা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে নানারকম প্রশ্নে সবাই যদুকে অস্থির কোরে তুল্লে। যদুও সংক্ষেপে

সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানার মধ্যে ঢুকে ঘুমোবার ভান কোরে চোখ বুজিয়ে পড়ে রইলো। কারণ বেশী কথা কওয়া ঠিক নয়, আবার কি বলতে কি বলে ফেলবে। যদু ঘুমিয়ে পড়েছে এই ভেবে, তারাও আর তাকে বিরক্ত করলে না।

খুব ভোরেই যদুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ চেয়ে দেখলে সবাই বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তখন সে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সেই ঝোপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল। ঈগল সেই ঝোপের—আড়ালেই যদুর জন্য অপেক্ষা করছিল। যদুকে দেখতে পেয়ে সে বল্লে—তাড়াতাড়ি আমার পিঠের ওপর উঠে বস। যদু ঈগলের পিঠের ওপর উঠে বসতেই ঈগল আবার উড়তে আরম্ভ করলে।

এমনি কোরে রোজই দিনের বেলায় যদুকে কোন একটী নির্জ্জন জায়গায় বসিয়ে রেখে ঈগলই তার জন্য খাবার নিয়ে আসে, আবার সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই সেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে যদুকে সে কোন একটা সরাই খানায় নামিয়ে দেয়। এমনি কোরে ঘুরে ঘুরে তাকে চোদ্দদিনের দিন সন্ধ্যার সময় ঈগল যদুকে পিঠে কোরে একটী মস্ত বড় গাছের ওপর নেমে যদুকে বল্লে—ভাই এবার তুমি আমার পিঠের ওপর থেকে নেমে গাছের একটী ডালের উপর বেশ ভাল কোরে বোসো। কারণ এখন আমাদের দুজনকে রাত বারটা পর্য্যন্ত এই গাছের ওপরেই বসে থাকতে হবে। এইবার আমরা সবজান্তার দেশে এসে পৌঁচেচি। ঐ দেখ তার বাড়ী—এই বলে ঈগল একটু দূরে রাজ প্রাসাদের মত মস্ত একটা বাড়ী যদুকে দেখিয়ে দিলে। ঈগলের পিঠের ওপর থেকে নেমে গাছের একটী ডালের ওপর বসে যদু হাঁ কোরে সেই বাড়ীটীর দিকে চেয়ে রইলো। রাজ প্রাসাদের দেউড়ীতেই মোটা লাঠি হাতে নিয়ে দরোয়ানেরা সব বসে আছে। বাড়ীটীর মধ্যে খুব আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু লোকজন বড় কম। যদু সেই বাড়ীটীর—দিকে চেয়ে চুপটি কোরে বসে কত কথাই ভাবতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

ঊষা

[কুমারী শিবানী দে]

পরিয়ে দিল রাঙা রবি

ঊষার ভালে টিপ্‌টি !

জ্বল জ্বলিয়ে নিভে গেল

গগন তলে দীপটি ॥

ছায়া আলোর আঁচল-খানি

বাতুল বাতাস নিল টানি ;

স্বপনে সে

গন্ধে হেসে,

ঘুম ভাঙানো গান গেয়ে

ভরিয়ে গেল নীপ্‌টি—

ভরিয়ে দিল রাঙা রবি

ঊষার ভালে টীপ্‌টি !!

বনের পাখী

অনেক—অনেক বছর আগেকার কথা। চীনদেশে মস্তবড় এক রাজা ছিলেন। তাঁর টাকা-কড়ি লোকজন গাড়ি ঘোড়া ছিল এত যে তার সীমা সংখ্যা ছিল না, পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন রাজারই তত বেশী ছিল না। রাজার প্রাসাদের চুড়োগুলি ছিল সব সোনার, কোনটা বা রূপো দিয়ে মোড়া। রাজবাড়ীর পিছনের দিকে ছিল এক অতিপ্রকাণ্ড বাগান; আর সে বনে ছিল পৃথিবীর সেরা সেরা সব ফুল আর ফলের গাছ; আর ছিল পৃথিবীর নানান দেশের নানান রকমের পাখী। রাজা থাকতেন সেই প্রকাণ্ড বাড়ীতে, মনে ছিল তাঁর বিপুল আনন্দ।

সে রাজ্যের সীমানার ধারে ছিল এক মস্তবড় বন; সেই বনের মধ্যে দিয়ে রোজ সকালবেলা জেলেরা নদীতে মাছ ধরবার জন্যে যাওয়া আসা করত। কাঠুরেরা আসত দুপুর বেলা সেই বনে কাঠ কুড়োতে; আর আসত কখনো কখনো গরীবের মেয়েরা ফল কুড়োবার জন্যে। জেলেরা সন্ধ্যা বেলা সেই বনের পথ দিয়ে শুক্‌নো পাতা সরিয়ে বাড়ী ফিরত। সারা দিনের মেহনতে তাদের শরীর মন যেন নুয়ে পড়ত; তখন সেই সন্ধ্যার সূর্য্যের আলো যখন নিবু নিবু, বনের ভিতর থেকে একটা পাখী ডাকত; তার ডাকে কি ছিল, ঘর মুখো জেলের দল তা ঠিক বুঝতে পারত না; কিন্তু তারা কানপেতে শুনত, আর অবাক হয়ে পথ চলত, এমন সুন্দর মিষ্টি সুর তারা কখনো শোনে নি জীবনে। মেহনতের কথা তারা ভুলে যেত; গান শুনতে শুনতে কখন চমকে চেয়ে দেখত তারা বনের পথ কখন্ ছাড়িয়ে এসেছে।

দেখতে দেখতে এই কথাটা রাজ্যের সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল যে, রাজ্যের সীমানায় যে অতবড় বনটা আছে, তাতে এমন একটি সুন্দর পাখী আছে যার চাইতে মিষ্টি গলার স্বর রাজার রাজ্যেতে নেই, পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ক্রমে ক্রমে কথাটা রাজার কানে গিয়ে পৌঁছল। একদিন রাজা রাজসভায় মন্ত্রী সেনাপতি ও আর আর সব লোক-লস্করকে ডেকে বল্লেন, আমি সে পাখীর গান শুনতে চাই। তাকে ধরে আমার রাজপ্রাসাদে নিয়ে এস।

মন্ত্রীদের ত মাথা গুলিয়ে গেল; কোথায় কি পাখী, এখন কি করে তাকে আনা যায়।

অনেক পরামর্শ করে একদিন তারা দলবল নিয়ে সেই বনে গিয়ে হাজির হল। তখন

বিকেল, সবুজ গাছের পাতার ফাঁকে সূর্য্যের লাল আলো এসে পড়েছে। নানা রকমের পাখী সব সাঁঝের বেলায় ঘরে ফিরে আসছে। মন্ত্রীদের মহা মুশকিল, কেমন করে সে পাখীর স্বর চিনবে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে একটা জেলে মাছ ধরে ঘরে ফিরে আসছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্ল, সে পাখী ডাকলেই তাকে চেনা যাবে। সে ডাক এমনি আশ্চর্য্য।

এমন সময় বনের মধ্য থেকে কে ডেকে উঠল। মন্ত্রীরা পাখী ধরবার কথা ভুলে গিয়ে এক মনে শুনতে লাগল। জীবনে তারা এরকম স্বর সত্যিই আর কোন দিন শোনে নি, কি চমৎকার!

পাখীটা তখন উড়ে এসে তাদের সুমুখে একটা গাছের ডালে বসল। রাজার লোকজন অবাক হয়ে সবাই পাখীকে প্রণাম করল।

প্রধান মন্ত্রী তখন ধীরে ধীরে বল্লে, হে পাখী, তোমার স্বর-শুনে আমরা ভারী খুশী হয়েছি। আমাদের মহারাজ তোমাকে চান। তাঁর প্রাসাদে পৃথিবীর সব চাহিতে ভাল জিনিষ প্রায় সবই আছে। তোমাকেও তাঁর চাই।

পাখীটা আর একবার ডেকে উঠে জবাব দিলে, আমি কেমন করে তোমাদের মহারাজের প্রাসাদে গিয়ে থাকব? আমার মনে হচ্ছে সেখানে গেলে আমার স্বর বদলে যাবে! আমার গান এই বনে সবুজের রাজ্যেই শুনতে ভাল লাগে।

লোকজন সব অনেক কাকুতিমিনতি করতে লাগল। তখন পাখীর মনে দয়া হল, সে এসে ধরা দিল। তারা মহা-আনন্দে পাখীকে নিয়ে গিয়ে রাজসভায় পৌঁছল। রাজা দেশের বড় বড় মাতব্বরদের নেমন্তন্ন করে এসে পাখীর গান শুনতে বসলেন।

পাখীর পায়ে সোনার শিকল পড়েছে। তাকে একটি আনকোরা নতুন সোনার দাঁড়ে বেধে রাখা হয়েছে। একসভা লোকের সাম্‌নে পাখী গাইতে সুরু করলে। সভাসুদ্ধ-লোক সে গানে একেবারে মশগুল। সকলের মুখেই এক কথা, এ রাজ্যে এ পাখীর চাইতে আশ্চর্য্য-জিনিষ আর কিছুই নেই।

পাখী এখন সোনার দাঁড়ে রাজার শোবার ঘরেই থাকে। দিনরাত লোকজন তার তদারক করতে লাগল। পাখীর কিন্তু তাতে পেট ভরে না, মন লাগে না। তার মনে পড়ে তখন তার সেই সবুজ পাতায় ঘেরা বনের কথা; নদীর ধারে সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য

পাটে বসত, বনের মধ্যেকার পথ দিয়ে জেলেরা ঘরে ফিরত; সে তাদের মেহনত দূর করবার জন্যে আপনার মনে গান গাইত। এখন তার এই রাজপ্রাসাদে হাঁপ ধরে আসে। সপ্তাহে তার একটি দিন ছুটি। সেদিন রাজার এক চাকর তার পায়ে সোনার শিকল পরিয়ে তাকে বনে বেড়াতে নিয়ে যায়। পাখীর মন দুঃখে ভরে ওঠে। সে দেখে তার মাথার উপর দিয়ে পাখীরা দলে দলে আপনার মনে সবুজ বনের দিকে উড়ে চলেছে। অমন করে উড়ে যাবার জন্যে তার মন কেঁদে ওঠে; কিন্তু তার পায়ে যে রাজার দেওয়া সোণার শিকল রয়েছে।

এমনি করে অনেক দিন পাখীর কেটে গেল। একদিন হঠাৎ রাজসভায় ভারী গোলমাল পড়ে গেল। জাপান থেকে এক কারিকর একটা যন্ত্রের পাখী পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং তার তলায় এক টুক্‌রো কাগজে লিখে দিয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সুন্দর মিষ্টি এই পাখীর গান।

রাজসভায় হৈ চৈ পড়ে গেল। রাজ্যের মান্যগণ্য লোকদের ডেকে পাঠান হল। এই দুই পাখীর একসঙ্গে গান শুনতে হবে। রাজ্যের আর আর সব লোকও এসে জমায়েৎ হল।

মস্ত সভা বসেছে, নানা লোক নানা পোষাকে সভাঘর আলো করে বসেছে, মাঝখানে উঁচু আসনে মহারাজ বসে, তাঁর সুমুখেই বনের পাখী আর যন্ত্রের পাখীকে রাখা হয়েছে। প্রথমে গাইল বনের পাখী। দু'তিন বার গাইবার পর সে ক্লান্ত হয়ে ঘেমে গেল। তখন যন্ত্র টিপে যন্ত্রের পাখীর গান শোনা হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রের পাখী গান গেয়ে চল্ল। সবাই অবাক হয়ে সেই নতুন সুর অনেকক্ষণ ধরে শুনে বলে উঠল, সত্যিই এই যন্ত্রের পাখী বনের পাখীর চাইতে ঢের ভাল। বনের পাখীর কখন্ খেয়াল হবে—একটু আধটু গাইবে। এ কেমন যখন ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা গাইবে—এ পাখীই ভাল।

রাজা খুসী হয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা আর একবার বনের পাখীর গান শুনে দেখা যাক।

কিন্তু এদিকে হয়েছে কি—সকলে যখন যন্ত্রের পাখীর গান শুনতে ব্যস্ত, সেই

ফাঁকে বনের পাখী শিকল কেটে উড়ে গেছে, কেউ কেউ একটু দুঃখু জানালে বটে কিন্তু যন্ত্রের পাখীকে পেয়ে তারা বনের পাখীর অভাবটা একদম ভুলেই গেল।

তখন থেকে রাজ্যশুদ্ধ সবাই দিনরাত রাজবাড়ীতে যন্ত্রের পাখীর গান শোনে। ক্রমে বনের পাখীর কথা তারা সকলেই ভুলে গেল।

রাজার শোবার ঘরে সেই যন্ত্র বাজে। অনেক দিন এমনি চলে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজা আপনার ঘরে শুয়ে যন্ত্রের পাখীর গান শুনছিলেন, হঠাৎ কি একটা শব্দ হয়ে যন্ত্রের পাখীর গান থেমে গেল। রাজা উঠে গিয়ে দেখলেন, পাখী আর গায় না। রাজ্যের যত বড় বড় কারিকর সব এল, কেউ সেই যন্ত্রের পাখীর ভিতর থেকে সে সুর আর বার করতে পারলে না। অনেক মেরামত হল কিন্তু সবই পণ্ড হয়ে গেল।

এমনি করে অনেক দিন যায়। রাজার মন দুঃখে ভরে উঠল। বনের পাখীর গানের কথা তাঁর মনে হল আর গানের অভাবে তাঁর সমস্ত মন মুস্‌ড়ে পড়তে লাগল। একদিন রাজা বিছানা নিলেন। সারা রাজ্য জুড়ে একটা দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে এল।

সাঁঝের বেলা রাজা আপনার বিছানায় শুয়ে মরণ যাতনায় চীৎকার করছিলেন, ওগো গান গাও, একটা মিষ্টি সুর!

অনেক তোড় জোড় করে দম দিয়ে যন্ত্রের পাখীকে দিয়ে গান গাওয়ান হল। রাজা রেগে বলে উঠলেন, ভেঙে ফেল ওই যন্ত্রের পাখীটাকে! কি এক ঘেয়ে বিশ্রী প্রাণহীন আওয়াজ ওর! চাইনে, চাইনে ওকে, দূর করে দাও এই মুহূর্ত্তে।

সারারাত রাজা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাত্রে দেখেন তাঁর বিছানার কাছে কে এক বিকট পুরুষ এসে দাঁড়াল। কী ভয়ানক তার চেহারা। হাতে তার একটা সোনার কাটি। রাজা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

সেই ভয়ানক লোকটি বলে উঠল, আমার নাম মরণ। এই কাটিটি ছোঁয়ালেই তুমি মরে যাবে।

রাজা ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন, ওগো আমার শেষ সাধ, একটা গান, সেই বনের পাখীর একটা তেমনি মিষ্টি সুর!

হঠাৎ জানালা থেকে সেই বহুদিন আগেকার স্বর শোনা গেল। রাজা চমকে উঠলেন, মনে হল তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা যেন কমে এল। রাজা মাথার দিকের সেই ভয়ানক পুরুষের দিকে চাইলেন, দেখলেন, সেও তাঁরই মত এক মনে গান শুনছে কান খাড়া করে।

বনের পাখী সহসা গান থামাল। সেই ভয়ানক পুরুষটি মুগ্ধ হয়ে তখন বলে উঠল, আর একটা গান গাও না পাখী!

বনের পাখী বলে উঠল, আমি গাইব, কিন্তু বল আমি যা চাইব, তুমি তা দেবে?

মৃত্যু বল্লে, তুমি গাও, যা চাইবে, তাই দেব।

পাখী আবার গান ধরল। গানের শেষে বনের পাখী বল্লে, তোমার হাতের ওই সোণার কাটি রাজার মাথায় ছুঁইয়ো না; আর যে পথে এসে ছিলে সেই পথে ফিরে যাও।

মৃত্যু মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেল।

রাজার দুচোখ জলে ভরে এল, হাত জোড় করে রাজা বল্লেন, আমি তোমার অপমান করেছিলুম। আমার তুমি ক্ষমা কর। আমায় তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে, কি চাও তুমি বল।

বনের পাখী জবাব দিল, পুরস্কার চাই নে আমি। তোমার চোখে জল দেখেছি, এই আমার সব চাইতে বড় পুরস্কার।

তবে বল তুমি আমার এই বাগানে থাকবে?

বনের পাখী বল্লে, তা আমি পারিনে। আমার সবুজ বনে ফিরে যেতেই হবে। সেখানে আমার বন্ধুরা, ফুল ফল, গাছপালা, লতাপাতা আমার দিকে চেয়ে আছে। সেখানে বনের ধার দিয়ে জেলেরা, কাঠুরিয়ারা যখন বাড়ী ফিরবে—কে তাদের ক্লান্তি দূর করবে? আমি বনে ফিরে চল্লুম, রাজা, কিন্তু যখনি তোমার আমাকে দরকার হবে, ডাকলেই আমি চলে আসব। রাজপ্রাসাদের ধনদৌলতে আমার লোভ নেই।

এই বলে বনের পাখী বনেই উড়ে গেল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। মন্ত্রীরা এসে দেখলে রাজার অসুখ আর নেই, তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।*

---

* চীনা গল্পের অনুসরণে।

শান্তিদেবী।

(১)

[শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত]

ভীলরাজার স্বাধীনরাজ্য-চারিদিকে তার পাহাড় পর্ব্বতের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। তারপর ভীষণ অরণ্য-শাল-তাল-তিন্তিড়ী গাঁ ঘেঁসাঘেঁসি করে অন্য কারো প্রবেশের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে তার স্বচ্ছসলিলা খরস্রোতা নদী, মন্দাকিনীর মত তার জল পবিত্র সুপেয়।

সবুজ ঘাসে ঢাকা সারা রাজ্যখানি যেন সরলপ্রাণ ভীলদের সদাই অভিনন্দন কর্ব্বার জন্যে গাল্‌চের মতো পাতা রয়েছ। গাছে গাছে ফল, মাঠভরা ধান, ভীলরাজার প্রজাদের সুখে রেছেছে। ছায়া ঘেরা কুঞ্জে পাখীর সুমধুর সঙ্গীতে চিরবসন্ত সেখানে জেগে রয়েছে।

কারো মনে হিংসা নেই-সবাই স্বাধীন। সেখানে সিংহ-শশকে মনের কথা কয়, বৃক্ষপত্রে কোলাকুলি করে আলিঙ্গন দেয়। শৃগাল-শার্দ্দুলে মিলেমিশে ঘরকন্না করে। ভীলরাজার সুশাসনে সেখানে শুধু বিমল আনন্দ, পবিত্র ভালোবাসা, সবার প্রাণে স্বাধীনভাব।

ভীলরাজের একটী মেয়ে। নাম—শান্তি। রূপে-সৌন্দর্য্যে সে এক যেন স্বরগের দেবী। শান্তি যখন হাসে তখন গাছে পাতার শিহরণ জেগে ওঠে, যখন রাগ করে তখন প্রকৃতি থমথমে হয়ে যায়, যখন অভিমান করে তখন বিজলী হেনে যায়, যখন কাঁদে তখন মেঘের বুক ব'য়ে অঝোরঝোরে বারি ঝরে পড়ে।

শান্তি যখন ছোট ছিল তখন ভীলেদের ছেলের সঙ্গে খেলা করে কেটেছে। নদীর বাঁকে, পাহাড়ের তলায়, ঝরণার ধারে তাদের সে খেলাধূলার কত স্মৃতি আজও যেন জেগে থেকে শান্তিকে ঠিক তেম্‌নি করে ডাক্‌ছে—'আয় ভাই! আয় ভাই!'

ভীলরাজা শান্তিকে বুঝিয়ে বলে—"আর বাইরে খেলা কত্তে যাসনি শান্তি, ওপারের লোকেরা এখানে আসতে আরম্ভ করেছে কখন কি বিপদ ঘটবে—তার চেয়ে তুই ঘরে

বসে খেলা কর, ময়ুর এনে দেব হাঁস এনে দেব, নদীথেকে কত রকম রকম পাথর এনে দেব। ঘরে থাক্ শান্তি আর বাইরে যাসনি"।

শান্তি ঘাড় নেড়ে জানায় যে, সে আর বাইরে যাবেনা। কিন্তু যেম্‌নি ভীলরাজ নিজের কাজে চলে যায়, শান্তি অম্‌নি এসে মা-র গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে মা-ওপারের লোকেরা কেমন দেখতে ?"

মা-আদর করে একটী চুমো খেয়ে বলেন—"খুব সোন্দর দেখতে। কিন্তু তাদের মনের ভেতর বড় ময়লারে। তারা প্রাণী মেরে আমোদ পায়, জীবের কষ্ট দেখ্‌লে সুখী হয়।"

শান্তি মাকে আরো জড়িয়ে ধরে বলে—"মা তাদের সে মনের-ময়লা কি কেউ মুছে দিতে পারে না ?"

মা-গম্ভীর হয়ে বলেন—"না—তাদের দেশে যে তেমন কেউ নেই, তাদের সবাই যে ঐ একই রকম।"

শান্তি মার বুকের ওপর শুয়ে চুপ করে সব শোনে আর মনে মনে ভাবে—'পারি যদি একদিন আমিই তাদের এ মনের-ময়লা মুছে দেব'। মুখে কিছু বলেনা। মা-র কোল থেকে উঠে চঞ্চলার মতো ছুটে পালিয়ে যায়। বাইরের মুক্তবাতাসে, কালো-চুলের গুচ্ছ উড়িয়ে দিয়ে, ছুটোছুটী করে খেলা করে, আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—'ওপারের মানুষ' আসছে কি-না ? শান্তিকে মুক্ত পেয়ে পশুরাজ এসে লুটীয়ে পড়ে প্রণাম করে। শাখায় শাখায় পাখীরা ভিড় করে বসে অনিমিখে দেখে দেখেও তৃপ্তি পায়না।

ভীলরাজ ভাবে—"শান্তির বয়েস হয়েছে, আর না।

(২)

ওপারের রাজা—সুবিশাল তাঁর রাজ্য। অস্ত্রশস্ত্রে তাঁর রাজধানী সদাই সজ্জিত। বড় আদরের একটী মাত্র পুত্র। নাম-কুমার। হাসেন-খেলেন, দুলালের মত বেড়িয়ে বেড়ান-এই ভাবে দিন কেটে যায়।

সেদিন কুমার এসে বল্লেন—"বাবা আমি শিকারে যাব।"

ওপারের রাজার সিংহাসন টলমল করে উঠ্‌লো। পুত্রের হৃদয়ে বীরভাবের উদ্রেক দেখে, রাজা গর্ব্ব অনুভব কল্লেন। বল্লেন—"বেশ্‌! বেশ! অনুমতি দিচ্ছি, আয়োজন করোগে।"

অম্‌নি গ্রামে গ্রামে নগরীতে নগরীতে সাজ সাজ্‌ রব পড়ে গেলো। রাজপুত্র শিকারে যাবেন' বাল্যসখা কোটালপুত্র; মন্ত্রীপুত্র প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে শিকারে যাবার সহচর হলেন। সারা নগরীতে উন্মাদরবে বিজয় রণভেরী গর্জ্জন করে উঠলো।

তারপর একদিন শুভমুহুর্ত্তে রাজপুত্র সখা-সাথী নিয়ে শিকারে বেরুলেন। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় সারা নগরী মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো। রাজ্যের প্রতি দুয়ারে দুয়ারে সীমন্তিনীর মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠ্‌লো।

সখা মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞাসা কল্লেন "বন্ধু! কোন্‌ অরণ্যে যাবার অভিপ্রায় করেছ?"

রাজপুত্র বল্লেন—"যেখানে সুবিধে হবে, সেই অরণ্যই আমাদের শিকারের স্থান।"

কোটালপুত্র, সদাগর পুত্র সমস্বরে গর্ব্বভরে বল্লেন—"নিশ্চয়ই! যেখানে খুশী হবে, যে অরণ্যে হিংস্রপ্রাণীর প্রাদুর্ভাব দেখ্‌বো, সেখানেই শীকার কর্ব্বো, এতো আর, আর-কারো রাজ্য নয়, যে নতুন করে আবার অনুমতি নিতে হবে।"

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন "তা ঠিক! তবে আমি বল্‌ছিলুম কি! অনেক অনেকবার বাবার মুখে শুনেছি যে দক্ষিণের ঐ বন-পাহাড় পেরিয়ে গেলে ভীলরাজার ডেরায় গিয়ে পৌঁছুতে পার্ব্বো শুনেছি নাকি সেখান হিংস্র প্রাণীর অভাব নেই।"

রাজপুত্র বল্লেন—"ঠিক! ঠিক! সেই উত্তমযুক্তি। চালাও দক্ষিণদিকে! অম্‌নি চারিদিক থেকে অশ্বের পিঠে কশাঘাত পড়তে লাগলো। রথ চক্রের ঘর্ঘর শব্দে মেদিনী কম্পিত হয়ে উঠ্‌লো। ধূলিময় ধরাপৃষ্ঠ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন কুরঙ্গমাতঙ্গ উন্মাদরবে শাখা-পত্রে বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট করে দ্বিগুনবেগে অগ্রসর হতে লাগ্‌লো। রাজপুরীর কোলাহল নিস্তব্ধ বীরের দাপটে সারা নগরী ঝঙ্কৃত।

এইভাবে তিনদিন অবিশ্রাম অগ্রসর হওয়ার পর রাজপুত্র সৈন্য-সামন্ত বন্ধুবান্ধবসহ ভীলরাজার রাজ্য-সীমান্তে এসে পৌছুলেন। বিজয়ভেরীর ঘন্‌-ঘন্‌ শব্দ ভীলরাজার কাণে গিয়ে বাজ্‌লো অমনি ভীলরাজের আদেশে লক্ষ্য-লক্ষ্য ভীল পাহাড়, বৃক্ষ-শাখা

হ'তে তার প্রতিধ্বনি করে সমর ঘোষণা কল্লে রাজপুত্র সাহসে ভর করে সৈন্য-সখা-সমবি-ব্যহারে ভীলরাজ্যে প্রবেশ করে তার চারিদিকে ঘেরাও করে তাঁবু গাড়লেন।

রাজপুত্রের সৈন্য সামন্ত যখন শিকারে উন্মত্ত—ভীলরাজার রাজ্যে তখন অস্ত্রশস্ত্রে শান্ দেওয়ার ধূম পড়ে গেছে। আর শান্তি তখন আগ্রহ দমন কত্তে না পেরে ওপারের মানুষ কেমন দেখ্‌তে বেরিয়েছে। খানিক এদিক ওদিক ঘুরে রাজপুত্রের তাঁবুর কাছে এসে দেখে নিজে-রাজপুত্র আহত পশুদের সব তত্ত্বাবধান কচ্ছেন। শান্তি একদৃষ্টে রাজপুত্রের মুখের দিকে স্থির হয়ে দেখ্‌ছে—। কি সুন্দর দেখ্‌তে ওপরে যার এমন সরলতা, তার ভেতরে আবার এমন কাঠিন্য কি করে থাকতে পারে শান্তি তা ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্ছেনা। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজপুত্রের সুন্দর মুখখানি দেখছে।

রাজপুত্র শিকারের সাফল্যে আত্মহারা হয়েছিলেন। হঠাৎ একটা বন্য-হরিণী তাড়া খেয়ে ঝা করে পাশ দিয়ে পালিয়ে গেলো। রাজপুত্র তীর ধনুক বাগিয়ে নিয়ে হরিণীর দিকে লক্ষ্য কত্তে যাবেন হঠাৎ নজরে পড়ে গেলো—শান্তির দিকে। হাতের ধনুক হাতেই রইলো ধীরে ধীরে তীরটা মাটীতে পড়ে গেলো। এক দৃষ্টে তিনি শান্তির সুন্দর পবিত্রভরা মুখখানার দিকে চেয়ে সব ভুলে গেলেন। শান্তির জলভরা চোখ দুটো তাঁর শিকারের বাসনা কোথায় ধুয়ে নিয়ে গেলো।

শান্তি তন্ময় হয়ে 'ওপারের মানুষগুলোর কথা ভাবছিলো। হঠাৎ রাজপুত্রের সঙ্গে চার চক্ষুর দৃষ্টি পড়ায় মুখ নামিয়ে নিলে। তারপর ভীলরাজার শাসন তার মনে উদয় হতেই আর দেরী না করে নিজের বাড়ীর দিকে ছুট্‌লো। রাজপুত্র কিন্তু তেমনি নির্ব্বাক, নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ......।

শান্তি ছুটে চলেছে—মন্ত্রীপুত্র, সদাগর পুত্র, কোটাল পুত্র তিনজনেই দেখতে পেয়ে যুগপৎ বিস্মিত হ'লেন। তিনজনেই তিনজনের মুখপানে চাইলেন। শান্তি ছুট্‌তে ছুট্‌তে ভীলরাজার কাছে ফিরে গেল। মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র, নিজের নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন।

(৪)

রাজপুত্র বল্লেন—"শিকারে আর দরকার নেই—ফিরে চলো।"

সখা—মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, সদাগরপুত্র সমস্বরে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস কল্লেন—
ন? কেন! কি হয়েছে! কি হয়েছে?"

রাজপুত্র গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"কিছু হয়নি—মন ভালো নয়—"।

সখা তিনজন একবার মুখ চাওয়া চাওই কল্লেন—রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সব বুঝ্‌লেন। বল্লেন—"তার আর কি। ভীলরাজকে বন্দী করে আজি শান্তিকে এনে দেবো।"

রাজপুত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে বল্লেন "পার্ব্বে"!

নিশ্চয়ই! আজই! বলেই তিনজন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজেদের অভি-প্রায় সৈন্য-সামন্তগণকে জানিয়ে সকলকে প্রস্তুত হ'তে বল্লেন।

ভীলরাজ বিপদ ঘনীভূত বুঝে ভীলসর্দ্দারকে সতর্ক করে দিলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

সাঁঝের আঁধার তখন ঘনিয়ে আস্‌ছে—রাজপুত্রের সখা-সৈন্য-সামন্ত ভীলরাজ্যে প্রবেশ করে যুদ্ধ ঘোষণা কল্লে! অম্‌নি ভীলসর্দ্দার হুঙ্কার করে উঠলো। দেখ্‌তে দেখতে বৃক্ষশাখা পর্ব্বতগাত্র, অরণ্য, গুহা থেকে দলে দলে ভীল বেরিয়ে এসে ধনুকে টঙ্কার দিয়ে আক্রমণ কল্লে। কোটী কোটী জোনাকির মিট্‌মিটে আলোয় সারা অরণ্য জ্যোছনাময় করে তুলে। তারি মাঝে উভয়পক্ষের ভীষণযুদ্ধ।········ চারিদিকে 'মার্ মার্' শব্দ, আহতের আর্ত্তনাদ—বৃক্ষপত্র থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। জীবজন্তু ভয়ে সব সন্ত্রস্ত।

এই ভাবে মারামারি-কাটাকাটি শেষে ভোরের আলো যখন পূবের মুখে লাল হ'য়ে ফুটে উঠছিলো তখন রাজপুত্র সখা সাথীসহ ভীলরাজের বন্দী হলেন। শান্তি তখনো এর কিছুই টের পাইনি।

(৫)

ভীলরাজ বিচার করে বন্দীদের প্রতি হুকুম দিলেন 'প্রাণদণ্ড'। সূর্য্যধ্বজা হাতে করে, সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সজল চোখে বল্লেন—"প্রভু! তোমার নিরালারাজ্যে কোনদিন হিংসা-দ্বেষ ক্রোধ বলে ত কোন জিনিষ ছিলনা, শুধু এ দুর্ব্বৃত্তেরা এসে তোমার রাজ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। তুমিই সাক্ষী—এরাই এই পাপ পথের অনুবর্ত্তক। তাই তোমার আইন পালন কত্তে আমি আজ এদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কল্লুম।"

ভীলরাজের আদেশ শ্রবণ করে জীবনের পরিণাম ভেবে বন্দীদের শির নত হ'য়ে গেল * * * শক্তিমন্দিরে নরবলির আয়োজন সমাপন হয়েছে। বন্দীদের স্নান করিয়ে নববল্কল পরিয়ে মন্দিরদুয়ারে হাজির করা হলো। মাঝখানে রাজপুত্র, তিনিও আজ এই পথের পথিক। ঘৃণায় লজ্জায় মুখে চোখে কালি পড়েছে—কিছুপরেই এ জীবনের অবসান।

মন্দিরদ্বার বন্ধ। পুজারী স্নান সেরে এলেই দ্বার খোলা হবে। আর সব প্রস্তুত ঘাতক রক্ততিলকে সজ্জিত হয়ে রয়েছে—হুকুমটুকুমাত্র বাকী!

পূজারী স্নান সেরে এলেন। মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হলো। সামনেই শক্তিদেবীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। বিশাল রক্ত-জিহ্বা বার করে ক্ষুৎপিপাসা জানাচ্ছেন। দেওয়াল গাত্রে গাত্রে রক্তমাখা খড়্গ ঝুলছে। দ্বার খোলামাত্রে চারিদিক থেকে ভীষণ রবে 'মা-মা' রব উঠ্‌লো। বন্দীদের প্রাণ একবার কেঁপে উঠলো। রাজপুত্র ভক্তিপূর্ণ মনে শক্তি দেবীকে নমস্কার করে স্থির হয়ে দাড়া়ল্লেন।

* * * পূজা-হোম সমাপন হয়েছে। পূজারী আদেশ দিলেন—"কাজ শেষ করো।"

ঘাতক বন্দীদের শির যূপকাষ্ঠে পরিয়ে খিল এটে দিলে। চারিদিক থেকে আবার ভয়ঙ্কর শব্দ উঠ্‌লো—মা-মা-মা!

ঘাতক খড়্গ তুলেছে অমনি কোথা থেকে আলুথালু বেশ, মুক্তকেশ, বিত্রস্তবসনা শান্তি এসে ডাক্‌লে—"বাবা! বাবা! একি!"

ঘাতকের অস্ত্র হাতেই রয়ে গেলো—শান্তির মুখের দিকে চেয়ে সব স্থির হয়ে দাড়া়লো।

ভীলরাজ উন্মাদিনীবেশে শান্তিকে এত লোকের মাঝে আসতে দেখে বল্লেন এখানে এলিমা কেন তুই!

শান্তির চোখে আগুন, কণ্ঠে বজ্র; ভীষণস্বরে বল্লে—"বাবা! বাবা! একি! এ কিসের আয়োজন?

স্থির কণ্ঠে ভীলরাজ বল্লেন—"নরবলি" তুই দেখতে পার্ব্বিনা, যা-মা-বাড়ী যা।"

শান্তি-ভীলরাজের পায়ে পড়ে মিনতি করে বল্লে—বাবা! বাবা! তোমার পায়ে ধরি এ আদেশ ফেরাও নয়ত আমায় বিদায় দাও!

ভীলরাজ শান্তিকে পা থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"সেকি মা, কোথায় যাবি তুই?

শান্তি দীপ্তকণ্ঠে বল্লে—যেখানে হত্যা হয় না, যেখানে হিংসা দ্বেষ নেই; সেখানেই যাবো বাবা! না হয় ফেরাও তোমার আদেশ, বন্দীদের মুক্তি দাও।"

আকাশ কড়্ কড়্ করে বেজে উঠ্‌লো। শান্তির উন্মাদিনীবেশ, অস্বাভাবিক থাকা আজ ভীলরাজও ভয় খেয়ে গেলেন। তাই সূর্য্যধ্বজা সাক্ষী করে শান্তির মুখ চেয়ে হুকুম ফিরিয়ে নিলেন। অমনি যুপকাষ্ঠ থেকে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হলো।

রাজপুত্র শান্তির দিকে চেয়ে দেখলেন, শান্তি রাজপুত্রের দিকে চেয়ে রইলোপ ভীলরাজ শান্তির অনুরাগ বুঝ্‌তে পাল্লেন। তাই শান্তির হাতখানি ধরে বন্দী রাজপুত্রের হাতে এনে বল্লেন—"রাজকুমার! আজ আমার রাজ্যে অভ্যাগত, তুমি, তাই আমার এই শান্তিকে দিয়ে আজ তোমায় অভিনন্দন কচ্ছি! নিয়ে যাও আমার শান্তিকে! আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার এই শান্তিকে সারা জগতে প্রতিষ্ঠা কত্তে পারো।

সরল প্রাণ ভীলরাজের প্রাণের পরিচয় পেয়ে আনন্দে রাজপুত্রের চোখ দিয়ে ঝর্ঝর্ করে জল পড়্‌তে লাগলো। তারপর শান্তিকে নিয়ে নিজরাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে ভীলরাজার কাছে বিদায় নিলেন।

রাজপুত্রের আর শীকার করা হলোনা—নিজরাজ্যে ফিরে এলেন মনভরা শান্তি নিয়ে।

— — ———

যাঁহাদের চারিটি ধাঁধাঁর উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—

শ্রীজ্যোতিঃকুমার গুপ্ত, বর্দ্ধমান ; শ্রীঅনিল কুমার রায়, উলপুর ; শ্রীসরোজ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শিবসুন্দরী দেবী, কুলচণ্ডা, শ্রীহীরেন্দ্র মোহন মজুমদার, ভবানীপুর ; শ্রীঅতুল চন্দ্র সেন, তেওতা ; নিপু, পতু, সুরু, গজু, বাটু, শুধু, হিমু, অনিল গুপ্ত, তেওতা ; শ্রীপান্নালাল সেন, শ্রীমতিলাল ঘোষ, শ্রীবিভূতি ভূষণ সেন, ঘোষ ফেমেলি, কলিকাতা, ভানু, বিশু, ঝরে, মনে, ননে, টুরে, পটল, সতসী তেওতা স্কুল ; শ্রীসুনীল কুমার গুপ্ত, তেওতা ; শ্রীবাণী দেবী, বর্দ্ধমান ; মানুকে, ভুটি, গোপাল, নেপাল, কাঞ্চু, কানু, মানু, হনু, তেওতা ; শ্রীতপেন্দ্র মিত্র, কলিকানা ; শ্রীগোবিন্দ লাল চট্টোপাধ্যায়, রংপুর ; শ্রীনিত্ত, শান্তি, স্মৃতি, কান্তি ও জ্যোতিঃ রঞ্জন গুহ, ভবানীপুর ; শ্রীরবীন্দ্র নাথ বসু, বর্দ্ধমান ; শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী সান্যাল, কলিকাতা ; শ্রীগৌরীপদ [illegible]তিকা ও রেণুকা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ; শ্রীশান্তিপ্রিয়া বসু, পেস্ন, রেণু, বুবু, উমা, গিরিডি।

যাঁহাদের তিনটি ধাঁধাঁর উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—

শ্রীলাল বিহারী, মোহন লাল, দেবব্রত, সত্যব্রত ও সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুর ; উপেন্দ্র নাথ রায়, নড়াইল ; অবনী, সরোজিনী, বিণাপাণি, কমলিনী, যতীন, দ্বিজেন, মণি, ননী, সুরু, সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সতী, করুণা, রেণুকা, রথিন্দ্র, শান্তি দেবী ও ইন্দিরা দেবী, রাজসাহী ; শ্রীমান্ দীপ্তিময় [illegible] ও মানু, লক্ষ্ণৌ ; কুমারী তরুলতা, শিবানী ও রেখারাণী দে এবং শ্রীশান্তি লতা মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীপ্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য, রুড়কী ; শ্রীবিভুতি ভূষণ বসু, খিদিরপুর ; শ্রীজ্যোতির্ম্ময়, অধীর চন্দ্র, নৃপেন্দ্র, চিত্ত রঞ্জন, হীরেন্দ্র নাথ ও বিজলী প্রভা বসু, কুড়িগ্রাম, প্রফুল্ল রঞ্জন গুপ্ত, গৌরচন্দ্র সাহা ও সচ্চিদানন্দ, কলিকাতা। শ্রীদেবব্রত, প্রিয়ব্রত, গীতা, ইভা, পুতু, মুরা ও আলোক, কলিকাতা ; নিলীমা রাণী দেবী ও সুধীর কুমার মজুমদার, রংপুর ; শ্রীমান্ অমরেন্দ্র কুমার ও অনিল কুমার সিংহ, কলিকাতা ; কল্যাণী, হিমানী ও কানাই লাল মুখোপাধ্যায়, দিল্লী, শ্রীমিহির চন্দ্র, কমলা, উষারাণী, শচীরাণী, অমুল্য, মুক্তি, অপরাজিতা ও শিশির চন্দ্র রায়, পাটনা ; শ্রীগোকুল ও মৃণালিনী বসু, কলিকাতা ; সিদ্দিকা খাতুন, ঢাকা ; শ্রীমান উমাপতি ঘটক, কালীঘাট ; শ্রীকমলাপতি ঘোষ,

কলিকাতা ; শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, কাটিগড়া ; শিশির মিউজিক হলের মেম্বরগণ ও শ্রীদুর্গা পদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর ; শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র গুহ, গয়া ; শ্রীশিশির মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীঅজিত মিত্র, গড্ডু ও দারু, কলিকাতা , সংকর্ম্ম সমিতি, গড়পার ; শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গৌরী, ডমুরু, বাদল ও বকু, কলিকাতা ; শ্রীগোপাল চন্দ্র সেনগুপ্ত, বরিশাল ; শ্রীশান্তিপ্রিয় ও দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বর্ম্মা।

যাঁহাদের দুইটি ধাঁধাঁর উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—

শ্রীশান্তি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়া ; শ্রীমতি অমিতা রায়, নৈহাটি ; শ্রীশচীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, ফরিদপুর; শ্রীবিরেন্দ্র নাথ মজুমদার, কলিকাতা ; শ্রীঅমল কুমার মুখার্জ্জী, আরামবাগ ; নন্দদুলাল ঘোষ, ভবানীপুর ; শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা ও নীলিমা দেবী ও সুরেশ বাড়ুয্যে, লক্ষ্ণৌ ; শ্রীসুধীর চন্দ্র ও সুবোধ চন্দ্র কর্ম্মকার এবং জালিয়াহাটী লাইব্রেরীর মেম্বরগণ ; শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র, খগেন্দ্র, মেন্তু, মিনি, অরবিন্দ ও অনাথ সেনগুপ্ত, লক্ষ্ণৌ ; শ্রীমতী সুষমা বালা ঘোষ, কলিকাতা ; পুষ্পলতা, রাধালতা, বিজনবাসিনী, ফনী ও ভিকু, মিরাট ; শ্রীশরৎ কুমার রায় ও পরিতোষ কুমার হালদার, উলুবেড়িয়া ; শ্রীঅমিয় রতন ও নিমাই রতন মুখোপাধ্যায়, সালিখা ; শেফালিকা গাঙ্গুলী, টেগর ক্যাশল কলিকাতা ; শ্রীশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী ও মণি ভট্টাচার্য্য, বরানগর ; ইন্দু ভূষণ মণ্ডল, হাওড়া ; কুমারী রেণুকা কণা ভৌমিক, আসাম।

যাঁহাদের একটী ধাঁধাঁর উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—

শ্রীকালিকুমার কুণ্ডু, কুমারখালি ; অমর পাহাড়ী ও বীণা, কলিকাতা ; শ্রীতারকনাথ, বিশ্বনাথ, চিত্তরঞ্জন সেন, মনু ও কল্যানী, বর্দ্ধমান ; শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, উলুবেড়িয়া ; রতনমনি ভট্টাচার্য্য, ভবানিপুর ; কুমারী শান্তি ও প্রীতি নিয়োগী ও পদ্মিনী দেবী, ময়মনসিংহ ; শ্রীবাসন্তিলতা দেবী, নংলেবিন বর্ম্মা ; হরিপ্রসাদ রায়, নৈহাটি ; অমরনাথ ঢোল, কলিকাতা ; যোগমায়া দেবী, গিরিডি ; প্রভাস অশোক, কলিকাতা ; নন্তু, নলু ও ছোটকা ; বারগণ্ডা, গিরিডি।

পরীর দৃষ্টি—শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত ; মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক নর্ত্তন, কুলজা লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট।

বইখানি পড়ে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি, ছেলেদের যে খুব ভালো লাগবে, সে কথা আমরা নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। ভাষা বেশ ঝর্ ঝরে, ছবিও আছে কতগুলি ভালো ভালো

পাতার ভেঁপু—শ্রীসুনির্ম্মল বসু, মূল্য দশ আনা

প্রকাশক ইউ' রায় এণ্ড সন্স ; কলিকাতা।

বইখানি আগাগোড়া হাসি স্ফূর্ত্তিতে ভরা। ছেলেরাত হাসবেই, বুড়োরাও হেঁসে অস্থির হয়ে যাবে। পদ্যের ভাগ আরো বেশী দিলে, খুবই ভালো হ'তো। মলাটের দুরঙ্গা ছবি ও ভিতরের ছবিগুলি ভালই হয়েছে। আমরা বইখানা প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের হাতে দেখতে ইচ্ছা করি। ছাপা ও বাঁধাই নিখুঁৎ। সুনির্ম্মল বাবুর আর এক খানা রঙ্গীন ছবি দেওয়া বই—"হাওয়ার দোলা" মুকুল কার্য্যালয় থেকে শীগ্‌গিরই বার হচ্ছে।

নীল পাখী—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দাম আট আনা

প্রকাশক গুপ্ত কোম্পানী, কলিকাতা।

এই বইখানি একটি বিদেশী গল্পের স্বদেশী অনুবাদ, লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করে' এই গল্পটি ছেলেদের মত করে তর্জ্জমা করেছেন। ভাষা বেশ পরিষ্কার, ছেলে মেয়েদের ভালই লাগ্‌বে।

পরীস্থান—গোকুল চন্দ্র নাগ ৷৵৹—প্রকাশক কল্লোল পাবলিশিং হাউস্, কলিকাতা।

বইখানি আমাদের বেশ ভাল লেগেছে ছেলেমেয়েদেরও ভালই লাগবে আশা করি। ভিতরের ছবি ও মলাটের ছবি চমৎকার হয়েছে।

মজার গল্প ও সুন্দর বন—শ্রীরবীন্দ্র নাথ সেন প্রণীত

দাম দশ আনা ও ছয় আনা।

বই দুইখানি আমাদের ভালই লাগছে। লেখক বেশ খেটে বই দুখানি লিখেছেন সুতরাং ছেলেমেয়েদের ও ভালো লাগ্‌বে ননিশ্চয়ই। বই দুই খানিতে ছবিও আছে অনেকগুলি।

নূতন ধাঁধা।

'ক্রমে ক্রমে বাড়্ছে'

'প্রতিজ্ঞায়' 'থাকি' রা 'জঙ্গল'

'কাটারি' 'ভাল',

তো 'জননীর' লেখা 'পাতা' আমি 'চরণ' ইলাম ভাই অন্ধ
'বায়সা'র খোঁজে স 'মহাদেব' ঘুরে হ'লাম বেজায় হর্দ্দ।
'মিস্‌হত হও' 'মশক'ই 'দশভুজা' 'পা' এসেছিলেন

'সময়' কে

'সময়' 'শব্দ' রেই আ 'বাহির' তিনি গেলেন চলে 'গরম গায়ের কাপড়' কে
রা 'জঙ্গল' 'মাংসেই' ঝরছে কে 'শক্তি' বি 'সীতাপতি' বি 'নী' বৃষ্টি।
'নিস্তব্ধ হও' টি করে' ভাবছি এ'ক 'কাঠ'ন অনাসৃষ্টি,
কে 'চল্লিশ সের' আছেন দা 'মূল্য' শাই, তাঁর তরে 'ঘোড়া' 'চিন্তা করনা'
'বাঁশী লোহিতে' 'আকাশ শ্রেষ্ঠ' দি 'এবং' কে 'কাটারি'র যাবে পাব্‌না

ইতি

'ভিক্ষুক' 'পা' 'কলসী' ক

(উপরের ' ' চিহ্নিত কথাগুলি বদ্‌লে ঠিক্ ঠিক্ প্রতিশব্দ বসাতে পারলে দিব্বি অর্থপূর্ণ একটি সুন্দর কবিতা দাঁড়াবে)

চোর প্রির দু' অক্ষর
পিছে তিন, আগে স্বর।

শ্রীঅনিশ কুমার রায়, উলপুর।

এবারে কাহারও লেখা পুরস্কার যোগ্য না হওয়ায়, পুনরায় ওইরূপ মৌলিক হাসির গল্পের জন্য ওই কয়খানি পুস্তকই দেওয়া হইবে। গ্রাহক নং নাম ও বয়স লিখিয়া আমাদের কার্য্যালয়ে ২৮শে ফাল্গুনের পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে।

খুকুমণি।

১ম বর্ষ। চৈত্র, ১৩২২ । নবম সংখ্যা

মুকুল

(নতুন মুকুল দেখিয়া)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]

মুকুল। মুকুল!
শৈশবের প্রিয়সাথী, কৈশোরের কল্পনার মূল!
আজিকে তোমারে হেরি সারা চিত্ত কত পুলকিত,
হারানো শৈশবে মোর ফিরে পাই,—সেই পরিচিত!
পড়াশুনা, আঁক কষা, জ্যামিতির সমস্যা-পূরণ,
কঠিন শাসন, আর শিক্ষকের নিষেধ-বারণ
কি দুঃসহ! ভাবিতাম, শৈশবের গণ্ডী হয়ে পার
কবে চিত্ত মুক্ত হবে! ফেলি এই নিষেধের ভার
বাহিরিব কল্পনার কুঞ্জবনে, লয়ে ফল-ফুল
কত খেলা লীলাভরে খেলিব যে পুলক-আকুল,—
মুকুল! মুকুল!

সেই সব ঝঞ্ঝাবাত, নিষেধের পাষাণ-প্রাচীর
মূর্চ্ছিত কুণ্ঠিত করি রেখেছিল বন্দী-সম থির—
থেকে থেকে মনে হতো, এ জীবন···যাতনা কেবলি!
বসন্তের গীত-গন্ধ আসে যায়, শুধু যায় ছলি!
শিশু-চিত্ত ছুঁয়ে যায়,দোলা দেয়, কয়ে যায় বাণী—
কোন্ স্বপনের দেশে রাজ্য করে কোন্ রাজা-রাণী···
রাজপুত্র ঘোড়া চড়ি চলে যায় দীর্ঘ পথ কত—
সাথে সদাগর-পুত্র. কোটালের পুত্র চলে তত!
নীল সাগরের পারে পাহাড়ের 'পরে দৈত্যপুরী—
সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজকন্যা, আতঙ্কে শিহরি
অচেতন! পালঙ্ক বহিয়া নীচে ঝরে কালো চুল···
সোনার কাঠিটি কোথা? কোথা হায়, জীবনের মূল?
মুকুল! মুকুল!

সে যেন ছায়ার মত, রৌদ্রতপ্ত জীবনের 'পরে
ঝকিয়া উঠিত, ক্ষণে মিলাইত কি যে শঙ্কাভরে!
অভিশপ্ত সে-জীবনে বসন্তের তরুণ বারতা
তুমি এনে দিতে বন্ধু. মাঝে মাঝে সান্ত্বনার কথা!—
জ্যামিতির আঁকা-বাঁকা হাড়ভাঙ্গা কর্কশ সে রেখা
মুছিয়া আঁকিতে প্রাণে কত বর্ণে কত ছন্দ-লেখা!
অকরুণ কত পল-বিপলে সে, তব পথ চেয়ে
কাটিত সুদীর্ঘ বেলা, আজ সব মনে আসে ধেয়ে—
কত গন্ধ, কত গান, কত আশা, কত ভাষা-রসে
সরস করিতে চিত্ত—কি কুহক-তুলির পরশে!
মৌন কণ্ঠে দিলে সুর, শিখাইলে ধরিবারে তুলি—
চিত্ত-বনে কত ফুল ফুটাইলে, সুবাসে আকুলি!

তোমার আহ্বানে মনে বাজে বাঁশী উচ্ছ্বসি ব্যাকুল—
তুমি সাথী, বন্ধু মোর, গুরু তুমি, করি তা কবুল—
মুকুল! মুকুল!

একদা তুমি হে বন্ধু, যে-পুলক দেছ মোর প্রাণে,
হতাশ ঝঞ্ঝায় শ্রান্ত চিত্ত মোর ভরেছিলে গানে...
আজো সে তেমনি করি লক্ষ লক্ষ শিশু-চিত্ত 'পরে
তোমার সরস হাসি অমলিন নিত্য যেন ঝরে!
উন্মুখ তরুণ প্রাণে জাগাও হে আশা, ভাষা, সুর—
জাগায়ে নন্দন রচ', শাসনেরে করে দাও দূর!
কল্পনার চারুকুঞ্জে সাথী করে নাও সাথে তব,
শুনাও বিচিত্র বাণী, ছন্দে-কাহিনীতে অভিনব!
সমুদার কর প্রাণ, বাঙ্গালার বংশধর এরা...
জ্ঞানে-মনে বিশ্বে যেন হতে পারে সকলের সেরা!
মমতায় চিত্তে সদা ফুটে রবে শিরীষ বকুল—
মুকুল! মুকুল!

—তুই থুলি—না—মুই থুলি—

শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার]

এক গ্রামে এক বুড়ো, আর এক বুড়ি বাস করত। বুড়োর অনেক ধন-দৌলৎ, টাকা-কড়ি, জমি-জমা ছিল। তার গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, বাগান ভরা ফল ফুলুরী—ক্ষেত ভরা শস্য,—অভাব কি তা' তা'রা দুজনে কখন টেরও পায়নি।

বুড়োর সবই ছিল—সুখের অভাব ছিল না, কিন্তু একমাত্র দুঃখ যে তাদের আর ছেলে মেয়ে হ'ল না;

বুড়ী যখন গ্রামের পথ দিয়ে যায়, তখন দেখে রাস্তায় রাস্তায় কত ছেলে মেয়েরা ছুটাছুটি করে খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছে—যেন সব এক একটি হীরের টুক্‌রো—,

বুড়ি যায় আর ভাবে, আহা, আমার যদি এমনি একটি ছোট মেয়ে থাকতো, তাহ'লে তাকে কেমন করে নাইয়ে, খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলতাম।

এই সব কথা মনে হয় আর বুড়ির চোখ দুটো জলে ভরে যায়। কি আর করবে, বুড়ি মনের দুঃখ মনে চেপেই দিন কাটায়।

বুড়ো খেত খামারের কাজ কর্ম্ম দেখে, হিসাব নিকাশ করে, আর বুড়ি ঘর দুয়ার আগলায়!

এইভাবে এক এক করে অনেক দিন কেটে গেছে।

একদিন বুড়ো বুড়িকে বল্‌লে—"আচ্ছা দেখ, এতকাল ত টাকা কড়ি, জমি জমা,

ঘর সংসার নিয়ে কাটালাম, সংসারের সব সুখই ভোগ করলাম, আশাও এক রকম মিটেছে—আচ্ছা, এইবার তীর্থ ধর্ম্মে বেরোলে হয় না? ইহকালের কাজত হল, এবার পরকালের কিছু করা যাক—।

বুড়ি বল্‌লে—"তাইত, তীর্থ করতে যাওয়া ত সোজা ব্যাপার নয়—তাতে চাই অনেক পয়সা, আর মেহনৎ ও কম নয়। আর আমাদের ঘরে ত এমন কেউ সোণার চাঁদ নেই—যার হাতে এই সব ধন সম্পত্তি তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই,—কপাল, সবই কপাল—এই বলে বুড়ি আঁচলের খোঁট দিয়ে চোখের কোনটা মুছে ফেল্‌লো—।

বুড়ো বুড়িকে কাঁদতে দেখে একটু সান্ত্বনার সুরে বল্‌লে—কেঁদে আর কি হবে বল—বিধাতা যখন দেন নাই, তখন আর মানুষের কি হাত আছে। এখন তাই বলেত ধন সম্পত্তির মোহে পড়ে পরকালটাও নষ্ট করতে পারি না।

বুড়ি আর কি বলে—বুড়ো যখন যাবেই ঠিক করেছে, তখন বুড়ির শত যুক্তি তর্ক মোটেই টিকবে না। বুড়ি তখন আর উপায় না দেখে বুড়োর মতেই রাজি হল।

কিন্তু এখন এই এত টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী, গরু বাছুর, ধান চালের কি ব্যবস্থা করা যায়। তীর্থের পথে বেরোলে কা'র অদৃষ্টে কি হবে কে বলতে পারে, হয়ত বা আর তারা নাও ফিরে আসতে পারে। এই বুড়ো বয়েস, তার উপর কত দিন পথ চলতে হবে কে জানে। মানুষের ভাল মন্দর কথা কি বলা যায়!

বুড়ো বসে বসে ভাবছে—

বুড়ি বল্‌লে যে, এক কাজ কর, আমাদের যেখানে যা আছে সব দান-খয়রাৎ করে বিলিয়ে না দিয়ে বিক্রী করেদাও না কেন। তার পর সেই টাকাগুলো সব এক করে কোথাও এক গোপন জায়গায় মাটীর নীচে পুতে রেখে গেলেই হবে। যদি বা আবার গাঁয়ের ভিটেয় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসি, তখন ত সব আবার চাই। টাকা ক'টা থাকলে তখন সবই আবার পাওয়া যাবে।

বুড়ো বল্‌লে ঠিক বলেছ তাই করা যাক্। কার কাছেই বা গচ্ছিত রেখে যাব, কার মনে কি আছে কে জানে। তার চাইতে তোমার কথাই ঠিক।

বুড়ি তার পরদিন থেকে ঘরের বাসন পত্র, গরু বাছুর, এক এক করে বের করে দিতে লাগল, আর বুড়ো খদ্দের ডেকে এনে এনে সেগুলোকে বিক্রী করে দিতে লাগল।

বুড়ো বুড়ির এই কাণ্ড দেখে গ্রামময় সাড়া পড়ে গেল—সবাই ভাবলে, বুড়ো বুড়ি কি ক্ষেপে গেছে—না কি। সব বেচে কিনে এত টাকা দিয়ে কি কর্‌বে! কোথায়ই বা নিয়ে যাবে, পথে ঘাটে চোর ডাকাতের ভয়, যদি মেরে নেয় তবে প্রাণে ও মরবে, টাকাও যাবে।

বুড়ো বুড়ি কিন্তু কাউকেই কিছুই বল্‌লে না—; ভাবলে কি জানি, যদি তাদের গোপন কথা কোনও রকমে বেরিয়ে পড়ে তা হলে হয় ত আর তাদের টাকা কড়ি কিছুই ফিরে পেতে হবে না! কেউ জিজ্ঞাসা করলে বুড়ো এ কথা সে কথা বলে জবাব দেয়। বুড়ি ফাঁকা ফাঁকা কথায় বলে—"আর কি হবে- -টাকা পয়সা, ঘর বাড়ী দিয়ে, তিন কুলে ত কেউ নেই যে ভোগ করবে; তাই সব বেচে কিনে দিয়ে যে দিকে দুই চোখ য য় চলে যাব"।

সেদিন অমাবস্যার রাত, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিজেকে নিজেই চেনা যায় না, তার উপর ঝুপ-ঝুপিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বাদলার দিনে যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বুড়ি বল্‌লে বুড়োকে—"দেখ এই ভাল সুযোগ—এখন আর আমাদের বাড়ী আচম্‌কা কেউ এসে পড়বার ভয় নেই, তুমি টাকাগুলো নিয়ে আমার পিছে পিছে এস। এই বলে বুড়ি এক ছোট লণ্ঠন হাতে বুড়োকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লো। পুকুর পাড়ে একটা পোড়ো গোয়াল ঘর ছিল, তার ভিতরের আবর্জ্জনাগুলো বুড়ি আগেই পরিষ্কার করে রেখেছিল, সেখানে এসে যে গর্ত্ত খোঁড়া ছিল তার ভিতরে সারি সারি টাকার কলসী ছয়টি রেখে বেশ করে মাটি চাপা দিয়ে রেখে এল।

* * * *

অনেক দিন পরে কত দেশ বিদেশ ঘুরে, কত ঠাকুর দেবতার পায়ে প্রণাম করে বুড়ো বুড়ি আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। গ্রামের মধ্যে ঢুকে বুড়ো বুড়ি দুজনেই যেন একটু অবাক হয়ে গেল—একবার ভাবলে আমরা কি ভুল করে অন্য গ্রামে এসে পড়েছি! তার পর একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলে—সেই ত বাঁধান ষষ্টিতলা, মোড়লদের ধানের গোলা, ঘোষেরপোর ইটখোলা; এইভাবে দোমনা হয়ে তারা

গ্রামের রাস্তা দিয়া চলেছে—চল্‌তে চল্‌তে দেখলে গ্রামের অনেক অদল বদল হয়ে গেছে—যেখানে তাঁরা গ্রাম দেখে গেছে, সেস্থান এখন জন শূন্য, বন জঙ্গলে ভরা। লোকের বসতি অত্যন্ত কম।

ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ক্লান্ত হয়ে বুড়ো বুড়ি দুজনে এক গাছতলায় এসে বসল।

পথ দিয়ে একটি পথিক গ্রামের দিকে চলেছে! এই শ্রান্ত দুটি বুড়ো বুড়িকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখে তাঁর কৌতুহল হল। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"হাঁ-গা তোমরা কোথায় যাবে—তাঁরা বল্‌লে—"আমরা আমাদের গাঁয়ে যাব—

'কোন গাঁয়ে—'

'মামুদপুর গাঁয়ে—'

পথিক বল্‌লে—এই ত সেই গাঁ—তোমরা কা'র বাড়ী যাবে—?

প্রশ্ন শুনে বুড়ি ভয়ানক রেগে গেছে—সে রাগে গর গর করতে করতে বল্‌লে—"কা'র বাড়ী আবার—আমার নিজের বাড়ী—দেখেছ বেটার আক্কেলটা—বলে কা'র বাড়ী—।

পথিক বুড়ির এই রাগ দেখে ত একেবারে ভড়্‌কে গেল—সে তাড়াতাড়ি দু'এক কথা বলেই তাদের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বুড়োবুড়ি গ্রামের মধ্যে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে আসছে—কিন্তু তাদের বাড়ী ঘর আর চোখেই পড়ল না। যার কাছে জিজ্ঞাসা করে সেই বলে কি জানি মশাই—আমরা ত ও নামে এ গাঁয়ে কাউকেই চিনি না,—হয় ত আছেন কেউ, খুঁজে নিন!

বুড়ো ত মহা মুস্কিলে পড়ল তাইত যা'র কাছে যায় সেই অপরিচিত। ওরা ও কাউকে চেনে না, ওদের ও কেউ চেনে না অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে তারা এক গোয়ালা বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছিল, বুড়ি বল্‌লে—"দেখ আমি ত আর চল্‌তে পারছিনা যেখানে হয় একটু জায়গা কি কেউ আজ রাত্রের মত দেবে না। কাল সকালে আবার ভাল করে খুঁজে নেওয়া যাবে না হয়, ভাল মুস্কিল বাপু।

বুড়ো আর উপায় না দেখে সেই বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি লাগিয়ে দিল বাড়ীর ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে বল্‌লে—"আপনি কি চান"

বুড়ো তখন কাঁদ কাঁদ সুরে তাকে সব কথা বল্‌লে।

বুড়োর কথা শুনে গোয়ালার পো'র ভারি দয়া হল—সে বল্‌লে—"তার আর কি হয়েছে, যতদিন আপনাদের ঘর বাড়ী খুজে না পান, ততদিন এইখানেই থাকুন, আপনাদের কোনও কষ্ট হবে না—আমি সব ব্যবস্থা করে দেব"।

বুড়ো বুড়ীর তখন যেন ধড়ে প্রাণ এল তারা দুজনে দুহাত তুলে গোয়ালার পোকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল।

দিন যায় দিন আসে, আর বুড়ো রোজ সকাল সন্ধ্যায় তা'র ভিটের খোঁজে সারা গ্রামময় ঘুরে বেড়ায়।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একদিন দেখলে একটা ডোবার ধারে মস্ত এক আম গাছ, গাছটা দেখেই চিন্‌তে পারলে এইটাইত সেই গাছ। তা হ'লে এই খানেই তার ভিটে ছিল। তাইত অতবড় বড় আটচালা ঘর, সেগুলো কোথায় গেল। এ্যাঃ একি সর্ব্বনাশ! তখনি বুড়োর হঠাৎ ছ কলসী টাকার কথা মনে পড়ে গেল—তাই ত সে টাকাগুলোও কি তাহ্‌লে—বুড়ো আর ভাবতে পারলে না—মাথায় হাত দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল—। কাকে'ই বা জিজ্ঞাসা করবে—কে তা'দের বলে দেবে!

*   *   *   *

বুড়ো আর বুড়ি রোজ সন্ধ্যার আঁধারে তাঁদের ভিটের আশে পাশে, আম গাছের কাছাকাছি, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বেড়াতে লাগল—; দিনের বেলা খোঁড়ে না—পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে। বুড়ো বলে বুড়িকে তাইত টাকাগুলো কোথায় রাখলে। বুড়ি বলে বুড়োকে "তাইত—অতগুলো টাকা কোথায় রাখলে—

বুড়ো বুড়ির নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই বিশ্রাম নেই; কেবলি এখানে, সেখানে গাছ গাছড়ার গোড়ায় গোড়ায় মাটির ঢিপির আশে পাশে চুপি চুপি গর্ত্ত খুড়ে বেড়ায় আর এ বলে ওকে—তাইত টাকাগুলো কোথায় রাখলে—ও বলে একে—তাইত টাকাগুলো কোথায় রাখলে—

ছয় ছয় কলসী টাকা, সোজা ব্যাপার ত নয়—বুড়ো কেবলি ভাবে আর এদিক ওদিক ঘোরে—বুড়ি তার পিছনে পিছনে চলে—। অবশেষে ভাবতে ভাবতে টাকার

শোকে তা'রা দুজনে পাখা হয়ে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে এসে দুজনে বসল মস্ত এক বটগাছের ডালের উপর।

বুড়ো বলে বুড়িকে—"তুই থুলি না—মুই থুলি—তুই থুলি।

বুড়ি বলে বুড়োকে—"তুই থুলি না—মুই থুলি—তুই থুলি।

আজও তা'রা তাদের টাকার কলসী খুঁজে পাইনি—আর কে যে রেখেছে তার ও মীমাংসা হয় নি—তাই এখনও রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমরা শুনতে পাই—সেই বুড়ো বুড়ির ঝগড়া—

তুই থুলি—না···মুই থুলি,

তুই থুলি।

নৌকা চলে নৌকা চলে

[শ্রীসুনির্ম্মল বসু]

নৌকা চলে নৌকা চলে
মাঝ নদীতে অথই জলে।
'বৈঠা মারি' মাল্লা মাঝি
"বদর বদর" চেঁচায় আজি,
সবাই মিলে হল্লা তোলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

রইল দূরে কূল্ কিনারা
পল্লীখানি ঝাপসা পারা,
ঝপাস্ ঝপাস্— শব্দ জলে,
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

শুভ্র পালে বাতাস লেগে
নৌকা ছোটে তীব্র বেগে,
দূর গগনে সূর্য্য ঢলে,
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

ঝাপটে ডানা বকের সারি
আকাশ পথে দিচ্ছে পাড়ি;
ফিরছে নীড়ে বিহগ দলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

আকাশখানি রক্ত-রাঙ্গা,
ধোঁয়ায় ছাওয়া দূরের ডাঙ্গা,
নাম্‌লো রবি অস্তাচলে,
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

দূরের ঘাটে নাইরে প্রাণী,
নীরব নিঝুম পল্লীখানি ;
ফির্‌ছে ঘরে ওই সকলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

গাছের ডালে পাতার ফাঁকে
উদাস্ সুরে কোকিল ডাকে,
আঁধার ঝোপে জোনাক্ জ্বলে,
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

ঝিল্লীগুলো ডুক্‌রে ওঠে,
দম্‌কা হাওয়া চম্‌কে ছোটে,
শ্রোতের মাঝে নৌকা দোলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

শুক তারাটি গগন পাশে
মিট্ মিটিয়ে মুচকী হাঁসে,
দেখছে যেন কৌতূহলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

আচম্বিতে সঙ্গোপনে
ঝল্‌মলিয়ে পূবের কোণে
উঠল চাঁদা গগন তলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

নৌকা চলে নীরব সাঝে,
নদীর জলে স্রোতের মাঝে,
চাঁদের আলোর ঝলক্ ঝলে,
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

আঁধার ঠেলে জোৎস্না নামে,
নৌকা চলে দূরের গ্রামে,
"বদর বদর" মাল্লা বলে,
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

মাল্লা মাঝি এক সাথেতে
বাউল গানে উঠছে মেতে,
বৈঠা মারে গায়ের বলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

যাচ্ছে বধূ শ্বশুর ঘরে
জলের পথে নৌকা চড়ে
অশ্রু ঝরে ওই বিরলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

নৌকা চলে জ্যোৎস্না রাতে,
নৌকা চলে মন্দ বা'তে
অথই জলে অঠাঁই জলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

দোলের দিনের দুর্গতি

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

শান্তি মূর্ত্তিমতী মনোহারিণী শান্তি আর ছবি ঠিক যেন তুলি দিয়ে আঁকা পরীর ছবি।

মামাতো পিস্‌তুতো বোন্ তারা দুটি। তাদের মুখে ভালোবাসা আর চোখে দুষ্ট মি মাখানো।

সেদিন ছিল দোল, কিন্তু তাদের জামাইবাবুর সে খেয়াল মোটেই ছিলনা। সাঁওতাল পরগণার কোনো রেলের ষ্টেশনের কাছে ছিল তাদের স্বাস্থ্য-নিবাস, তাদের জামাইবাবুরও একটি আস্তানা ছিল তাদের পাশেই। সকলেই হাওয়া খেতে সেখানে হাজির হয়েছিলেন।

জামাইবাবুর কাজ ছিল রোজ শান্তি ও ছবিকে নিয়ে সন্ধ্যা সাতটার গাড়ী দেখতে ষ্টেশনে যাওয়া। দোলের দিন কিন্তু তিনি একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন কেননা শুন্‌লেন তারা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনো জাগেনি। বেলা ছ'টার সময়ও তারা ঘুমুচ্ছে শুনে তিনি বিস্ময় মান্‌লেন, কিন্তু অসম্ভব ভাবলেন না।

রাত ঠিক আটটার সময় এসে তারা ব'ল্লে "জামাইবাবু রেলগাড়ী দেখতে যাবেন না? জামাইবাবু বল্লেন "তোমরা কি স্বপ্ন দেখছো—গাড়ী এক ঘণ্টা হোলো বেরিয়ে গেছে আর আমি ঠিক সময়ে গিয়ে তাকে সম্ভাষণ ক'রে এসেছি। তোমরা তখন ঘুমিয়েছিলে, এখনো দেখছি তোমাদের ঘুমের ঘোর কাটেনি।

হঠাৎ তারা দুজনেই তাদের জামাইবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো"ও মা! আপনার কপালে যে ভয়ানক কয়লার গুঁড়ো লেগেছে, ভারি বিশ্রী দেখাচ্ছে—আসুন আমরা মুছে দিই।"

তাদের জামাইবাবুটি কোনো কিছু সন্দেহ না ক'রে, যেই তাদের কাছে গেছেন অম্‌নি তারা দুজনে তাঁর মাথায়, কপালে, মুখে বেশ করে ফাগ মাখিয়ে দিলে। সেদিন যে দোল সে কথা তাঁর মনেই ছিলনা কাজেই তাঁর রঙ কেনাও হয়নি আর

এমন ঘটনার কল্পনাও মাথায় আসেনি। সঙ্গীন্ অবস্থাতেই তাঁকে ভালোমানুষটির মতো রঙ্গীন্ হোতে হোলো।

বাঙলাদেশের একটা নিয়ম আছে দোলের দিন রাঙিয়ে যাকে দেওয়া যায়, তাকে খাওয়াতে হয়। সেদিন তাদের ওখানে তাই জামাইবাবুর নেমন্তন্ন ছিল। ঠিক তাদের নেমন্তন্ন নয়, তাদের বাড়ীর ভিতরেই আর একটি ছোটো খাটো বাড়ীতে থাকতেন তাদের এক প্রিয়তমা দিদিমা—আহ্বানটা হয়েছিল তাঁরই ওখানে।

ঐ রকম অসহায় অবস্থায় শান্তি ও ছবি যে তাঁকে জব্দ ক'রে গেল, তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাদের জামাইবাবু সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তারা তাঁর বাড়ীতে তাদের দিদিমণির সঙ্গে গল্প কর্‌তে যেই বসে গেল, তিনি অম্‌নি চট্ করে চাকরকে দিয়ে বাজার থেকে আবীর কিনিয়ে আনালেন। বাজার ছিল খুব কাছেই, পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রতিশোধের উপায় করতলগত হোলো।

সেই আবীর একখানা রুমালে বেঁধে, জামার পকেটে পুরে, জামাইবাবু বল্লেন "চলো সব নেমন্তন্ন খেতে যাই।"

আর একজন মানুষ ছিলেন সেদিন জামাইবাবুর বাড়ীতে, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঠাট্টার সম্বন্ধ নয়। তিনি শান্তি ও ছবিকে সঙ্গে করেই ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বোন্‌দুটির দিদিমণির সহায়তায়, তাদের বিচ্ছিন্ন হ'তেই হোলো। জামাই বাবুটি পকেটে হাত দিয়েই রাস্তা চলছিলেন। ছবিদের বাড়ীর ফটকে ঢুকেই, মুঠো ভরা আবীর সন্দেহহীনা অপরাধিনীটির মুখময় মাখিয়ে দিলেন—কিন্তু শান্তি ভারি চালাক, সে আগে থেকেই জামাইবাবুর মতলব আন্দাজ ক'রে সেই আত্মীয়াটির পেছনে লুকিয়ে পড়েছিল। সে যাত্রা তাই তারই জিৎ হোলো।

সাঁঝের মেয়ে

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার]

ওই ফিক্ ফিকে হাসিটি
আলোকের বাঁশীটি
কে বাজায় আকাশে—
যেন স্বরগের ঝর্ণা
ঝরে নানা বর্ণা
কি মাধুরী মাখা সে।
গলে হীরে মোতি পান্না
পরীদের কান্না
ঢল ঢল সোহাগে ;
কানে নিখিলের ফুলটি
ছুলছুলে ছুলটি
প'রে ওই ও জাগে !
কিবা মধুভরা গন্ধে
ফুটাতে আনন্দে
অঙ্গের জ্যোছনা
পাতে শতদল দলেতে
চল নদী জলেতে
সুকোমল বিছানা।
লোটে কি মোহন পরশে
সমীরণ হরষে
অনুরাগে গা মেলি ;

ফোটে সবুজের কাননে
মেখে আশা আননে
যুঁই বেলা চামেলা !

তার ঝুম্ ঝুম্ ঘুঙুরে
তৃণে দেয় চুমুরে
বহে সুধা মরুতে

যত আঁখি পাতা-নাড়ানি
সই ঘুম পাড়ানি
লতাপাতা তরুতে !

চলে চঞ্চল চরণে
কার অনুসরণে
মুগ্ধা এ বালিকা,

বুঝি স্বপনের যাত্রী
ছোট্ট এ ধাত্রী
প্রকৃতির পালিকা !

— পাঁচ —

মরণের ছোঁয়া লেগে যেন খোকার অবশ দেহ ধীরে ধীরে মেজের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ তেম্‌নি পড়েছিল কেউ জানে না। কার মিষ্টি ডাকে খোকার চেতনা আবার ফিরে এলো। তন্দ্রার ঘোরে খোকা শুনতে পেলে কে যেন তাকে ফাগুনের দখিন হাওয়ায় দোল-খাওয়া পাপিয়ার সুরে ডাক্‌ছে—

ওগো অচিন্‌ দেশের খোকা – ওঠ—আর তোমার কোনো ভয় নেই—চেয়ে দেখ আমি এসেছি।

খোকার মাথা তখনো ঝিম্‌ ঝিম্‌ কর্‌ছে—চোখ আবেশে ঢুলে আস্‌ছে; তবু এমন মিষ্টি ডাক আর তাকে শুয়ে থাকৃতে দিলে না। সে চোখ কচলে উঠে বস্‌ল।

প্রথমটা সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। কারাগার আলো করে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নার চাঁছির তৈরী ফুটফুটে একটি মেয়ে। কি চমৎকার তার গায়ের রং। আর সব চাইতে আশ্চর্য্য এই যে গা থেকে তাঁর স্বর্গের নন্দন-কাননের লক্ষ পারিজাতের গন্ধ বেরিয়ে ঘরটাকে ভুর্‌ ভুরে করে রেখেছে।

খোকা তার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি যেন এক ঝলক চাঁদের আলোক দেখে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে বল্লে, আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছ কি? আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভুতুড়ে দেশে থাকি বটে কিন্তু আমি ভুত নই।

আর যাই হোক সে যে ভূত নয় তা খোকা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। আর সে ভূত নয় বলেই খোকা আরো অবাক্ হয়েছিল বেশী। ভূতুড়ে দ্বীপের অন্ধকার কারাগারে এই ফুটফুটে জ্যোৎস্না-ধোয়া মেয়েটি এলো কোত্থেকে ?

এখন তার মিষ্টি হাসি শুনে গ'লে গিয়ে শুধোলে তা হ'লে কে তুমি ?

সে বল্‌লে, আমি কে তা না হয় এখন নাই বল্লুম—তবে এইটে জেনে রাখো যে ভুতুড়ে দ্বীপের রাজার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি ছুটে এসেছি। এই যে আমার কপালে একটা মাণিক জ্বল্‌ছে এরি গুণে আজ তোমরা প্রাণ ফিরে পেলে, নইলে জগতে আর কারো সাধ্য ছিল না যে নাকি ভূতুড়ে রাজার হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে।

খোকা এতক্ষণ তা লক্ষ্য করেনি এইবার তার মুখের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলে কপালের ওপর ছোট্ট একটা মাণিক জ্বল জ্বল করে জ্বল্‌ছে আর তারই আলোতে কারাগারটা এমনতরো রোসনাই হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে ঐ মুখে মাণিকটি যেমন মানিয়েছে এমন আর কারো মুখে মানাতো কিনা সন্দেহ।

বরং জানা না থাকলে ঠিক করা মুস্কিল, এ আলো মাণিকের না ঐ জ্যোৎস্না ধোয়া মুখ থেকে বেরুচ্ছে।

মেয়েটি তার কচি হাত দিয়ে খোকার ডান হাত খানা ধরে বল্লে চলো আমার সঙ্গে আমার পুরীর ভেতর সেখানে কোনো ভূত আর তোমার নাগাল পাবে না।

খোকা বল্লে,—তোমার পুরীতে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমার সঙ্গীদের ফেলে কোথায়ও আমি যেতে পারবো না। বাঁচিয়ে দাও আগে ওদের তুমি!

মেয়েটি বল্লে, কৈ ? কোথায় তোমার সঙ্গী ?

পেছন ফিরে খোকা দেখলে, কোকিল, বৌ-কথা কও আর সব পাখীর দল মেঝের ওপর মরে পড়ে আছে !

খোকার চোখ ছল্ ছলিয়ে এলো ! দুঃখু কষ্টের ভেতর দিয়ে এতদূর তারা এসেছে কোথায়ও ছাড়াছাড়ি হয়নি। আর এতদিনে সত্যিকারের আশ্রয় যখন মিলল তখনই তারা এম্‌নি করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

টপ্ টপ্ করে খোকার দুগাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল। সে কিছু বল্লে না শুধু আঙ্গুল দিয়ে পাখীদের দেখিয়ে দিলে।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে বল্লে ও মা এর জন্যে আবার কান্না হচ্ছে! এই বলে আঁচল দিয়ে খোকার চোখের জল মুছিয়ে দিলে।

খোকা মেয়েটির হাত চেপে ধরে বল্লে, ওদের আবার ফিরে পাবো? বল আমায় সত্যি করে মেয়েটি ফিক্ করে হেসে বল্লে, পাবে না তো কি? এর জন্যে আবার এত কান্নাকাটি কিসের শুনি? এই বলে কপালের মাণিকটি খুলে এক এক করে পাখীদের গায়ে ছোঁয়াতেই তারা গান গাইতে গাইতে জেগে উঠলো।

খোকা তাদের বুকে তুলে নিয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে দিতে লাগলো।

বউ-কথা-কও বল্লে, কি কাণ্ডো বলতো খোকা! আমি একটা ভারি মজার স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখছিলাম স্বর্গ থেকে পাখা ওয়ালা দেবদূতের মতো দুটো মূর্ত্তি ধীরে ধীরে নেমে এলো,—তারপর আমাকে একটা পুষ্পরথে তুলে নিয়ে শোঁ শোঁ করে আকাশ দিয়ে উড়ে চললো! আমার যেন মনে হ'ল আমি মরে গেছি আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!

সে খোকার বুকের মধ্যে ঠোঁট ঘষ্তে লাগল! খোকা তাদের সকলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লে, আর কখ্খনো তোমাদের ছেড়ে দেবো না সব আমরা এক-সঙ্গে থাকবো। দেখি কে আমাদের মার্তে পারে।

মেয়েটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, এইবার সে ঠোঁট বেঁকিয়ে অভিমান করে বল্লে—বেশ, মানুষের দেশের লোক এমনি নিমকহারামই বটে। আমি সকলকে বাঁচিয়ে দিলুম আর আমার দিকে একবার ফিরেও তাকানো হচ্ছেনা।

খোকা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পাখীদের বল্লে, এই এক রত্তি মেয়ের দয়াতেই আজ আমরা সকলেই প্রাণ পেয়েছি।

পাখীরা ডানা পট্ পট্ করে উঠে বসে বল্লে, তা এতক্ষণ বলনি কেন খোকা? ওঁর দিকে আমরা একবার চাইও নি! কি অন্যায় হয়ে গেছে বলতো!

এই বলে তারা মেয়েটিকে ঘিরে নেচে নেচে গান সুরু করে দিলে।

কি মিষ্টি লাগছিল তাদের গলা! খোকা কত দিন কত রাত তাদের গান শুনে আসছে কিন্তু এমনটি তো আর কোনো দিন শোনেনি। খোকা অবাক হ'য়ে গান শুনতে লাগল।

গানে গানে ভূতুড়ে দ্বীপের কারাগারটি স্বর্গের নন্দন কানন হয়ে উঠল।

মেয়েটির মিষ্টি হাসি, মাণিকের চোখ ঝলসানো আলো, পাখীর গান সব মিলে খোকাকে যেন কোন্ সুদূরের স্বপনরাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে চল্‌লো।

গান শেষ হ'লে মেয়েটি পাখীদের কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে খোকার দিকে তাকিয়ে বল্লে, এখন চলো সব আমার পুরীতে। এতদিন ভূতের ভয়েই তোমরা পাতাল পুরীর এখান সেখান করে বেড়িয়েছ, চল আমার ওখানে মিষ্টি সরবৎ খেয়ে গা ঠাণ্ডা করবে।

খোকা হেসে বল্লে, ভূতের ভয়ে আমাদের কষ্ট করে এখান সেখান ক'রে বেড়াতে হয়নি, ভূত নিজেই সে কাজ করেছে আমরা শুধু ধাক্কার মুখে ভেসে এসেছি। চল এখন তোমার পুরীতে—সেখানে হয়তো আবার পেত্নীর খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে।

মেয়েটি ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখ ভার করে বল্লে, হ্যাঁ আমার পুরী ভূতের বাসা, আমার বাড়ী পেত্নীর আড্ডা তাতো বলবেই। তোমাদের বাঁচাতে আমার না আসাই ছিল ভালো।

খোকা বল্লে—আহা-হা রাগ করো কেন? আমি ঠাট্টা করে বলেছি বইতো নয়!

মেয়েটি বল্লে, মানুষের দেশের লোকই ঐ রকম। তোমার ঠাট্টাও যেমন, ভালো কথাও ঠিক তেম্‌নি।

খোকা ফিক্ করে হেসে বল্লে আচ্ছা, তা যেন না হয় তাই হ'ল। কিন্তু তোমায় ডাকবো কি বলে বলতো—একটা নাম টাম কিছু আছে তো তোমার?

মেয়েটি তার কোকড়া কোকড়া চুলগুলি দোলাতে দোলাতে বল্লে—কি বলে ডাকবে? তাও তো একটা কথা বটে, আচ্ছা আমায় না হয় "পথের চেনা" বলে ডেকো, কেমন নামটা পছন্দ হ'ল তো?

খোকা বলে পছন্দ হবে না কেন ? আর নামটা তোমার, আমার অপছন্দ হলেই বা কি করতে পারি বলো ?

এই কথা বলতেই না বলতেই কোথেকে রাশি রাশি অন্ধকার এসে সমস্ত জায়গাটাকে গ্রাস করে ফেললে কিচ্ছু দেখবার আর যো রইল না। খোকা চেঁচিয়ে বলে উঠল—পথের চেনা, এ আবার কি বিপদ বলতো ? আমি তো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনে—কোথায় তুমি ?

পথের চেনা এগিয়ে এসে খোকার হাত তার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বল্লে—ভয় নেই তোমার, ভূতুড়ে রাজার এ একটা নতুন চাল। যতক্ষণ মাণিক সঙ্গে আছে ভুতুড়ে রাজার কোনো সাধ্য নেই আমাদের অনিষ্ট করে, ও শুধু আমাদের রাস্তা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে এই মতলব ঠাউরিয়েছে।

এই বলে মাণিকটা নিয়ে একটা মিষ্টি গান গাইতে গাইতে সকলের কপালের ওপর ছুঁইয়ে দিতেই দেখতে দেখতে সব অন্ধকার কেটে গেল।

তখন সকলে পথের চেনার সঙ্গে তার পুরীর দিকে রওনা হ'ল!

গল্প করতে করতে তাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেল—কিন্তু তবু পথ আর শেষ হ'তে চায় না।

খোকা শুধোলে, ওগো পথের চেনা আর কতদূর ? পথের চেনা একটু হেসে বল্লে—এই যে খোকা আমরা এসে পড়েছি!

আরো খানিকটা গিয়ে সে একটা কাঁটা বনের মধ্যে ঢুকলো। সামনেই একটা মস্ত বড় উঁইয়ের ঢিপি!

খোকা বললে এখান দিয়ে রাস্তা কোথায় ? ভুল পথে তো নিয়ে এলে না ?

সে বল্লে—না। তারপর কপালের মাণিকটা খুলে উঁইয়ের ঢিপির ওপর ছোঁয়াতেই খোকা অবাক হ'য়ে দেখলে মস্তবড় শ্বেত পাথরের এক রাজপুরী আকাশ ফুঁড়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ফটকের সামনে যেতেই দেখলে মান্ধাতা আমলের বেঁটে থুর্‌থুরে বুড়ো বসে বসে

ঢুলছে। তাঁর দাঁড়ী এত বড় যে মাথা ছাড়া শরীরের আর কিছু দেখা যায় না। আগা গোড়া সব দাঁড়ীতে ঢাকা।

পথের চেনা খোকার দিকে চেয়ে বল্লে—একে দেখে ভয় পেওনা খোকা—এ হ'চ্ছে ভূত তাড়াবার সব চাইতে বড় ওঝা। এর নাম হ'ল বন্ বন্ সিং। ভূতের বাপের সাধ্যি নেই যে আমার পুরীতে ঢোকে। দিন-রাত্তির বন্ বন্ সিং আমার পুরী পাহারা দিচ্ছে।
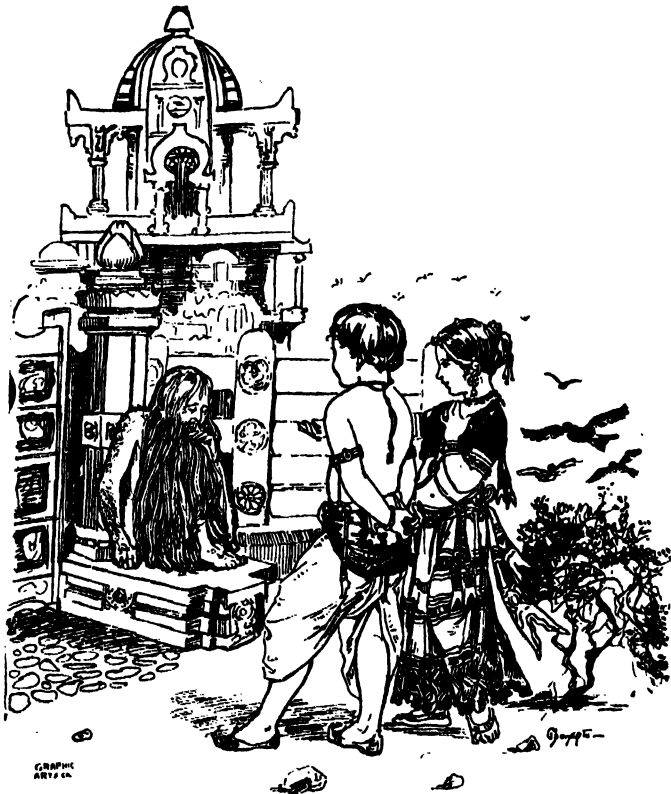
তারপর একটু হাততালি দিতেই লাফিয়ে উঠে বন্ বন্ সিং "পথের চেনাকে" কুর্ণিশ করে দাঁড়াল।

সে বল্লে, ফটক খুলো না বন্ বন্ সিং।

খোকা ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—কেন বলতো? আমাদের ঢুক্‌তে দেবেনা তোমার পুরীতে?

পথের চেনা খিল খিল করে হেসে বল্লে, ও তা বলিনি বুঝি তোমাকে! ভূতের দেশে থাকি বলে আমার পুরীতে সব উল্টো ক'রে কথা বল্‌তে হয়। ঐ দেখ বন্ বন্ ফটক্ খুলে দাঁড়িয়ে আছে। খোকা চেয়ে দেখলে সত্যি ফটক্ খুলে গেছে।

পথের চেনা তখন সকলের দিকে তাকিয়ে বল্লে, বুঝলে তোমরা—আমার পুরীতে কিন্তু সব সময় উল্টো করে কথা কইতে হ'বে। যদি তোমার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল্‌বে—এখন খাবো না—মনে থাক্‌বে তো?

সকলে ঘাড় নেড়ে বল্লে—খুব থাক্‌বে।

পথের চেনার পুরীতে ঢুক্‌তেই কোত্থেকে দলে দলে সব এক আঙ্গুলে পরীরা এসে তাদের ঘিরে গাইতে সুরু করে দিলে। ব্যাপার দেখে বউ-কথা-কউ, কোকিল, আর আর সব পাখীরা তো খুব খুসী। তারাও সঙ্গে সঙ্গে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে আসর মাৎ করে রাখল।

কেউ নাচতে নাচতে মিষ্টি সরবৎ নিয়ে এসে বল্লে, খোকা সরবৎ খাও—কেউ বল্‌ছে খোকা, তোমাদের দেশের গান গাইতে হ'বে কিন্তু! কেউবা বল্‌ছে, খোকা সঙ্গে নাইতে এসো—

খোকা চারদিকে চেয়ে দেখলে পথের চেনা কোন ফাঁকে পালিয়েছে।

নাচ গানের আর শেষ নেই—শুধু চলেছে আর চলেছে। এতদিনে মিষ্টি গান শুনে আর চোখ জুড়োনো যায়গায় এসে খোকার হাঁপিয়ে পড়া প্রাণটা একটু নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো।

বাস্তবিক কি চমৎকার এই পথের এই পথের চেনার পুরীটা। যেদিকে চাইবে চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছে করেনা! শুধু কোত্থেকে মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভেসে এসে খোকার তরুণ প্রাণটাকে বল্গা ছাড়া ঘোড়ার মতো পাগল করে তুল্‌লো। শুধু হাসি, গান, ফুল, মিষ্টি কথা এমন তরো কত কি খোকাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা সুরু করে দিলে।

এমন সময় পথের-চেনা হাসতে হাসতে ফিরে এসে খোকাকে শুধোলে—কেমন

লাগছে খোকা আমার পুরী! হাতে তার পরীদের পাখার তৈরী চমৎকার এক পোষাক!

খোকা ছুটে গিয়ে তাকে বল্লে, কি সুন্দর যায়গায় তুমি থাকো ভাই!

পথের চেনা তাকে পোষাকটা পরিয়ে দিতে দিতে মিষ্টি হেসে বল্লে, চুপ! উল্টো করে কথা বল্‌তে হবে তোমাদের মনে থাকে যেন! আমাদের না বল্‌লেও চলে কিন্তু তোমরা সাবধান! কখন গিয়ে আবার ভূতের হাতে পড়বে!

খোকা ভয়ে ভয়ে বল্লে,—আচ্ছা এবার থেকে উল্‌টো করে কথা বল্‌বো।

পোষাক পরে' খোকা বউ কথা কওয়ের সঙ্গে চল্‌লো পথের চেনার পুরীটা একটু ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে। খোকা খানিকটা যায় আর থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়ায়।—বউ কথাকও, কি চমৎকার ঐ লালরঙের মাছটা, ঐ যে শিষ দেওয়া পাখী কি ওর নাম? ঐ যে, ঐ যে সেই শিশির ধোয়া ফুল যার ভুরভুরে গন্ধ আমরা পাচ্ছিলাম।

তারপর বৌ-কথাকওকে বুকে চেপে ধরে বল্লে,—সত্যি ভাই, ভাগ্যিস্ আমরা ভূতের হাতের পড়েছিলাম তাই তো পথের চেনার পুরী দেখতে পেলাম—আমি কখ্‌খনো—কখখনো এ পুরী ছেড়ে যাবোনা।

যেমনি পথের চেনার কথা ভুলে গিয়ে এ কথা বলা অমনি হুস্ করে খোকা পুরীর বাহিরে ভূতুড়ে দ্বীপের রাজার রাজ্যে গিয়ে পড়ল।

খোকা প্রাণপণ চেঁচিয়ে ডাকলে—বউ-কথাকও আমায় বাঁচাও—পথের চেনাকে ডাকো—কিন্তু সেকথা বাতাসে মিলিয়ে গিয়ে শুধু কানে ভেসে এলো—ভূতুড়ে রাজার প্রাণ কাঁপানো হাসি—হা—হা—হা!!!

(চল্‌বে)

যাদুকর

[শ্রীকমলবাসিনী দেবী]

রাত যখন দশটা তখন সেই বাড়ীর আলোগুলো সব একে একে নিভে গেল। আলোগুলো নিভে যাওয়ার পরও প্রায় ঘণ্টা দুই সেই গাছের ওপর অপেক্ষা কোরে, ঠিক রাত বারটার সময় ঈগল যদুকে বল্লে—ভাই, সবজান্তা ও তার বাড়ীর সবাই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, এইবার আমাদের তার বাড়ীর মধ্যে যেতে হবে। সেখানে যাওয়ার আগে তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলে রাখি, মন দিয়ে শোন। সেখানে গিয়ে আমি যা যা বলবো ঠিক সেই মত কাজ করতে হবে। তুমি নিজে একটি কথাও বলতে পাবে না। আর খুব সাবধানে কাজকর্ম্ম করতে হবে একটুও শব্দ যেন না হয়।

এই বলে যদুকে পিঠের ওপর বসিয়ে আস্তে আস্তে উড়তে উড়তে ঈগল একেবারে সবজান্তার উঠানের মাঝখানে গিয়ে নামলো। উঠানের মাঝখানে একটি পেয়ারাগাছ ছিল, ঈগল চুপি, চুপি যদুকে বল্লে—এই পেয়ারাগাছ থেকে তিনটে পেয়ারা পেড়ে নাও। পেয়ারা পাড়া হোয়ে যেতেই, ঈগল যদুকে সঙ্গে কোরে উঠানের সামনেই ঘরখানা ছিলো সেই ঘরখানার কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে—ঐ ঘরের মধ্যে সবজান্তা শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এইবার মাথা থেকে তিনগাছি চুল তুলে আনতে হবে। কিন্তু সাবধান একটি একটি কোরে তুলো একসঙ্গে তিনগাছা ধরে যেন টান দিও না।

যদু পা টিপে টিপে সেই ঘরের মধ্যে গেল। সবজান্তা তখন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে। যদু সবজান্তার মাথার দিকে গিয়ে, তার মাথার একগাছি চুল ধরে টান দিলে। চুলে টান পড়তেই সবজান্তা হাঁউমাউ কোরে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু সে চেঁচানি এক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর আবার নাক ডাকানি সুরু হোলো। আবার কিছুক্ষণ পরে যদু তার মাথার আর একগাছি চুল ধরে আর এক টান দিলে। এবারেও সে আগের বারের মত আর একবার চেঁচিয়ে উঠলো, তার পরেই আবার

সব চুপ—চাপ। এমনি কোরে সবজান্তার মাথা থেকে একটি কোরে তিনগাছি চুল তোলা হোয়ে যেতেই, চুল তিনগাছি নিয়ে যদু ঈগলের কাছে এসে হাজির হোলো।

ঈগল বল্লে—এখনো আমাদের কতকগুলি কাজ বাকি আছে, সেইগুলি সারা হোলেই আমরা এখান থেকে দৌড় দেবো। এই বলে ঈগল যদুকে সঙ্গে কোরে এগিয়ে চল্লো। সেই মস্তবড় উঠানটা পার হোয়ে যেতে তারা দুজনে একটি আস্তাবলের সামনে এসে পৌঁছল। আস্তাবলের সামনেই একখানা ছোট চৌকো পাথর পাতা ছিল ঈগল যদুকে সেই পাথরখানা তুলতে বল্লে। যদু পাথরখানা তুলতেই তার নীচে তিনটে ছোট ছোট কাঠের টুকরো পাওয়া গেল। ঈগল যদুকে কাঠের টুকরো তিনটে তুলে নিতে বলে, বল্লে—কাঠের টুকরো তিনটে তোমার কাছে রাখ আর ঐ চৌকো পাথরখানা নিয়ে আস্তাবলের দরজায় ছোঁয়াও যদু পাথরখানা তুলে নিয়ে আস্তাবলের দরজায় ছোঁয়াতেই দরজা খুলে গেল। ঈগল বল্লে—এবার ঐ পেয়ারা তিনটে দরজার সামনে রেখে দাও। পেয়ারা তিনটে দরজার সামনে রাখতেই একটি খরগোস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কপ্ কপ্ কোরে সেই পেয়ারাগুলো খেতে লাগল। তখন ঈগল বল্লে,—এবার ঐ খরগোসটি পাথরখানা ও কাঠের টুকরো তিনটি নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার পিঠের ওপর উঠে বসো। এখন আমাদের খুব তাড়াতাড়ি উড়ে চল্‌তে হবে, কারণ আর এক- পরেই সবজান্তা আমাদের চালাকি সব জানতে পারবে। আর এ সব ব্যাপার জানতে পাবামাত্র আমাদের ধরবার জন্য সে আমাদের পেছনে তাড়া কোরে আসবে। যদু তাড়াতাড়ি জিনিষগুলি সব নিয়ে ঈগলের পিঠের ওপর উঠে বস্‌তেই ঈগল বাতাসের মত সাঁ সাঁ কোরে চল্লো।

এমনি কোরে উড়তে উড়তে কত বন, জঙ্গল পার হোয়ে যেতে ভোর বেলা ঈগল সবাইকে নিয়ে একটি পাহাড়ের ওপরে এসে নামলো। পাহাড়ের ওপর নেমে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর ঈগল যদুকে বল্লে—এবার আমাদের কিছু খেতে হবে ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। এই বলে সে একবার গা ঝাড়া দিলে। সে গা ঝাড়া দিতেই তার পালকের ভেতর থেকে ছোট্ট একটি থলে বেরিয়ে পড়লো। থলেটি

যদুকে তুলে নিতে বলে সে বল্লে—এই থলের কাছে খাবার ও জল চাও। যদু থলেটি কুড়িয়ে নিয়ে থলের কাছে খাবার ও জল চাইতেই তখনি সেখানে নানা রকমের খাবার এসে হাজির হোলো। যদু, ঈগল ও খরগোস পেট ভরে সেই খাবার ও জল খেলো। খাওয়া হোয়ে যেতে আর একটু বিশ্রাম কোরে ঈগল যদুকে বল্লে—ভাই একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখ তো আমাদের কেউ তাড়া কোরে আসছে কি না।

যদু পেছন দিকে চেয়ে বল্লে—হাঁ ভাই এক ঝাঁক কাক সোজা এই আমাদের দিকেই উড়ে আসছে। ঈগল বল্লে—আর দেরী নয় জিনিষ পত্র নিয়ে তাড়াতড়ি আমার পিঠে উঠে পড়। সংজাস্তা আমাদের তাড়া কোরে আসছে। এই বলে তাদের সবাইকে পিঠে কোরে ঈগল আবার সাঁ সাঁ শব্দে উড়তে আরম্ভ করলো। এমনি ভাবে খানিকক্ষণ ওড়বার পর ঈগল আবার যদুকে বল্লে—ভাই আর একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখ তো আমাদের কতটা কাছে এসেছে। যদু পেছন দিকে চেয়ে বল্লে—তারা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। তখন ঈগল যদুকে বল্লে—তোমার কাছে যে তিনগাছা চুল আছে এইবার সেই চুল তিনগাছা মাটিতে ফেলে দাও। যদু সেই তিনগাছা চুল মাটিতে ফেলে দিলে। চুল তিনগাছা মাটিতে পড়া মাত্র একঝাঁক বাজ পাখী হোয়ে সেই কাকদের যে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেল, তাদের আর দেখতে পাওয়া গেল না।

ঈগল প্রাণপণ শক্তিতে উড়ে চলেছে। খানিকক্ষণ পরে সে আবার যদুকে বল্লে—ভাই একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখ। যদু পেছন দিকে চেয়েই বল্লে—ভাই একটি মস্তবড় হাতী আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

ঈগল বল্লে—পেছন দিকেই চেয়ে থাক যখন দেখবে হাতীটা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে তখন আমাকে বোলো। ঈগল যদুকে এই কথা বলার মিনিট পনের পরেই যদু এই বলে চেঁচিয়ে উঠলো—ভাই ঈগল এবার সেই হাতীটা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে।

ঈগল বল্লে—বেশ, তোমার কাছে যে তিন টুকরো কাঠ আছে এইবার সেই কাঠের টুকরো তিনটি মাটীতে ফেলে দাও।

যদু কাঠের টুকরোগুলো মাটিতে ফেলে দিতেই, যেখানে সেই টুকরোগুলো পড়লো দেখতে দেখতে সেখানে এক মস্তবড় জঙ্গল হোয়ে গেল। হাতীটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ কোরে আসতে আসতে সেই সময়ের মধ্যে ঈগলও সবাইকে নিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে একটানা উড়ে ঈগল বড়ই শ্রান্ত হোয়ে পড়েছিল, সেইজন্য বিশ্রাম করবার জন্য সে একটী মাঠের মাঝখানেই নেমে পড়লো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর ঈগল যদুকে বল্লে—ভাই একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখ তো।

যদু পেছন দিকে চেয়ে বল্লে—ভাই হাতীটা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে।

তখন ঈগল যদুকে বল্লে—তাড়াতাড়ি আমার পিঠের ওপর উঠে বসো, উঠে বসেই সেই পাথরখানা মাটীতে ফেলে দাও। যদু ঈগলের কথামত তার পিঠের ওপর উঠে বসেই সেই পাথরখানা মাটীতে ফেলে দিলে। পাথরখানা মাটীতে পড়েই এক প্রকাণ্ড পাহাড় হোয়ে গেল। কোথায় বা রইলো হাতী আর কোথায় বা রইলো তারা, পাহাড় তাদের মাঝখানে তার বিপুল দেহ বিস্তার কোরে, তাদের দুই দলকে পরস্পরের কাছে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিলে।

এবার ঈগল যদুকে বল্লে—ভাই এখন বাঁচা গেল। আর আমাদের তাড়াতাড়ি ছুটতে হবে না। আমরা এবার সবজান্তার এলাকা ছাড়িয়ে এসেছি। এখন আর সে আমাদের কোন রকম অনিষ্ট করতে পারবে না। এই বলে ঈগল ধীরে ধীরে উড়ে চল্লো।

এদিকে সবজান্তা যখন দেখলে যে তার হাতের শীকার ফস্কে গেল, তখন সে রাগে দুঃখে অভিমানে এই প্রতিজ্ঞা করলে যে এর প্রতিশোধ সে যেমন কোরে পারে নেবেই নেবে। এই প্রতিজ্ঞা কোরে রাগে গর্ গর্ করতে করতে সে তার নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় 'মুকুলে'র পাঠক-পাঠিকাগণ,—

'মুকুল' দিন দিন তোমাদের কাছে মধুর আধার হ'য়ে উঠ্‌ছে, এতে আমাদের খুবই আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের প্রিয় হ'তেই সে চায়, তোমাদের স্নেহেই সে বেঁচে থাক্‌বে; এর বাড় কামনা আর তার নেই।

তোমাদের অনেকেই বোধহয় জানোনা যে প্রতি বছর বাঙ্‌লার সমস্ত সাহিত্যিকরা কোনো না কোনো জায়গায় সম্মিলিত হন। এবার তাঁদের বীর-ভূমের শিউড়িতে সম্মিলনী হবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তার সাধারণ সভাপতি ও শ্রীযুক্তা সরলাদেবী বি, এ, তার সাহিত্যশাখার সভানেত্রী হবেন। এর আগে আর নিখিল-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীতে কোনো মহিলা নেত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হন-নি। প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য সম্মিলনেও গতবারে ইনিই সভানেত্রী হ'য়েছিলেন। সাহিত্য-সম্মিলনীর এটা ১৭শ অধিবেশন হবে। প্রথম অধিবেশনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথই সভাপতি হ'য়েছিলেন।

* * *

বাঙলার একজন তরুণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ী আমাদের চিরদিনের মতো ছেড়ে গেছেন, সে বিচ্ছেদে আমাদের কাতর ক'রেছে।

* * *

নূতন বছরের প্রথমেই ১৩৩৩ সালের বৈশাখে বার্ষিক 'মুকুল' তোমাদের কাছে গিয়ে দেখা দেবে। বাঙলার নাম করার মতো বহু লেখক লেখিকা তোমাদের জন্যে নববর্ষের যে উপহার সাজিয়েছেন, তার তুলনা নেই। তোমরা তা একবার হাতে পেলে আর ছাড়্‌তে চাইবেনা। নববর্ষের প্রীতি সম্ভাষণ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা ক'র্‌বো। আজ আসি। ইতি

তোমাদের "সম্পাদক"।

ধাঁধাঁ

১। নিম্নলিখিত লাইনগুলির প্রত্যেকটিতে, প্রত্যেক কথার ভিতর এমন একটি ক'রে অক্ষর আছে যা একসঙ্গে করলে বাঙলার দুজন বড় কবির দুখানি কাব্যের ও দুজন বড় ঔপন্যাসিকের দু'খানি উপন্যাসের নাম হয়। প্রত্যেক বই কার লেখা তাও ব'লতে হবে—নয়তো উত্তর ঠিক ব'লে গ্রাহ্য হবে না :—

(১) সুব্রত জাহাজের নোঙর নাড়ছে।
(২) বকুলের মালাটি কার?
(৩) বিশালতায় মহিষ বৃষের সমকক্ষ।
(৪) শ্রীশ বোকার চূড়ান্ত।

২। একটি মহিষের মূল্য৫৲ টাকা, একটী ছাগের মূল্য ১৲ টাকা ও একটি কবুতরের মূল্য।০ চারি আনা হইলে এই হিসাবে ১০০০৲ এক হাজার টাকায় একত্রে ১০০০ এক হাজারটি উপরোক্ত প্রাণী ক্রয় করিলে কি কি প্রাণী কয়টী হইবে এবং ইহাদের কত মূল্য হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকুমার নাথ পুরকায়েস্ত।

মাঘমাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। ফুটবল, ২। গতকল্য, ৩। লবণ, ৪। লোভ,

ফাল্গুন মাসের ধাঁধাঁর উত্তর :—

১।

'বর্দ্ধমান'

'পনেরই শ্রাবণ'

'দাসু'

তোমার লেখা পত্র আমি পাইলাম ভাই অদ্য,
কাকার খোঁজে সহর ঘুরে হ'লাম বেজায় হদ্দ।
মেশো মশাই দুর্গাচরণ এসেছিলেন কাল্‌কে,
কাল রাত্রেই আবার তিনি গেলেন চলে শাল্‌কে।
শ্রাবণ মাসেই ঝরছে কেবল বিরাম বিহীন বৃষ্টি,
চুপটি করে ভাবছি একি দারুণ অনাসৃষ্টি।
কেমন আছেন দাদা মশাই তাঁর তরে হয় ভাবনা,
বংশী লালে খবর দিও কেদার যাবে পাবনা।

ইতি
কাঙালীচরণ ঘটক

২। রাত্রি

গত মাসের ধাঁধাঁর কয়েকটি ছাপার ভুল হইয়া ছিল।

(২)

যাহাদের দুইটি ধাঁধার উত্তর নির্ভুল হইয়াছে :—

শ্রীপ্রভুলচন্দ্র সেন, ঢাকা ; শ্রীসুনীলকুমার গুপ্ত, ঢাকা ; নৃপে, গজে, সুরে, শৈলে, প্রবো, প্রভা, নিবা, হেম, ননী, সিদ্ধি, মনি, নলি, ও অনি, তেওতা একাডেমী ; শ্রীনিমাইচন্দ্র পাল, খিদিরপুর ; শ্রীকমলাকান্তপতি ঘোষ, শ্রীহরিচরণ ঘোষ, কলিকাতা; পীযূষকান্তি, ভবানিপুর ; শ্রীস্নেহলতা, ফুল্ললতা ও উমাদেবী, গিরিডি ; সুধীররঞ্জন অধিকারী, বর্দ্ধমান শ্রীবিশ্বজিৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ঢাকা ; কলিকাতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, বর্দ্ধমান ; শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, বীরভূম।

যাহাদের দুইটি ধাঁধাঁ প্রায়ই নির্ভুল হইয়াছে :—

শ্রীসুনীলকুমার, অমিয়কুমার, অনিলকুমার ও শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সিংহ, কলিকাতা ; শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, পরাজ ষ্টেশন ; তপেন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীসুবোধচন্দ্র, শ্রীসুধীরচন্দ্র ও জালিয়াহাটি লাইব্রেরীর মেম্বরগণ ; সৌরেন্দ্র, শৈলেন, সত্যেন, পঞ্চানন, গৌরী, ললিত, প্রফুল্ল, হরিদাস ও নলিনী, সৎকর্ম্ম সমিতি, গড়পার ; গৌরীপ্রসন্ন, সৌরেন্দ্রচন্দ্র, বিমল, পাঁচু গোপাল, ডমুরু, বকু, মদন, জটু ও মোহন, গড়পার ;

(৩)

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরোজপ্রসাদ, ভবানিপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও শ্রীমতী শিব-সুন্দরী দেবী, কুলচণ্ডা ; শ্রীশৈলেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বসু, অমরেন্দ্র ও অনিল সিংহ, তারকনাথ সরকার ও চুনিলাল ঘোষ, কলিকাতা ; গৌরী ও বিনয় কলিকাতা ; কেষ্ট ও ননী কলিকাতা ; রতনমণি ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা। বিশ্বেশ্বর, তারকেশ্বর, সুকুমার, প্রিয়মোহন, বিষ্ণু ও ভোলা, বরিশাল ; শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী সান্যাল, কলিকাতা।

যাহাদের একটি ধাঁধাঁ নির্ভুল হইয়াছে :—

শ্রীমতী সুষমাবালা ও প্রতিমাবালা ঘোষ, শালিকা ; শ্রীধারা গুপ্ত, বর্দ্ধমান ; শিশির মিত্র কলিকাতা ; নিলিমা, সুধীর, খেসু, গোপাল, নেপাল, নিমাই, বিজয়, কমলা, শঙ্করী, মনি জ্ঞানোদা, সরোজ, প্রকৃতি ও তারাপদ এবং প্রসন্ন মজুমদার, রংপুর ; শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কলিকাতা ; সুধীরচন্দ্র, সুমতী বালা, নয়নতারা ও সুবোধচন্দ্র, জালিয়াহাটি শ্রীঅজিতকুমার, অশোককুমার দত্ত, তারকনাথ মিত্র; কলিকাতা ; শ্রীলালবিহারী, দেবব্রত ও জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যয় এবং শৈলেন্দ্র গুপ্ত, হাওড়া ; শ্রীঅমিয়রতন, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ, বলাইাবা, ও নিমাইবাবু, সালিখা ; শ্রীরমেশচন্দ্র সোম, খুলনা ; অজিতকুমার মিত্র, কলিকাতা ; ছোটুকা, নহু, নলু, ও বানিয়া, গিরিডি ; শ্রীসুধাংশু নিয়োগী, দিনাজপুর ; শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, বর্দ্ধমান ; শ্রীশোভনাবালা, গোয়াবাগান ; শ্রীসরসীবালা, কলিকাতা ; বড়বাবু ও নিলি, গোয়াবাগান ; কুমারী মায়ালতা ঘোষ, কলিকাতা ; শ্রীমিহিরচন্দ্র, অমূল্য, নীহার, নিশীথ, দিজেশ, নিখিল, প্রভাত, কিরণ, সুনীল বিকাশ, অরুণ, কমলা, শচী, উমা, অনু, অপরাজিতা, মুক্তি, মানিমালা শিশির, শিবু, ও বিশ্বনাথ রায়, পাটনা ; শ্রীহরিপ্রসাদ রায়, নৈহাটি। কমলা দেবী, ম্যাণ্ডালে ; অমর, মেন্তু, মেনকা, খুনু, সুখেন, পূর্ণেন, সাধু, খোকন, সুরেশ, কানু, লক্ষ্ণৌ ; শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।

"কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল"—রবীন্দ্রনাথ

The Emerald Ptg. Works.

১ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ [একাদশ সংখ্যা

শিশুর আশা

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

১

আমরা যখন বড় হবো, হবো মস্ত বীর।
বিপদকালে টল্‌বেনা পা, রুধ্‌বো আঁখি-নীর।
সত্য পথে চল্‌বো সোজা,
ফেল্‌বো ঝেড়ে ভয়ের বোঝা,
মরণ মোদের ধর্‌বে চরণ, রাখ্‌বো উঁচু শির।
আমরা যখন বড় হবো, হবো মস্ত বীর।

২

আমরা যখন বড় হবো, হবো মানুষ খাঁটি।
জ্ঞানের তরে ছুট্‌বো ভবে ভুলে কান্নাকাটি।
দুঃখ বরণ করবো হেসে,
ঢুঁড়বো মাণিক দেশ্ বিদেশে,
পেরিয়ে যাবো সাগর পাহাড় ছেড়ে দেশের মাটি'
আমরা যখন বড় হবো, হবো মানুষ খাঁটি।

৩

আমরা যখন বড় হবো, ঘুচবে দেশের দুখ!
মোদের যশে জন্মভূমির উঠবে ফুলে বুক!
দেশের চাষার পূরবে আশা,
জ্ঞান বিলাবো, রইবে খাসা,
বাড়লে তাদের মনের আলো, তখন পাবে সুখ!
আমরা যখন বড় হবো, ঘুচবে দেশের দুখ!

৪

আমরা যখন বড় হবো, করবো সকল কাজ!
কাজের কাজী, মানুষ তেজী, কোথায় তবে লাজ!
বিদেশ থেকে ব্যবসা করি
আন্‌বো টাকা জাহাজ ভরি'
যেথায় সেথায় মিলবে মোদের পণ্য জগৎমাঝ!
আমরা যখন বড় হবো, করবো এমন কাজ!

৫

আমরা যখন বড় হবো, হবো কীর্ত্তিমান!
চল্‌বে নভে উড়ো-জাহাজ, স্থলে বাষ্প-যান!
মোদের গড়া বাষ্পীয় পোত,
সাত সাগরে তুল্‌বে যে স্রোত,
মিল্‌বে মকর-পোতের বলে অতলপুরীর দান!
এম্‌নি করে' আমরা আবার হবো কীর্ত্তিমান্!

৬

আমরা যখন বড় হবো, এক্‌শো হবো একা!
ভাগ্য শুধু ভর্‌সা ক'রে ছাড়বো স্বপন দেখা!
চাইনে কিছুই চরণ চেটে,
আমরা সুধা নেবো বেঁটে,
আমরা বিনে জগন্নাথের সকল কাজেই ঠ্যাকা!
আমরা যখন বড় হবো, এম্‌নি হবো একা!

বীর বালক পুত্ত

[শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য]

সে আজ বহুদিনের কথা, আকবর শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছিলেন। রাজপুতানার বীরভূমি মেবার। সেই মেবারের রাজধানী চিতোর নগরে একদিন একটি সভা বসিল। মেবারের রাজা দুর্ব্বল-চিত্ত মহারাণা উদয়সিংহ রাজপুত বীরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"বীরগণ! সম্রাট আকবর বহু সৈন্য লইয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা মেবার কাড়িয়া লইবেন।"

বীরগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কখনো না—কখনো না। আমরা প্রাণ দিব—মেবার দিব না।"

উজ্জ্বল তরবারিগুলি রাজপুত বীরদিগের হস্তে রবির করে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ ভল্ল লইয়া রাজপুত সেনাগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল—"আসুক মোগল, ভয় কি! আমরা প্রাণ দিব—মেবার দিব না।"

সম্রাট আকবরের সঙ্গে তখন রাজপুতের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শত শত মোগল সেনা মরিল—শত শত রাজপুত সেনার রক্তে প্রস্তরময় রণভূমি লোহিত হইয়া উঠিল।

(২)

ষোল বৎসর বয়সের বালক পুত্ত কহিলেন—"তোমরা না বীর? তবে আজ সূর্য্য-তোরণরক্ষক মহাবীর শহিদাসের জন্য রমণীর মত কাঁদিতেছ কেন। শহিদাস মরিয়াছেন—আমি আছি। আমি আজ সূর্য্য-তোরণরক্ষা করিব। দেখি, মোগল সেনা কেমন করিয়া চিতোরে প্রবেশ করে।"

ভেরী বাজিয়া উঠিল। ঘোর রবে রণডঙ্কার ধ্বনি হইল। রাজপুত বীরেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"আমরা লড়িব, হটিয়া মান দিব না।"

সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া সম্রাট আকবর মনে মনে বুঝিলেন যে, একটি রাজপুত জীবিত থাকিতেও তিনি চিতোর নগর জয় করিতে পারিবেন না।

পুত্ত বলিলেন—"মা, তোমার পায়ের ধুলা আমার মাথায় দাও। আমি আজ মোগলকে জয় করিতে যাইতেছি।"

পুত্তের জননী হাসিয়া বীর পুত্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তরবারি আনিয়া আপন হস্তে পুত্রের কটিতে বাঁধিয়া দিলেন। বীর-সাজে সজ্জিত পুত্র যখন নত জানু হইয়া মাতার চরণে মাথা রাখিলেন, তখন মা কহিলেন—"বৎস! তোমার পিতাও যুদ্ধেই প্রাণ দিয়াছেন, ভয়ে পলায়ন করেন নাই। যাও বৎস, হয় আজ যুদ্ধে জয়ী হইও, না হয় রণভূমেই চিরদিনের মত নিদ্রা যাইও।"

আবার ডঙ্কা বাজিল—ভেরীনাদ হইল—রাজপুত সেনারা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"জয় পুত্রের জয়।"

(৩)

পুত্রকে বিদায় দিয়া বীরবালা নিজে অসি লইলেন। পুত্তের পত্নীকে বলিলেন—"এসো মা, এই লোহার বর্ম্মে দেহ আচ্ছাদন করিয়া তরবারি হস্তে যুদ্ধে চল। আমার পুত্ত—তোমার স্বামী আজ রণ জয় করিতে গিয়াছে। তাহার বীরপণা দেখিবে চল।"

পুত্তের জননী এবং পত্নীকে যুদ্ধে যাইতে দেখিয়া চিতোরের নারীরা জয়নাদ করিয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ড বেগে মোগল সেনার দিকে ধাইলেন। মোগলে রাজপুতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

বীর বালক পুত্ত আর নাই। বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছেন। পুত্তের জননী এবং পত্নী আর নাই—পুত্তের পাশ্বেই প্রাণপাত করিয়াছেন। শত শত রাজপুত সেনার শোণিত তখন জলের স্রোতের মত বহিয়া চলিয়ছে! ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্‌শব্দে চিতোরের তোরণ মুক্ত হইল। বাঁধ ভাঙ্গিলে নদী যেমন ধায়, তেমনি ভীষণ বেগে আট হাজার রাজপুত বীর শত্রুর দিকে ছুটিয়া চলিল। কাহার সাধ্য যে তাহাদের গতিরোধ করে। মোগলের কামান ডাকিল গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্—

মোগলের তীর ধাইল শন্ শন্ শন্—মোগলের অসি ঝল্‌সিয়া উঠিল ঝক্ ঝক্ ঝক্। রাজপুতের একটা বাঁধবাঙ্গা পাগল নদী ছুটিয়া গিয়া মোগল সেনার উপর পড়িল।

বীর রাজপুত মরিতে জানিতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাতে জানিত না। তাহারা মারিল মরিল এখনও চিতোরে ফিরিল না। শোণিত রাঙ্গা পথে বিজয়ী আকবর যখন চিতোর নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, অসিশান হইয়াছে চিতোর ধুসে ঢাকা। সম্রাট শুনিলেন বীর নারীরা মান বাঁচাইতে সেই আগুণে পুড়িয়া মরিয়াছেন!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেরিয়া আকবর আপন মনে বলিলেন—'রাজপুতেরা আজ মরিয়াই মোগলকে জয় করিল!'

(৫)

এই ভয়ানক যুদ্ধে যত রাজপুত মরিয়াছিল, সম্রাটের আদেশে তাহাদের যজ্ঞোপবীত সংগ্রহ করিয়া আমা হইল। সেকালে চারিসেরে একমণ ধরা হইত। বীরের যজ্ঞপবীত ওজন করিয়া দেখা গেল সাড়ে চুয়াত্তর মণ (৭৪) হইয়াছে। সম্রাট বলিলেন—"আজ হইতে যাহার পত্রের পিছছে ৭॥০ লেখা থাকিবে, মল্লিক ভিন্ন অপর কেহ যেন সে পত্র না খোলে। এই আদেশ যিনি অবহেলা করিবেন, চিতোর ধ্বংশের সকল পাপ তাঁহাকে লাগিবে!"

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই চৈত্র রবিবার এইরূপ চিতোর ধ্বংশ হইয়াছিল; তাহার পর অতদিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো লোখের সে দুঃখের কথা ভোলে নাই। এখনো অনেক গোপনীয় পত্রের পশ্চাতে লিখিয়া দেয় ৭৸॥০; তাহারা মনে করে উহা লিখিলেই মালিক ভিন্ন আর কেহ সে পত্র খুলিবে না।

চিত্রকর

— চার —

তয়কং তখন ভাই জয়কংএর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে,—চাং এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে রিন্‌টিনের মা'র কাছে গিয়ে তুলি, রং ইত্যাদি আঁকবার সরঞ্জাম কেনবার পয়সা চেয়ে নিলে ও রিন্‌টিন্‌কে তার কাছে আধ ঘণ্টার পরে পাঠিয়ে দিতে বল্লে।

আধঘণ্টা পরে চাং ঐ সব জিনিষ কিনে ঘরে ফিরে দেখলে রিন্‌টিন্ এসে হাজির হ'য়েছে।

চাং তাকে ঘরের বাইরে খোলা মাঠের ওপর কুকুর জিংকে পাশে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে বল্লে।

রিন্‌টিন্‌ও তৎক্ষণাৎ চাংএর কথা মতো জিংকে নিয়ে মাঠের ওপর বসলে।

চাং পেন্সিল নিয়ে চট্‌পট রিন্‌টিন্ ও জিংএর সেই অবস্থায় একটা স্কেচ্ একে ফেল্‌লে। স্কেচ হয়ে গেলে চাং নিজে রিন্‌টিন্‌কে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল।

তারপর পাঁচদিন ধ'রে একটানা সে ছবিতে রং ফলাতে লাগলো। এই রকম পরিশ্রম ও উদ্যমের পর যখন ছবি শেষ হ'ল তখন তার দেহ ক্লান্তির অবসাদে পূর্ণ।

*   *   *   *   *

প্রকাণ্ড হল ঘর প্রতিযোগিতার ছবিতে ভ'রে গেছে; পুরস্কার যোগ্য ছবি নির্ব্বাচন করবেন জয়কং নিজেই।

সেদিন কী ভীষণ তুষার পাত হচ্ছিল! ঠাণ্ডা বাতাস চঞ্চল চরণে যাতায়াত করছিল

চাং সেই তুষারপাতের মধ্যে জিংকে নিয়ে অট্টালিকার বাইরে দরজায় ব'সে ছিল ; ভেতরে তার প্রবেশ করতে সাহস হচ্ছিল না, শুধু ভয়কং এর ভয়ে—

অবশেষে ভেতরে বোকাবং এর চীৎকার শোনা গেল,—'কেল্লা ফতে ! আমিই প্রাইজ পেয়েছি।"

চাং এর কানে বোকা-বং এর সেই উল্লাস চীৎকার গরম শীসের মতো বোধ হল।

সে আর বসতে পারলে না, মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে অবিশ্রান্ত তুষার পাতের ভেতর দিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

কিন্তু সে বেশীদুর অগ্রসর হতে পারলে না, পা অবশ হয়ে যাওয়াতে সে বরফের ওপর শুয়ে পড়লো।

এদিকে চাং এর ছবি যে টেবিলের ওপর ছিল, সেখান থেকে পড়ে গিয়ে সেটা আশ্রয় নিয়েছিল সেই টেবিলটার পাশেই।

একজন কর্ম্মচারী সেই ছবিখানা দেখ্‌তে পেয়ে জয়কং এর কাছে নিয়ে গেল ; জয়কং এর চোখদুটি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে আপন মনেই বলে উঠলো— "এই কিশোর ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হবে, এ আমি এখন থেকে বলে রাখলাম।

তারপর সে উপস্থিত লোকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে বলে উঠলো— "পুরস্কার বোকা বং পেতে পারে না, এই ছবির চিত্রকর পুরস্কার যোগ্য"

সকলে চিত্রকরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে, তারা ভাবতে লাগলো —কে এই সোভাগ্যবান বালক-শিল্পী।

জয়কং হল ঘর প্রকম্পিত করে বল্লে—"চাং" তার গম্ভীর স্বর সমস্ত হলটায় প্রতিধ্বনিত হল—"চাং"

চাং এর বাড়ীতে তাকে না দেখতে পেয়ে জয়কং চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাতে লাগলো।

চাংকে যখন লোকজন জমীদার বাটিতে নিয়ে এলো, তখন জয়কং চাংএর আকা ছবিটা ভয়কংকে দেখিয়ে বলছিল—এই বালক কালে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হবে, এক একটি এর হাতের আচড়ের দাম—

এমন সময় চাংকে ঘাড়ে নিয়ে লোকজন ঘরে প্রবেশ করলে ; পেছনে জিং ও জিভ বের করে হাঁফাতে হাঁফাতে এলো।

জয়কং চিকিৎসক আনিয়ে চিকিৎসা করালে, দুই একদিনের ভেতরই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

সুস্থ হ'য়ে উঠলে জয়কং ভয়কংএর সামনেই চাংকে বল্লে "তুমি আমার সঙ্গে রাজধানীতে গিয়ে আমার কাছেই ছবি আঁকা শিখবে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমার নিজের কোন ছেলে মেয়ে নেই, তুমি ছেলের মতোই থাকবে। তোমাকে আমি এম্নি উচুদরের শিল্পী করে দোব যে সারা জগতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। আর তোমার পুরস্কার নাও,"—

এই বলে জয়কং একটি কয়েক হাজার মুদ্রার থলে চাংএর হাতে দিলে।

ভয়কং চাংকে বল্লে—"তোমার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করিনি, এ জন্য আমি লজ্জিত; যাক্ সে সব ভুলে যাও। আমি এখন তোমার প্রতিভা জানতে পেরেছি। তুমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে শিক্ষা শেষ করে যখন আসবে, তখন তোমার হাতে আমি রিন্‌টিনকে সমর্পণ ক'রবো এবং ভবিষ্যতে জমিদারীর মালিক হবে তুমি।"

চাং ভাবছিল—এ স্বপ্ন না সত্য।

হঠাৎ শোনা গেল একদিন পরে জয়কং সেই সহরে তার ভাইএর কাছে আস্‌ছে। সমস্ত সহরটা ভেঙ্গে পড়লো তার সম্বর্দ্ধনা করতে।

যখন তার গাড়ী সহরের পথের মাঝখানে ভীড়ের জন্য আট্‌কে গেল—অগ্রসর হ'তে পারলে না; তখন জয় কং গাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালো ও তার এইরূপ সম্মানের জন্য সে স্বদেশবাসীদের ধন্যবাদ দিলে।

তারপর যখন সে চেঁচিয়ে বল্লে,—"মহাশয়গণ! আমি ছেলেমেয়েদের জন্য যে কোন বিষয়ে একটা ছবি আঁকার পুরস্কার প্রতিযোগিতা দিব যা'র ছবি ভাল হবে তাকে আমি এরকম পরিমাণে টাকা দিব যাতে সে চিরদিন সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। তখন জনতার ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল।

চা' ও সেই ভীড়ের মধ্যে ছিল,—ঐ কথা শুনে তার প্রাণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। সে ভাবলে কেন, সে যদি চেষ্টা করে, তা হলে কি তার পাবার কিছুমাত্র আশা নেই? না, সে একবার চেষ্টা করবে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

চাংলিস্ খড়ি দিয়ে ছবি আঁকছে।

প্রার্থী

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

আমি যদি হই রাণী
তুমি হবে কি ?
জীবনের সাথী জানি
বরি লবে কি ?
রাণীর যে সাথী হয়
তার আশ্‌ কি ?
স্নেহে শুধু ঘিরে রয়
সদা পাশ্‌টি ;
বুঝিয়াছি তুমি খোঁজো
ধন জন্‌ যে
কেন মিছে ভুল বোঝো
চাই মন্‌ যে।

মিঞা তানসেন।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন]

সেকালে মিঞা তানসেনের ছিল ভারত-জোড়া নাম; তিনি ছিলেন আকবর বাদশাহের একজন দরবারী গায়ক। তাঁর রাগ রাগিনীর সুমিষ্ট আলাপে বনের পশুপক্ষীও আত্মহারা হোত! তিনি বাদশাহের হৃদয় কিনে নিয়েছিলেন একটি মাত্র গানে! সেই দিন থেকে বাদশাহের ঠিক সিংহাসনের নীচেই পড়্লো গায়ক্ তানসেনের আসন। আর তাঁর উপাধি হোলো মিঞা তানসেন। বাদশাহের দরবারের শত শত হীরা মণিমুক্তার চেয়ে ও মূল্যবান জিনিষ ছিল তানসেনের গান;—কাজেই বাদশাহ সেই গানের মূল্য দিয়েছিলেন একমাত্র আপনার হৃদয় দিয়ে! তানসেনও সুরে সুরে বাদশাহের অন্তর ভরে দিয়েছিলেন।

আকবর বাদশাহের বুদ্ধি পরাক্রমের কথা ইতিহাসে যেমন অমর হয়ে রয়েছে, মিঞা তানসেনের গানে সুরও তেমনি ভারতবর্ষে চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ কর্‌বে।

পশ্চিমের বড় বড় ওস্তাদের সভায় আজকালও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ঘটে। ওস্তাদেরা যখন—"আল্লা, আল্লাকি রসুল কি নেয়াজ" এই বলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ যাঞ্চা করেন, তখন ঘরের ভিতর ধূপ-গুগ্‌গুলের সুগন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠে। তারপর ওস্তাদেরা পূর্ব্বেকার সঙ্গীতগুরু রামদাস, সুরদাস, বক্সু, তানসেন, গোপাল ছেজুখাঁ, ধক্সূ ও অন্যান্য সঙ্গীত গুরুর নাম কীর্ত্তন করেন।

গোয়ালিয়রে এক হিন্দু-পরিবারে তানসেনের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ব্বের নাম তান মিশ্র। তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় পিতামাতা পুত্রের সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় পান। বাল্যকালেই বালক নিজের রচিত গান শুনিয়ে সকলকে মোহিত করত। তিনি বড় হোলে তাঁর পিতামাতা তাঁকে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ ফকির শাহ, মহম্মদ গোয়াসের নিকট নিয়ে যান এবং ভবিষ্যতে তাঁদের পুত্র যাতে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক হ'তে পারেন তজ্জন্য ফকির সাহেবের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন।

তানমিশ্রের যশ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আকবর বাদশাহ এই তরুণ গায়কটিকে নিজ দরবারে নিয়ে যাবার জন্য একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন। তানমিশ্র ছিলেন তখন রেওয়ার রাজারামের দরবারের প্রধান গায়ক।

বাদশাহের সঙ্গে তানমিশ্রের পরিচয়ের পরই গায়কের ভারত-জোড়া নাম চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়লো। বাদশাহের দরবারে তানসেনের গানের সম্পর্কে এত বিচিত্র রহস্য সব জড়িত আছে, যে তার সকল কথা প্রকাশ করতে হোলে একখানা প্রকাণ্ড বই হয়ে পড়ে।

আকবরের পূর্ব্বে গোয়ালিয়র শহরটি সঙ্গীত চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল্। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ নিজে একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা গায়িক ছিলেন। রাজা মানসিংহই ধ্রুপদ গানের পূর্ণতা সাধন করেন; সঙ্গীত বিশারদ নায়ক বক্সুর সহায়তাও তিনি এ বিষয়ে প্রাপ্ত হন।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহের দরবারে আরো কয়েকজন ভারত-প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, । তাঁদের ভিতর অগ্রগণ্য ছিলেন, নায়ক, সুরদাস, রামদাস ফকির বক্সু, হরিদাস স্বামী ও তানসেন। অন্য সকলেরই যদিও সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু মিঞা তানসেনের মত এমন ভারত-জোড়া যশ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে-নি।

মিঞা তানসেন ছিলেন, হরিদাস স্বামী ও নায়ক বক্সু—এই দুইজন প্রধান ওস্তাদের সাক্রেদ্ তানসেনের চারিপুত্র,—তানতরঙ্গর, মানতরঙ্গ, সুরতসেন ও বিলাস খাঁ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তানসেন অনুরোধ করেন, তাঁহার মৃতদেহের যেন তাঁর-ধর্ম্মগুরু মহম্মদ গিয়াসের পার্শ্বে কবর দেওয়া হয়। গোয়ালিয়রে তাঁর গুরুর পার্শ্বেই মিঞা তানসেনও পাশাপাশি তাঁর দুইপুত্রের কবর এখনো বিদ্যমান আছে।

আজকাল যে সকল গায়ক মিঞা তানসেনের কবর দর্শন করতে যান তাঁরা সকলেই কবরের উপরের নিমগাছের পাতা কুড়িয়ে আনেন। সেই পাতা গায়কেরা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন; তাঁদের বিশ্বাস তা হোলে তাঁদের গলার সুর উৎকৃষ্ট হবে।

সঙের গান

[শ্রীসুনির্ম্মল বসু]

আমরা সবাই সং
জবর রকম পোষাক মোদের
দেখ্‌তে জবর জং।
আর আজব রকম স্বভাব মোদের
আজব রকম ঢং।
মোদের ঢলো ঢলো রূপের ছাঁদে
লাজে চাঁদের পরাণ কাঁদে
নিখুঁৎ মোদের চেহারা ভাই
(শুধু) একটু কাল রং।
১। আমি নাচ্‌তে এবং গাইতে পারি
২। আমার বাঁশীর আওয়াজ মিষ্টি ভারি
৩। আমি কাজের মধ্যে ঘণ্টা বাজাই
ঢং ঢঙা ঢং ঢং।
বিদ্যেতে ঢের এগিয়ে গেছি
অ, আ, ক, খ, শেষ করেছি
বিদ্যের দৌড় দেখে গুরু
একেবারে টং।
খাবার মোদের বাহার ভারি
আস্ত পাঁঠা গিল্‌তে পারি
পাইনা বলে' খাইনা এখন,
হয়েছি সোহং।

বাংলা মুলুক ঘুরে ফিরে
চিন্‌লনা কেউ এ কয়টিরে
তাই বাংলা ছেড়ে এবার মোরা
চলেছি হংকং।

ক্যাংলা ছোঁড়া—কিপ্টে ছিদাম

গল্প)

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

পিঁপড়ের পেট টিপে চিনি বের করে সারা বছরের মিষ্টি খরচ চালায়—এমনি কিপ্টে নাকি তার স্বভাব। গ্রামের যে সব চাইতে থুথ্‌বুড়ে বুড়ো সেও হলফ করে বল্‌তে পারে না জন্মের পর থেকে ছিদেমের বাড়ীতে কেউ পাতা পেতেছে কি না।

গ্রামের শেষটায় তারি মতো চোখে ছানি পড়া হল্‌দে পাতাওয়ালা সরু সরু ব ক্যালা একটা মান্ধাতা আমলের বট গাছের তলায় মেঠাইয়ের দোকান চালিয়ে ছিদেম দিন গুজরান করে!

কিন্তু হ'লে হ'বে কি দুষ্টলোকে রটিয়ে বেড়ায় ছিদেমের দাওয়ার নীচে নাকি ঘড়া ঘড়া কাঁচা টাকা পোতা। চোরদের সুবিধে নেই। বুড়ো সারা রাত খক্‌ খক্‌ করে কাশে আর গুড়ুক গুড়ুক তামাক খায়।

পাশের গ্রামের তিনটে ক্যাংলা ছোঁড়া ছিদেমের দোকানের পাশ দিয়ে পাঠশালে যায় আর তেল চট্‌চটে বারকোসের ওপর সাত ভ্যাজালে তেলে ভাজা ধূলো মাখা জিলিপির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ চাটে।

শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে ছোটটা বল্লে, ভাইরে বুড়োর চোখে ধুলো দিয়ে পোড়া মুখে দুটো জিলিপি দিতে পারবো না দাদা ?

মেজোটা কথাটা শুনে বল্লে, তাইতো ? বুড়োটা ভাল মানুষটী ক'রে কি মরবে না ভাই।

বড়টা বল্লে, আরে বোকা, বুড়োই যদি মরলো তো জিলিপি আসবে কোত্থেকে ?

তাই শুনে ছোটটা মাটীতে এক লক লাল ফেলে বললে হ্যাঁ দাদা, যা করবার বুড়ো বেঁচে থাকতে থাকতেই করে নাও। আমার যে আর সয়না রে দাদা—

এই বলে ছোটটা সত্যি সত্যিই কান্না সুরু করে দিলে।

বড়টা তাকে ধমক দিয়ে বল্লে, আরে ব্যাটা বোকা কোথাকার কান্না সুরু করে দিলি যে—

ছোটটা হাতের পোঁছায় জল মুছে বল্লে, বল্ ভাই বল কি করতে হ'বে—

বড়টা বল্লে,—দ্যাখ কথা যখন তুলেছিস তখন তোদের বলে রাখলুম—যে করেই হোক কিপ্টে ছিদেমের দোকান থেকেই জিলিপি খাবই খাবো।

দেখাদেখি মেজোটাও কোমরে কাপড় জড়িয়ে ফোক্‌লা দাতে হাসি এনে বল্লে, আর আমিও বলে রাখছি—জিলিপি যদি না খেতে পারি ত আমার নাম হাঁদা পরামাণিকই নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা শাস্ত্রেই নাকি লিখেছে আমরাই হচ্ছি মনিষ্যির মধ্যে ধূর্ত্ত বেশী।

সব শুনে ছোট্টটা আর এক ঝলক্ লাল ফেলে বল্লে,—তোরা যদি সত্যি বল্লিরে দাদা তবে আমিও বলে রাখলুম হুঁ—ও তোদের জিলিপিও খাবো, আর ঐ যে ব্যাটার দুধ আনবার পেতলের ঘঠ ওটাও নিয়ে আসবো। আর পয়সা দেব ঢু ঢুঁ—এই বলে সে দুহাতের দুটো বুড়ো আঙ্গুল বড় আর মেজোর নাকের সাম্নে তুলে ধরলে।

পরদিন ইস্কুলের ছুটি হ'তে তিন কাংলা গিয়ে ছিদেমের দোকান ঘরের ভাঙা তিন টুল টেনে বসে হুকুম করলে বাসি নয় আজকের টাট্‌কা গরম গরম জিলিপি চাই—

নতুন গায়েক দেখে ছিদেম ত শালপাতা সরিয়ে রেখে মাচা থেকে মাটীর

থালায় জিলিপি সাজিয়ে দিলে। ভাঁড়ে জল গড়িয়ে দিয়ে আরো ফরমাসের আশায় বাছাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বড়োটা যখন দেখলে পাতে আর একটি জিলিপিও পড়ে নাই তখন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—দাম দিলুম তবু আবার দাম চাইছ কোথাকার বেল্লিক হে তুমি?

ছিদেম হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাস্তা দিয়ে এক বুড়ো ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিল বুড়োটা তাকে ডেকে বল্লে, শুন্‌ছেন মশাই!

বুড়ো এগিয়ে এসে শুধোলে কেন কি হয়েছে?

বড়টা বল্লে দেখুন না মশাই মেঠাই খেয়ে দাম দিলুম তবু ব্যাটা বলে দাম দাও।

এতক্ষণে ছিদেমের মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ল বল্‌লে,—কৈ বাবু, তুমি তো দাম দাও-নি—

বুড়োটা চোক পাকিয়ে বল্লে, দেখ্‌লেন মশাই, দেখ্‌লেন ব্যাটার কথা শুন্‌লেন—

বুড়ো দোকান ঘরে ঢুকে ছিদেমকে বল্লে, তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন হে—ছেলে-মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিতে চাও—এ তোমার কেমন ধারা দোকান-দারী?

হঠাৎ হাউ হাউ কান্নার শব্দ শুনে পেছন ফিরে বুড়ো দেখ্‌লে আর একটি ছেলে কান্না সুরু করে দিয়েছে।

বুড়ো তার কাঁধে হাত রেখে বল্লে,—তুমি আবার কাঁদছ কেন হে?

মেজোটা দু'হাতে চোখের জল মুছে বল্লে, মশাই ঐ ভদ্রলোককে আমি নিজে পয়সা দিতে দেখেছি তারই যখন এই অবস্থা আমায় তো কেউ পয়সা দিতে দেখেনি তখন আমার যে কি হ'বে তাই ভেবে আমি চোখে আঁধার দেখছি।

কান্নাকাটি শুনে ততক্ষণে দোকানের সাম্‌নে বিস্তর লোক জড় হ'য়ে গেছে। একেই তো কিপ্‌টে ছিদেমের ওপর সকলে হাড়ে হাড়ে চটা তার ওপর ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবার ফন্দি!

মার মার শব্দে সকলে ছিদেমের ওপর গিয়ে পড়্‌ল। সে কি মার!

ছোটোটি ভতক্ষণে পেতলের খটটা নিয়ে রওনা হ'য়েছে।

ছিদেম মার খেতে খেতেই চেঁচিয়ে বল্লে ওকি ওটা নিয়ে যাও কোথায়?

ছোটোটা মুখ খিঁচে বল্লে, হ্যাঁ বল এটাও তোমার।

ছিদেমের মুখে আর রা নেই।

তিন ক্যাংলায় যখন সদর রাস্তা পেরিয়ে আম বাগানের আড়ালে পৌঁছল, বড়টা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দুহাতে মেজোকে আর ছোটোকে ধরে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলো।

ছোটোটা চেঁচিয়ে বল্লে, ওরে দাদা আস্তে আস্তে। নাচ্ থামিয়ে বড়টা বল্লে—কেন রে কি হল?

ছোটটা মুচ্কি হেসে বল্লে,—পড়ে যাবে যে—বড়টা বল্লে কিরে?

ছোটটা পেতলের খটটার মুখ খুলে দেখলে—একেবারে রসগোল্লায় ভর্ত্তী!

সেজোটা বল্লে, কখন আন্লি?

ছোটটা বল্লে, যখন তুমি কান্নাকাটি কচ্ছিলে আমি তখন টপাটপ্ ভর্ত্তী করেছি।

বড়টা ছোটটার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে,—ভাইরে—

ছোটটা চোখ পিট পিট করে বল্লে,—

—দাদারে—!!

পুরস্কার

(গল্প)

[শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়]

······উঃ—মেলার আর মোটে তিন দিন বাকী···

গীতা উত্তেজনায় আপনার মনেই বলে উঠল উঃ···মেলার আর মোটে তিন দিন বাকী······

ইতিমধ্যেই তিন মাইল জায়গা জুড়ে মেলার জন্য তাঁবু আর দোকানদারদের ক্ষণস্থায়ী ঘর তৈরীর আয়োজন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল। ঠিক্ মাঝখানে, একটা সবুজ ঘাসের গোল মাঠ, গীতা ও অন্যান্য গ্রাম্য বালিকার নাচবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মেলার অধিকারী প্রতি বৎসরই নাচের জন্য পুরস্কার দিতেন।

গীতা বাড়ী হ'তে বের হয়ে গেল···যেতে যেতে তার কেবল নাচবার ভঙ্গী ও মাসীর প্রতিশ্রুত কাপড়ের কথা মনে পড়্‌তে লাগল, আনন্দাতিশয্যে সে প্রায় একটা বড় ব্যাঙকে মাড়িয়ে ফেলেছিল আর কি···সেটা, রাস্তার উপর পড়েছিল। সে বল্লে··· আহা ব্যাঙ মশাই···তুমি এখানে কি কর্‌ছ? তুমি দেখ্‌ছি তোমার বাড়ী থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছ!

এ-কথা বলে সে যত্নের সহিত ব্যাঙটাকেও তুলে নিয়ে আবার কাদের পুকুরের দিকে ফির্‌ল···তখন প্রায় খাবার সময় হয়ে এসেছিল···সুতরাং গীতার খুবই খিদে পেয়েছিল। এই যে···এখন তুমি নিরাপদ বলে গীতা ব্যাঙটাকে পুকুর পাড়ে নামিয়ে দিলে। ব্যাঙ্ মশাই তখন আনন্দে এক কর্কশ চীৎকার করে পুকুরে লাফিয়ে পড়লেন ও আগাছার মধ্যে গা ঢাকা দিলেন।

* * *

খেতে খেতে গীতার মাসীমা বলে উঠলেন···খেয়ে উঠে আবার ঠাকরুণ-

দিদিকে দেখতে যেতে হবে, আহা তাঁর বড় অসুখ···আমার ইচ্ছা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করি।

গীতা বল্লে···নিশ্চয়ই···আহা বুড়ী ঠাকরুণদিদি।

···তাঁর ওষুধ-বিষুধ, দুধ, সাগু ডাক্তারের খরচ আছে এই পর্য্যন্ত বলে' মাসী ইতস্ততঃ করে বল্লেন···গীতা আমি তোমার জন্যে মেলার সময় কাপড় কিন্‌লে ত আর তাঁদের সাহায্য কর্ত্তে পারি না।

গীতা কেঁদে উঠল···মাসী আমার কাপড় চাই-ই।

···তাহলে হয়ত ঠাকরুণদিদিকে ওষুধ অভাবে মর্‌তে হ'বে।

গীতা বল্লে···না—না আমি এত স্বার্থপর হব না···মাসীমা, আমি সেই গেল বছরের কাপড় পরেই না'ব।

মাসী ধীর ভাবে বল্লেন, আমি জানতুম তুই একথা বলবি।

* * *

তার পরদিন সবে ভোর হয়েছে গীতা বেড়াতে বেড়াতে সেই পুকুর ধারে পৌছল···সেখানে সেই ব্যাঙ মশাই দিব্যি আরাম করে পদ্মপাতার উপর বসে প্রভাতী গান গাইছিলেন। গীতা যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে বল্লে···ওগো ছোট্ট মেয়ে! ছোট্ট মেয়ে! শোন···তুমি এই পুকুর ধার দিয়ে বরাবর লালকুঠীতে যাও সেখানে দাঁড়িয়ে কি মজা হয় একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে।

গীতার কৌতূহল বেড়ে গেল···আর এদিকে ব্যাঙ মশাই পদ্মপাতার ওপর উঠে আবার গলা ফুলিয়ে গান ধরলেন···যেন কিছুই হয়-নি।

গীতা লালকুটী খুব ভাল রকমই জানত। সেবার ত দেওয়ালীর সময় ঐ বাড়ীটায় কি কাণ্ডই না হয়েছিল আহা! সেই ছোট্ট ছেলেটা পুড়ে গেল, কত ডাক্তার এল। সুতরাং সে জোরে গিয়ে সেই বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই চাপা গলার হাসি শুন্‌তে পেয়ে সে চেয়ে দেখলে একটা ছোট মানুষ তার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে। তার হাতে একটা সুন্দর কাপড়। সে লোকটা আরও একটু এগিয়ে এসে বল্লে···এগুলো তোমারই···তুমি সেই ব্যাঙটাকে কি যত্নই না করেছিলে···তুমি তা'কে তুলে না নিলে সে হয়ত মরেই যেত। আমিই রোজ পুকুরের ব্যাঙেদের খবর নিই—

আমিই দু'হাতে জগতের কালো ঘোমটা খুলে দিয়ে হাসি খুসি মাখা দিনকে মুক্তি দিই। আমাদেরই কোমল আঙুলের পরশে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায় বুঝলে ক্ষুদে মেয়ে বুঝলে...

গীতা তখন অন্যমনস্কে কাপড় দেখছিল, তার একটু রাগও হচ্ছিল ক্ষুদে মেয়ে বলায় সে কাপড়ের মোড়ক খুলে বলে উঠল—মাসীমা ত এই রকমই দেবেন বলেছিলেন ...বাঃ—তোমার জন্যে পেলুম—। এই বলে চেয়ে দেখলে যে ছোট্ট মানুষটি আর নেই, হাওয়ায় মিশে গিছল বোধ হয়।

* * *

মেলাতে গীতা নাকি ঠিক্ পরীদের মতন নেচেছিল...এমন কি যখন তার সঙ্গীরা নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তখনও সে নাচছিল। তোমাদের কি আর বলে দিতে হবে যে গীতাই অধিকারীর প্রতিশ্রুত পুরস্কার পেয়েছিল।

———

পেটুক গদাই

(গল্প)

[শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাশ গুপ্ত।]

ঘোষেদের গদাইর মত পেটুক ও বোকা সে গ্রামে আর কেউ ছিল না। কতবার সে কত শাস্তি পেয়েছে তবু ও তার লজ্জা হয়নি। সে দিন সে বেশ জব্দ হয়েছিল। দই ভেবে সে চূণের হাঁড়ি থেকে চূণ খেতে আরম্ভ করেছিল তার পর আর কি। তিন দিন, তিন রাত্রি তাকে বিছানায় প'ড়ে থাকতে হয়েছিল; তবুও তার পরদিনই সে আবার মুখুয্যেদের আম গাছে আম চুরি করতে উঠে ছিল তার পর গাছ থেকে প'ড়ে একমাস বিছানায় শুয়ে ছিল। এই দস্যি ছেলের উৎপাতে গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে এই গদাই ও কি ক'রে একেবারে ভালছেলে হয়েছিল সেই কথাটাই আজ তোমাদের বলব। সে দিন শনিবার নীল আকাশের কোলে কোলে মেঘের দল এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল। অল্প অল্প বৃষ্টি হ'চ্ছিল। সন্ধ্যার পর গদাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল ও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে, মুখুয্যেদের বাগানের মধ্যে ঢুক্‌ল ঘোর অন্ধকার কিছুই চোখে দেখা যায় না। গদাই আস্তে আস্তে গিয়ে ঘোষেদের পেয়ারা গাছে উঠে পড়্‌ল।

মুখুয্যেদের উড়ে চাকর রাম সিং তখন পেয়ারা গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাদুর তাড়াচ্ছিল। একটা মানুষকে আসতে দেখে রাম সিং নিকটে এক ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাল। গাছে উঠে গদাই মনের আনন্দে যখন পেয়ারা চিবচ্ছিল তখন রাম সিং চীৎকার করে বলে উঠল "গাছে কে"? গদাইর প্রাণ উড়ে গেল। গাছের উপর বসে ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। রাম সিং তখন তার হাতের মশালে আগুন ধরিয়ে উঁচু করে ধরে বল্‌ল, "নেমে আয় বলছি", ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গদাই গাছ

থেকে নেমে পড়ল। রাম সিং তখন তাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেল্লে। তার পর যা হ'ল তা শুন্‌লে তোমাদের ও চোখে জল আসবে। তবে সে দিন থেকেই গদাইর একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, তার পর আর কেউ গদাইকে কখনও চুরি করতে দেখেনি। কিন্তু রাম সিংএর লাঠীর আঘাতে তার যে পাখানা ভেঙ্গে গিয়েছিল, আর তা যোড়া লাগেনি।

প্যাঁচার জন্ম-কথা।

(হিন্দুস্থানী গল্প)

শ্রীসুকোমল বসু।

অনেক কাল আগে এক ধার্ম্মিক ও প্রতাপশালী রাজা বাস ক'রতেন। তাঁর সৈন্য সামন্ত, লোক লস্করের অভাব ছিল না। প্রজারা রাজাকে পেয়ে যেমন সুখী ছিল; রাজাও তাদের ভালবেসে তেমনি সুখ পেতেন, রাজ্য জুড়ে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যে'ত।

এমনি ক'রে ত দিন কেটে যাচ্ছিল।......হঠাৎ একদিন রাজার কানে এল—তাঁর একদল শত্রু তাঁর রাজ্যের একটা সীমান্ত জয় করবার মতলব ক'রেছে। শুনেই, রাজা সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে আদেশ করলেন। মুখের কথাটি না খ'সতেই সৈন্যরা যুদ্ধের পোষাক প'রে ঝকঝকে তলোয়ার হাতে সারি দিয়ে দাঁড়াল। রাজ্যের পুরোহিতেরা শত মুখে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল।

এমনি ক'রে ত রাজা সৈন্যদের নিয়ে শত্রুদের বিনাশ করবার জন্য বেরিয়ে প'ড়লেন। কত মাঠ পেরিয়ে, কত গ্রাম ছাড়িয়ে তাঁরা ত শেষে শত্রুদের দেখা পেলেন। রাজার ধারণা ছিল—শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা অল্প; তাই সঙ্গেও অল্প সংখ্যক সৈন্যই এনেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পর রাজা নিরাশ হ'লেন; শত্রু

পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার সৈন্যদের হারিয়ে দিল। তখন সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে গেল—তাদের রাজার যে কি অবস্থা হ'ল তা একবার ভেবেও দেখল না।...সৈন্যরা ছুটতে ছুটতে এক গভীর বনের মধ্যে এসে প'ড়ল। কি জানি কেন তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল, তারা দে'খল একটা প্রকাণ্ড মোটা গাছ তার ডাল পালা ছড়িয়ে রয়েছে, আর সেই মোটা মোটা ডালগুলির গায়ে মস্ত মস্ত গর্ত্ত, যা তাদের আশ্রয় দিয়ে অনায়াসে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা ক'রতে পারে। তারা ত সকলে এক একটা খোপে আশ্রয় নিলে। সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে যখন দে'খল—দিনের আলো নিভে গেছে তখন তারা সাহস ক'রে বেরিয়ে এসে খাবারের সন্ধানে ঘুরতে লাগল। এমনি ক'রে শত্রুদের ভয়ে তারা সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে খাবারের সন্ধানে বের হয়। কিন্তু তবু তাদের ভয় ক'মল না—যদি রাত্রেই শত্রুরা এসে পড়ে; সেই ভয়ে সেদিন থেকে তাদের একজন প্রথম কোটর থেকে বেরিয়ে দেখে—যখন কেউ নাই তখন সে চীৎকার ক'রে ডাকে আর তাই শুনে অন্য সৈন্যরা সাড়া দেয়।

একদিন তারা রাত্রে খাবারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ন্যাসীর কুটীরের কাছে এসে প'ড়ল, আর তাদের ক্ষুধিত চোখ সেই কুটীরের গায়ে লাগান একটা লিচু গাছের উপর আকৃষ্ট হ'ল। তারা সমস্বরে বলে উঠল—আঃ, কি সুন্দর এই ফলগুলি! তাদের একজন যেমনি সেই ফল তুলতে এগিয়ে এসেছে, অমনি সেই কুটীর থেকে এক সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে বলে উঠল—"পাপিষ্ঠ, নরাধম, তোরা তোদের ধার্ম্মিক' হিতাকাঙ্ক্ষী রাজাকে শত্রুর মুখে ফেলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বনে এসে লুকিয়েছিস্! যা, আজ থেকে তোদের মনুষ্য জন্ম গেল; চিরদিন তোরা শত্রুর ভয়ে মরবি। আর যেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছিস্ ঠিক তেমনি ভাবেই তোদের দিন কাটবে; যা, আজ থেকে তোরা পাখী হয়ে গেলি......। সন্ন্যাসীর কথা শেষ হতে না হ'তে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল, একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল—হায়! একি! কোথায় তাদের সেই বিশাল সুন্দর চেহারা! মাথায় আর চুল নাই, সেই নরম ঠোঁটগুলি লম্বা হয়ে গেছে। শরীরের উপর লম্বা লম্বা লোম! দুটো ডানা! সত্য সত্যই পাখীর চেহারা।

কি আর করে হতাশ হ'য়ে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চল্ল সেই বনের দিকে।... বনে এসে যে যার কোটরে ঢু'কল। মন তাদের এত খারাপ হয়েছিল যে কেউ কারুর সঙ্গে কথাও বল্ল না। সে রাতটা ক্রমে কেটে গেল। তার পরের রাত্রে প্রতিদিনের মত একজন বেরিয়ে অন্য সব বন্ধুদের ডাকতে লাগল—ওমা! একি! কোথায় গেল তার গলার আওয়াজ! —সে যতই ডাকতে লাগল ততই গলার ভেতর থেকে একটা 'ক্যাঁচ কাঁচ' বিশ্রী আওয়াজ বেরুতে লাগল; কিন্তু তার দুঃখ তখনই কেটে গেল যখন সে শুনতে পেল যে তার বন্ধুরা তারই মত কর্কশ স্বরে উত্তর দিচ্ছে। সেই থেকে সমস্ত দিন কোটরে লুকিয়ে থেকে রাত্রে তারা খাবার খুঁজতে বের হয়; একথা তোমরা সকলেই জান। আর অন্ধকার গভীর রাতে প্যাঁচা যে মাঝে মাঝে বিকট রকম চেঁচিয়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্যাঁচারা ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে সায় দেয়;—ওটা আর কিছুই নয়, সেই একটা সৈন্য সঙ্কেতে জানায় যে শত্রুদের আর ভয় নাই আর বাকী সৈন্যগুলি ওঠে ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ—অর্থাৎ—যাচ্ছি বন্ধু যাচ্ছি। তোমরা সকলেই জান প্যাঁচার শত্রু কাক যখনই সে প্যাঁচা দেখে তাকে ঠুকরে অস্থির ক'রে তোলে। কি পাপে ঠিক বলতে পারি না। সেই শত্রুগুলি শেষে এই কাকে পরিণত হয়েছিল; তাই স্বভাব মত তাদের সে বৈরীভাব এখনও র'য়ে গেছে।

সাত
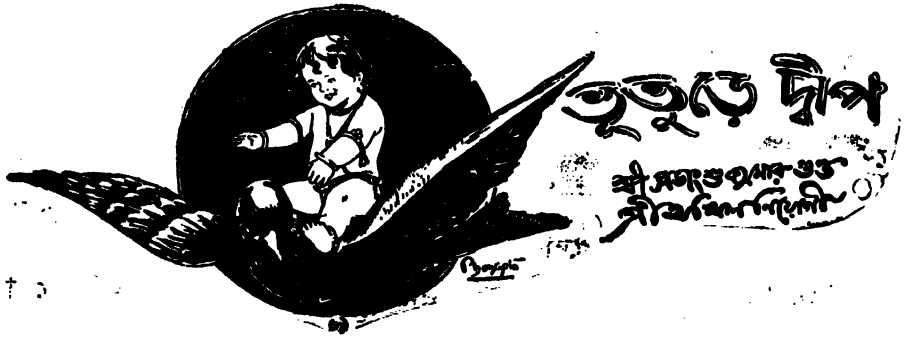
সেই অট্টহাসি থামিয়ে ভূতুড়ে রাজা তার স্বাভাবিক মিষ্টি স্বরের বদলে কর্কশ কণ্ঠে ব'লে উঠলো—এইবার তুমি একেবারে আমার হাতের মুঠোর ভেতর এসে প'ড়েছ, হাজার গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও তোমার পরিত্রাণ নেই।

খোকা ভূতুড়ে রাজার পায়ের তলায় আছড়ে প'ড়ে কাঁদতে কাঁদতে ব'ল্লে—আমাদের বাঁচতে দিন,—মেরে ফেল্‌বেন না।

তার হু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ঝরণা ঝর্ ঝর্ ক'রে বইতে লাগলো,—তার সারা দেহ ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

এতে কিন্তু সেই পাষাণ-প্রতিম ভূতুড়ে রাজার হৃদয়ে দয়ার ছাপ প'ড়লো না।

সে শুধু গর্জ্জে উঠ্‌লো—ডাকো তোমার পথের-চেনাকে দেখি কেমন ক'রে সে তোমার প্রাণ বাঁচায়, শত পথের চেনা একত্র হ'লেও তোমায় আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে না। একবার চারিদিকে শেষ চেয়ে দেখ, জীবনের মধ্যে শেষ-দেখা দেখে নাও।

এই ব'লে সে তার লম্বা হাত দুটো দিয়ে মাথা চুল্‌কুতে লাগলো।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ভূতুড়ে রাজা ব'ল্লে—তোমার শেষ ইচ্ছা কি বলো, আমি পূর্ণ ক'রবো।

খোকা ব'ল্লে—প্রাণে মারবেন না আমাদের—

ভূতুড়ে রাজা এ-কথা শুনে একটা বিশ্রী শব্দ ক'রে হাসতে হাসতে ব'ল্লে—ঐটী ছাড়া—

খোকা তখন দেখলে যে সে তার সঙ্গীদের নিয়ে তো ম'রতে চ'লছে, সুতরাং শেষ সময়ে ভূতুড়ে রাজার কাছে সে একটা বাজে প্রার্থনার জন্য দয়ার ভিখারী হবে না।

আর যখন তাকে ম'রতেই হবে, তখন হতভাগা ভূতুড়ে রাজাকে দু'একটা ঝাল ঝাল কথা শুনিয়ে দিতে দোষ কি ?

সে মরিয়া হ'য়ে বলে, ফেল্‌লে—তোমার দয়া তোমার কাছেই থাক্, তোমার দয়ার মুখে আমি লাথি মারি—

আর যায় কোথা ! ভূতুড়ে রাজা তার লম্বা হাত দুটো খোকার গলার কাছে এগিয়ে দিলে, গলাটা দু'হাতে ধ'রে পিষে ফেল্‌বার জন্যে।

খোকার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো তার বাবা-মার মুখ, তার ছোট বড় বোনেদের হাসি-মুখ, এমন কি তাদের বাড়ীর পোষা কুকুর জিমের কথাও তার ম'নে প'ড়লো।

কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে' গেল সেখানে এক লহমার ভেতর—

ভূতুড়ে রাজার বিকট চীৎকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হ'ল আর সেখানে আলোর ফোয়ারা থেকে আলো ছড়িয়ে প'ড়তে লাগলো চারিদিকে অজস্র ধারায়।

এ চীৎকার তো' ভূতুড়ে রাজার পুলক-উচ্ছ্বাস নয়, এ তো' ভীতি-জনিত কাপুরুষের চীৎকার।

খোকা ভাবলে এ কি হ'লো ! তাজ্জব তো এই ভূতুড়ে দ্বীপ। কোথায় এখন ভূতুড়ে রাজার কৃপায় তাঁর কাঁচা মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হ'য়ে যাবে, তা' না সেই ভূতুড়ে রাজাই তার-স্বরে প্রাণ ভয়ে চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছে। তবে কি পথের চেনা বন্ বন্ সিংকেও তার দল-বল নিয়ে তাকে বাঁচাতে হাজির হ'য়েছে !

যদিও চারিদিকে ফুট্‌ফুটে আলো ঢ'লে পড়ে হাস্‌ছিল আর খোকা তার বড় বড় কালো চোখ দুটো দিয়ে দেখবার চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু কিছুই তার দৃষ্টির সাম্‌নে প'ড়লো না।

সে অবাক হয়ে গেল ভূতুড়ে রাজাকে সেখানে না দেখে অথচ তার চীৎকার শুনে সে আরো অবাক হ'য়ে গেল।

এ-রকম উৎকন্ঠিত ভাবে তাকে বেশীক্ষণ থাকতে হ'ল না।

তারই মধ্যে একটি ছেলে সেখানে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে লাফাতে লাফাতে উপস্থিত হ'লো।

তার মুখের ভাব অনেকটা পথের চেনার মতো।

খোকা মনে মনে তাকে ঠাউরালে যে সে নিশ্চয় পথের-চেনার বড় ভাই।—

সে এসে সোজাসুজি ব'ল্লে—আমি পথের-চেনার বড় ভাই,—নাম আমার যাই হোক্ তুমি আমায় ডাকবে পথের বন্ধু ব'লে।

খোকা ব'ল্লে—পথের বন্ধু! ভূতুড়ে রাজা গেল কোথায়! পথের বন্ধু বল্লে—ব্যস্ত হ'য়ো না, সব কথা ক্রমেই শুনতে পাবে। আমি দিন কতকের জন্য আমাদের পুরী-ছেড়ে ভ্রমণে বের হই, নানান জায়গা ঘুরে যখন ফিরছি তখন একটা ভূত আমায় তোমার বিপদের কথা বল্লে,—এ ভূতটা নাকি তোমাদের বাড়ীর চাকর ছিল। আমি পথের-চেনার সঙ্গে তোমার আলাপের কথা শুনেছি তার কাছ থেকে, তুমি এক রকম নিজের দোষেই ভূতুড়ে রাজার পাল্লায় পড়ে'ছিলে। পথের-চেনার কোন দোষ নেই, ক্ষমতার বাহিরে বলে সে তোমায় ফের বাঁচাতে পারে নি।

খোকা বল্লে পথের চেনার কাছে আমায় নিয়ে চলো না।

পথের বন্ধু বল্লে—তুমি দেখছি নেহাৎ ছটফটে মানুষ, আগে আমার কথা সব শোন—আর একটু দেরী হলেই লোহার মতো ভূতুড়ে রাজার জমাট শক্ত হাত দুটোর চাপে তোমার মাথার খুলি অবধি গুঁড়ো হ'য়ে যেত।

আমি অবশ্য তোমায় বাঁচিয়েছি এই স্ফটিকের বলটার জোরে, তবে এই বল ও আমার চেয়ে তোমার সেই ভূতটার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আর একটা কথা, তুমি যদি তোমার বাড়ীর খবর জানতে চাও তা'হলে এই স্ফটিকের বলটার ভেতর চেয়ে দেখ, আমি বলটা ঘোরাতে থাকি, এই রকম ক'রলেই তুমি দেখতে পাবে তোমার বাড়ীতে কে কি ক'রচে বা না ক'রচে।

খোকা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লে—কৈ দেখি দেখি—পথের-বন্ধু ভুরু কুঁচকে বিরক্তি স্বরে বল্লে—আঃ থামো তুমি। আচ্ছা চঞ্চল দেখ'চি।

তার পর হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে—কি ভাই। রাগ ক'রলে নাকি তুমি। এসো এসো রাগ আর তোমার ক'রতে হবে না।

পথের বন্ধু স্ফটিকের বল্‌টা ঘোরাতে লাগলো আর খোকা বড় বড় চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগলো।

সে দেখলে—বাড়ীতে তাদের সকলেরই মুখ বিমর্ষ, সকলে যে যার কাজ ক'রচে, কিন্তু সেই কাজের ভেতর কোনো প্রাণ নেই। শোবার ঘরের দেওয়ালের ওপর তার যে বড় ফটোখানা ছিল, তার মা এসে ছল্ ছল্ চোখে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন ও আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

হঠাৎ পথের-বন্ধুর গলার স্বরে খোকা চোখ ফিরালে; পথের বন্ধু বল্লে—তিন মিনিটের বেশী দেখবার উপায় নেই, তা'ও আবার সাত দিনে একবার।

খোকা বল্লে—এখন চলো তোমাদের পুরীতে, এই ভূতুড়ে রাজ্যে আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে।

পথের-বন্ধু ব'ল্লে—তোমার বউ-কথা-কও, কোকিল, সকলেই অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছিল, আমি তাদের ভালো করে চুপ চাপ এক জায়গায় থাক্‌তে ব'লেছি? দেখবে?

এই ব'লে পথের-বন্ধু একটি বাঁশী বের ক'রে ফু দিলে, দিতেই পাখীর দল এসে হাজির হ'ল।

খোকা হাস্‌তে হাস্‌তে পথের-বন্ধুকে বল্লে—ভাই, তুমি একটু বাঁশী বাজাও না, আমরা সব শুনি।

পথের-বন্ধু বল্লে—আমাদের সব এখন নিজেদের পুরীতে যেতে হবে, এ ভূতুড়ে রাজ্যের নিশ্বাস-প্রশ্বাস লওয়াও খারাপ। আমি বাঁশী বাজাতে বাজাতে যাই, তোমরা আমার পেছন পেছন এসো।

পথের বন্ধু বাঁশী বাজাতে লাগলো, কী মধুর সে সুর; বাঁশী যেন আনন্দের রস পান ক'রে মাতাল হ'য়ে বল্‌চে—ওরে আমার পেছনে তোরা শুধু প্রাণ-হীনের মতো হাটতে হাটতে আসিস্ না; প্রাণ-ভরে নেচে আয়।

সে বাঁশীর সুর খোকার ও পাখীদের দেহের প্রতি অংশের মধ্যে ঢুকে তাদের চঞ্চল ক'রে তুল্‌লে।

তারা আর থাক্‌তে পার্‌লে না, হেলে-দুলে নেচে নেচে তারা চ'ল্‌লো—

পথের-বন্ধুদের পুরীর কাছে পৌঁছতেই খোকা ব'লে উঠ্‌লো—বন্ বন্ সিং দরজা খুলো না।

পথের-বন্ধু ও সেই কথা বল্লে,—সঙ্গে সঙ্গে বন্ বন্ সিং দরজা খুলে দিলে।

সেখানে পথের চেনার সঙ্গে দেখা হ'ল।

সকলে মিলে হেসে, খেয়ে, নেচে, গেয়ে দিন্ কাটাতে লাগলো।

কিন্তু এরই অন্তরালে যে বিপদের কালো মেঘ খোকার ভাগ্য-আকাশে উঠ্‌ছিল তা কেউই টের পেলে না। (চল্‌বে)

বর্ষবরণ

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস—নবীন বর্ষ ভারতবর্ষে নবীন হর্ষ দিতে,
জীর্ণ এ ঘরে বরি সমাদরে এসগো নবীন মিতে।
দেশের আশার দীপের দশায়
স্নেহ বরষিবে, আছি ভরসায়,
মহা মিলনের বাসনা জাগাও মহা মানবের হিতে ॥

নবীন অতিথি, সোনালী সোঁদালে ভ'রে দাও বনভূমি,
ভ'রে দাও তুমি জ্ঞানের সোনায় আমাদের মনোভূমি।
কোষ বিদারিয়া সিমুল তুলায়
ঝরাও যেমন পথের ধূলায়,
অলস লালসা উড়াও তেমনি রেখনা মোদের চিতে ॥

বিথারিয়া দাও নিম্বতরুর পুষ্পিত ছায়াখানি,
শাখায় শাখায় চাঁপায় ফুটুক তোমার অভয়পানি।
উজলি' অশথ দারু কঙ্কাল,
জাগাও যেমন নবীন প্রবাল,
তেমনি সুষমা জাগাও দেশের শীর্ণ অঙ্গটিতে ॥

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় 'মুকুলের' পাঠক পাঠিকাগণ :—

আশা করি কল্‌কাতায় যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে গেল তাতে তোমাদের কারুর গায়ে আঁচড় লাগেনি আর ত'তে তোমরা চৌকি দেবার কাজে নিযুক্ত ছিলে।

এই মাসের মধ্যেই বার্ষিক মুকুল বেরিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙলার বিশিষ্ট লেখক লেখিকারা তোমাদের মনের জন্যে যে অমৃত পরিবেষণের ভার নিয়েছেন, তা তোমাদের চিরদিন নন্দিত ক'র্‌বে। তা ছাড়া ছবি, ছাপা, বাঁধানো তার এমন চমৎকার হবে যে তোমরা একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। তোমাদের প্রিয় 'মুকুল' তোমাদের প্রিয়তর হবে।

এবারেও তোমাদের একটি শোক-সম্বাদ জানাচ্ছি। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ সম্প্রতি পরলোকগত হ'য়েছেন। বাঙলা দেশ ও বাঙলা ভাষার উপর তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির তাঁর কার্য্যকুশলতার দীপ্তিতে ভরা আছে।'

তোমাদের বার্ষিক 'মুকুল' তুলে দিয়ে, তোমাদের হাসিভরা মুখগুলি দেখবার জন্যে আমরাও আগ্রহান্বিত রইলুম। ইতি

তোমাদের 'সম্পাদক'

"মুকুল" প্রকাশে দেরী

এবারের "মুকুল" বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে বার করবার সমস্ত আয়োজন হয়েছিল হঠাৎ সুরু হ'ল কলকাতার হিন্দু-মুসলমানের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। সে খবর তোমরা পেয়েছ। সমস্ত কাজ কারবার একে একে বন্ধ হয়ে গেল। প্রেসম্যান্ আসেনা, দপ্তরী আসেনা, কাজেই "মুকুল" প্রেসেই আটকিয়ে রইল আর এ রকম অনর্থক দেরী হয়ে গেল।

যাক্ এ বছরটা একটু গোলমালে কাটলেও তোমাদের উৎসাহ কম পাই-নি। আসছে বছর থেকে অর্থাৎ শ্রাবণ ১৩৩৩ থেকে "মুকুল" প্রতি মাসের ১লা বার হবে। এজন্য কিন্তু তোমাদের পূর্ণ সহানুভূতি চাই।

নূতন ধাঁধা ও গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতা-গণের নাম জ্যৈষ্ঠে বের হবে।

১ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ { একাদশ সংখ্যা

শিশুর আশা

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

১

আমরা যখন বড় হবো, হবো মস্ত বীর।
বিপদকালে টল্‌বেনা পা, রুধ্‌বো আঁখি-নীর।
সত্য পথে চল্‌বো সোজা,
ফেল্‌বো ঝেড়ে ভয়ের বোঝা,
মরণ মোদের ধর্‌বে চরণ. রাখ্‌বো উঁচু শির।
আমরা যখন বড় হবো, হবো মস্ত বীর।

২

আমরা যখন বড় হবো. হবো মানুষ খাঁটি।
জ্ঞানের তরে ছুট্‌বো ভবে ভুলে কান্নাকাটি।
দুঃখ বরণ করবো হেসে,
ঢুঁড়বো মাণিক দেশ্ বিদেশে,
পেরিয়ে যাবো সাগর পাহাড় ছেড়ে দেশের মাটি'
আমরা যখন বড় হবো, হবো মানুষ খাঁটি।

আমরা যখন বড় হবো, ঘুচবে দেশের দুখ !
মোদের যশে জন্মভূমির উঠবে ফুলে বুক !
দেশের চাষার পূরবে আশা,
জ্ঞান বিলাবো, রইবে খাসা,
বাড়লে তাদের মনের আলো, তখন পাবে সুখ !
আমরা যখন বড় হবো, ঘুচবে দেশের দুখ !

৪

আমরা যখন বড় হবো, করবো সকল কাজ !
কাজের কাজী, মানুষ তেজী, কোথায় তবে লাজ !
বিদেশ থেকে ব্যবসা করি
আন্‌বো টাকা জাহাজ ভরি'
যেথায় সেথায় মিলবে মোদের পণ্য জগৎমাঝ !
আমরা যখন বড় হবো, করবো এমন কাজ !

৫

আমরা যখন বড় হবো, হবো কীর্ত্তিমান !
চল্‌বে নভে উড়ো-জাহাজ, স্থলে বাষ্প-যান !
মোদের গড়া বাষ্পীয় পোত,
সাত সাগরে তুল্‌বে রে স্রোত,
মিল্‌বে মকর-পোতের বলে অতলপুরীর দান !
এম্‌নি করে' আমরা আবার হবো কীর্ত্তিমান্ !

৬

আমরা যখন বড় হবো, একশো হবো একা !
ভাগ্য শুধু ভরসা ক'রে ছাড়বো স্বপন দেখা !
চাইনে কিছুই চরণ চেটে,
আমরা সুধা নেবো বেঁটে,
আমরা বিনে জগন্নাথের সকল কাজেই ঠ্যাকা !
আমরা যখন বড় হবো, এম্‌নি হবো একা !

বীর বালক পুত্ত

[শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য]

সে আজ বহুদিনের কথা, আকবর শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছিলেন। রাজপুতানার বীরভূমি মেবার। সেই মেবারের রাজধানী চিতোর নগরে একদিন একটি সভা বসিল। মেবারের রাজা দুর্ব্বল-চিত্ত মহারাণা উদয়সিংহ রাজপুত বীরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"বীরগণ! সম্রাট আকবর বহু সৈন্য লইয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা মেবার কাড়িয়া লইবেন।"

বীরগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কখনো না—কখনো না। আমরা প্রাণ দিব—মেবার দিব না।"

উজ্জ্বল তরবারিগুলি রাজপুত বীরদিগের হস্তে রবির করে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ ভল্ল লইয়া রাজপুত সেনাগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল—"আসুক মোগল, ভয় কি! আমরা প্রাণ দিব—মেবার দিব না।"

সম্রাট আকবরের সঙ্গে তখন রাজপুতের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শত শত মোগল সেনা মরিল—শত শত রাজপুত সেনার রক্তে প্রস্তরময় রণভূমি লোহিত হইয়া উঠিল।

(২)

ষোল বৎসর বয়সের বালক পুত্ত কহিলেন—"তোমরা না বীর? তবে আজ সূর্য্য-তোরণরক্ষক মহাবীর শহিদাসের জন্য রমণীর মত কাঁদিতেছ কেন। শহিদাস মরিয়াছেন—আমি আছি। আমি আজ সূর্য্য-তোরণরক্ষা করিব। দেখি, মোগল সেনা কেমন করিয়া চিতোরে প্রবেশ করে।"

ভেরী বাজিয়া উঠিল। ঘোর রবে রণডঙ্কার ধ্বনি হইল। রাজপুত বীরেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"আমরা লড়িব, হটিয়া মান দিব না।"

সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া সম্রাট আকবর মনে মনে বুঝিলেন যে, একটি রাজপুত জীবিত থাকিতেও তিনি চিতোর নগর জয় করিতে পারিবেন না।

পুত্ত বলিলেন—"মা, তোমার পায়ের ধুলা আমার মাথায় দাও। আমি আজ মোগলকে জয় করিতে যাইতেছি।"

পুত্তের জননী হাসিয়া বীর পুত্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তরবারি আনিয়া আপন হস্তে পুত্রের কটিতে বাঁধিয়া দিলেন। বীর-সাজে সজ্জিত পুত্র যখন নত জানু হইয়া মাতার চরণে মাথা রাখিলেন, তখন মা কহিলেন—"বৎস! তোমার পিতাও যুদ্ধেই প্রাণ দিয়াছেন, ভয়ে পলায়ন করেন নাই। যাও বৎস, হয় আজ যুদ্ধে জয়ী হইও, না হয় রণভূমেই চিরদিনের মত নিদ্রা যাইও।"

আবার ডঙ্কা বাজিল—ভেরীনাদ হইল—রাজপুত সেনারা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"জয় পুত্রের জয়।"

(৩)

পুত্রকে বিদায় দিয়া বীরবালা নিজে অসি লইলেন। পুত্তের পত্নীকে বলিলেন—"এসো মা, এই লোহার বর্ম্মে দেহ আচ্ছাদন করিয়া তরবারি হস্তে যুদ্ধে চল। আমার পুত্ত—তোমার স্বামী আজ রণ জয় করিতে গিয়াছে। তাহার বীরপণা দেখিবে চল।"

পুত্তের জননী এবং পত্নীকে যুদ্ধে যাইতে দেখিয়া চিতোরের নারীরা জয়নাদ করিয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ড বেগে মোগল সেনার দিকে ধাইলেন। মোগলে রাজপুতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

বীর বালক পুত্ত আর নাই। বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছেন। পুত্তের জননী এবং পত্নী আর নাই—পুত্তের পার্শ্বেই প্রাণপাত করিয়াছেন। শত শত রাজপুত সেনার শোণিত তখন জলের স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্‌শব্দে চিতোরের তোরণ মুক্ত হইল। বাঁধ ভাঙ্গিলে নদী যেমন ধায়, তেমনি ভীষণ বেগে আট হাজার রাজপুত বীর শত্রুর দিকে ছুটিয়া চলিল। কাহার সাধ্য যে তাহাদের গতিরোধ করে। মোগলের কামান ডাকিল গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্—

মোগলের তীর ধাইল শন্ শন্ শন্—মোগলের অসি ঝল্সিয়া উঠিল ঝক্ ঝক্ ঝক্। রাজপুতের একটা বাঁধবাঙ্গা পাগল নদী ছুটিয়া গিয়া মোগল সেনার উপর পড়িল।

বীর রাজপুত মরিতে জানিতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাতে জানিত না। তাহারা মারিল মরিল এখনও চিতোরে ফিরিল না। শোণিত রাঙ্গা পথে বিজয়ী আকবর যখন চিতোর নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, অসিশান হইয়াছে চিতোর ধুসে ঢাকা। সম্রাট শুনিলেন বীর নারীরা মান বাঁচাইতে সেই আগুণে পুড়িয়া মরিয়াছেন।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আকবর আপন মনে বলিলেন—'রাজপুতেরা আজ মরিয়াই মোগলকে জয় করিল।'

(৫)

এই ভয়ানক যুদ্ধে যত রাজপুত মরিয়াছিল, সম্রাটের আদেশে তাহাদের যজ্ঞোপবীত সংগ্রহ করিয়া আনা হইল। সেকালে চারিসেরে একমণ ধরা হইত। বীরের যজ্ঞপবীত ওজন করিয়া দেখা গেল সাড়ে চুয়াত্তর মণ (৭৪) হইয়াছে। সম্রাট বলিলেন—"আজ হইতে যাহার পত্রের পিছনে ৭৪॥০ লেখা থাকিবে, মল্লিক ভিন্ন অপর কেহ যেন সে পত্র না খোলে। এই আদেশ যিনি অবহেলা করিবেন, চিতোর ধ্বংশের সকল পাপ তাঁহাকে লাগিবে।"

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই চৈত্র রবিবার এইরূপ চিতোর ধ্বংশ হইয়াছিল; তাহার পর অতদিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো লোখের সে দুঃখের কথা ভোলে নাই। এখনো অনেক গোপনীয় পত্রের পশ্চাতে লিখিয়া দেয় ৭৪॥০; তাহারা মনে করে উহা লিখিলেই মালিক ভিন্ন আর কেহ সে পত্র খুলিবে না।

চিত্রকর

— চার —

তয়কং তখন ভাই জয়কংএর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে,—চাং এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে রিন্‌টিনের মা'র কাছে গিয়ে তুলি, রং ইত্যাদি আঁকবার সরঞ্জাম কেনবার পয়সা চেয়ে নিলে ও রিন্‌টিন্‌কে তার কাছে আধ ঘন্টার পরে পাঠিয়ে দিতে বল্লে।

আধঘন্টা পরে চাং ঐ সব জিনিষ কিনে ঘরে ফিরে দেখলে রিন্‌টিন্ এসে হাজির হ'য়েছে।

চাং তাকে ঘরের বাইরে খোলা মাঠের ওপর কুকুর জিংকে পাশে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে বল্লে।

রিন্‌টিন্‌ও তৎক্ষণাৎ চাংএর কথা মতো জিংকে নিয়ে মাঠের ওপর বসলে।

চাং পেন্সিল নিয়ে চট্‌পট রিন্‌টিন্ ও জিংএর সেই অবস্থায় একটা স্কেচ্ এঁকে ফেল্‌লে। স্কেচ হয়ে গেলে চাং নিজে রিন্‌টিন্‌কে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল।

তারপর পাঁচদিন ধ'রে একটানা সে ছবিতে রং ফলাতে লাগলো। এই রকম পরিশ্রম ও উদ্যমের পর যখন ছবি শেষ হ'ল তখন তার দেহ ক্লান্তির অবসাদে পূর্ণ।

* * * * *

প্রকাণ্ড হল ঘর প্রতিযোগিতার ছবিতে ভ'রে গেছে ; পুরস্কার যোগ্য ছবি নির্ব্বাচন করবেন জয়কং নিজেই।

সেদিন কী ভীষণ তুষার পাত হচ্ছিল! ঠাণ্ডা বাতাস চঞ্চল চরণে যাতায়াত করছিল

চাং সেই তুষারপাতের মধ্যে জিংকে নিয়ে অট্টালিকার বাইরে দরজায় ব'সে ছিল ; ভেতরে তার প্রবেশ করতে সাহস হচ্ছিল না, শুধু ভয়কং এর ভয়ে—

অবশেষে ভেতরে বোকাবং এর চীৎকার শোনা গেল,—'কেল্লা ফতে ! আমিই প্রাইজ পেয়েছি।"

চাং এর কানে বোকা-বং এর সেই উল্লাস চীৎকার গরম শীসের মতো বোধ হল।

সে আর বসতে পারলে না, মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে অবিশ্রান্ত তুষার পাতের ভেতর দিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

কিন্তু সে বেশীদুর অগ্রসর হতে পার্‌লে না, পা অবশ হয়ে যাওয়াতে সে বরফের ওপর শুয়ে পড়লো।

এদিকে চাং এর ছবি যে টেবিলের ওপর ছিল, সেখান থেকে পড়ে গিয়ে সেটা আশ্রয় নিয়েছিল সেই টেবিলটার পাশেই।

একজন কর্ম্মচারী সেই ছবিখানা দেখ্‌তে পেয়ে জয়কংএর কাছে নিয়ে গেল ; জয়কংএর চোখদুটি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে আপন মনেই বলে উঠলো— "এই কিশোর ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হবে, এ আমি এখন থেকে বলে রাখলাম।

তারপর সে উপস্থিত লোকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে বলে উঠলো— "পুরস্কার বোকা বং পেতে পারে না, এই ছবির চিত্রকর পুরস্কার যোগ্য"

সকলে চিত্রকরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে, তারা ভাবতে লাগলো—কে এই সৌভাগ্যবান বালক-শিল্পী।

জয়কং হল ঘর প্রকম্পিত করে বল্লে—"চাং" তার গম্ভীর স্বর সমস্ত হলটায় প্রতিধ্বনিত হল—"চাং"

চাং এর বাড়ীতে তাকে না দেখতে পেয়ে জয়কং চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাতে লাগলো।

চাংকে যখন লোকজন জমীদার বাটিতে নিয়ে এলো, তখন জয়কং চাংএর আঁকা ছবিটা ভয়কংকে দেখিয়ে বলছিল—এই বালক কালে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হবে, এক একটি এর হাতের আঁচড়ের দাম—

এমন সময় চাংকে ঘাড়ে নিয়ে লোকজন ঘরে প্রবেশ করলে ; পেছনে জিং ও জিভ বের করে হাঁফাতে হাঁফাতে এলো।

জয়কং চিকিৎসক আনিয়ে চিকিৎসা করালে, দুই একদিনের ভেতরই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

সুস্থ হ'য়ে উঠলে জয়কং ভয়কংএর সামনেই চাংকে বল্লে "তুমি আমার সঙ্গে রাজধানীতে গিয়ে আমার কাছেই ছবি আঁকা শিখবে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমার নিজের কোন ছেলে মেয়ে নেই, তুমি ছেলের মতোই থাকবে। তোমাকে আমি এম্নি উচুদরের শিল্পী করে দোব যে সারা জগতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। আর তোমার পুরস্কার নাও,"—

এই বলে জয়কং একটি কয়েক হাজার মুদ্রার থলে চাংএর হাতে দিলে।

ভয়কং চাংকে বল্লে—"তোমার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করিনি, এ জন্য আমি লজ্জিত; যাক্ সে সব ভুলে যাও। আমি এখন তোমার প্রতিভা জানতে পেরেছি। তুমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে শিক্ষা শেষ করে যখন আসবে, তখন তোমার হাতে আমি রিনটিনকে সমর্পণ ক'রবো এবং ভবিষ্যতে জমিদারীর মালিক হবে তুমি।"

চাং ভাবছিল—এ স্বপ্ন না সত্য!

বাণীর আসন

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

একটি গলির মধ্যে সুন্দর একটি বাড়ী কিন্তু তাতে জনপ্রাণী কেউ থাক্‌তোনা। একজন চাকর কেবল দুবেলা দরজা জানলা খুলে আর বন্ধ করে বাড়ীটিতে আলো হাওয়ার চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক রাখতো আর তার ঘরদোর গুলি পরিষ্কার রাখতো।

কুঙ্কুমের বাড়ী ভিন্ গাঁয়ে—ঐ বাড়ীটি থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হবে। তবু সে ঐ চাকরটির সঙ্গে ভাব ক'রে সাঁঝ সকালে বাড়ীখানিতে দু তিন ঘণ্টা থাক্‌বার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। কুঙ্কুম সেই নির্জ্জন বাড়ীটির ঘরে, দালানে, ছাতে ঘুরে বেড়াতো, কখনো বা তন্ময় হ'য়ে একটি ঘরের ভিতর ব'সে থাকতো—বাড়ীর সামনে ফুলের বাগানে যুঁই ফুলের ঝোপের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌তো।

রাখাল বড় লোকের বাড়ীর চাকর হ'লেও তার বুকে স্নেহের ধারা উচ্ছল ছিল আর সে কুঙ্কুমের সুন্দর চেহারা,মৃদু ব্যবহার আর মিষ্টি কথায় তার প্রতি সে অনুরাগীও হ'য়ে প'ড়েছিল। প্রথম যে দিন কুঙ্কুম এসে তাকে বলে "তোমার নাম কি ভাই তুমি বুঝি এই বাড়ীর দেখা শুনার ভার নিয়েছ"? সেদিন থেকেই রাখাল কুঙ্কুমকে ভালোবেসেছিল। তাই কুঙ্কুম যেদিন তাকে জানালে সে রোজ চার পাঁচ ক্রোশ্ পথ হেঁটে আসে এই বাড়ীটি দেখ্‌বার জন্যে, যদি দুটি বেলা সেই বাড়ীতে কিছুক্ষণ থাক্‌তে পায় তো তার ভারি গর্ব্ব হবে—সেদিন রাখাল তার চিবুকটি ধ'রে বলেছিল "বেশ তো ভাই, এসোনা তুমি।" কিন্তু সে একবারও ভাবেনি এই নির্জ্জন বাড়ীটিতে এই তরুণ কিশোর কি আকর্ষণে আস্‌তে চায়।

রাখাল কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তো আর কুঙ্কুম বাড়ীটিকে বুকে চেপে ধ'র্‌তে চাইতো, এমনি ক'রেই দিন কাটছিলো। রাখাল এ পর্য্যন্ত একদিনও নজর করেনি তার বন্ধুটি ঘরে, দালানে, বাগানে এক্‌লাটি কিই বা করে আর কেনই বা ধ্যানময় হ'য়ে বসে থাকে।

পূর্ণিমার সন্ধ্যা। রাখাল নীচে থেকে দেখলে একটি ঘরের জানলা খোলা; যে সে সব ঘরেরই জান্‌লা বন্ধ ক'রেছিল, তাই সে বুঝতে পার্‌লে না ঐ জান্‌লাগুলি

কে খুল্লে। হয়তো তারই ভুল হ'য়েছে, এই ভেবে দোতলার ঘরটির জান্‌লা বন্ধ ক'র্‌তে গেল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। রাখাল দেখলে একটি জান্‌লা দিয়ে জ্যোৎস্নার রূপোর ঢেউ ঘরের একটি জায়গায় লীলায়িত হ'য়েছে, সেইখানে একটি ছোট সোনার সিংহাসন সাম্‌নে রেখে কুঙ্কুম সেটিকে যুঁই ফুলের মালায় সাজিয়েছে আর একবার তার মাঝখানে একটি সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করছে, একবার তাতে সে তার বুকের স্পর্শ দিচ্ছে, একবার সেইটিকে চুমু খাচ্ছে। রাখাল তো সব ব্যাপার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল। সে ঘরে ঢুকে পড়তেই কুঙ্কুম চম্‌কে উঠ্‌লো আর তাড়াতাড়ি সেই সিংহাসন-টিকে জামার ভিতর গোপন করবার চেষ্টা ক'র্‌লে। রাখাল ব'ল্লে "ভাই আমি সব দেখেছি, আমার কাছে আর কোনো লুকোচুরির দরকার নেই; কিন্তু আমি যা দেখছি তার রহস্য কিছু বুঝতে পার্‌ছিনি আমায় সব খুলে বল ভাই।"

কুঙ্কুম ব'ল্লে "ভাই আমি রাজার ছেলে কিন্তু ধন ঐশ্বর্য্য আমার যেন পাঁজরা চেপে ধরে, তাই আমি এ শহর ও শহর, এ গাঁ ও গাঁ এমনি ক'রেই ঘুরে বেড়াই, ফুল ভালোবাসি, প্রকৃতি ভালোবাসি, মানুষের সহজ সরল ধারা ভালোবাসি। এই রকম ক'রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একদিন এই বাড়ীর সাম্‌নে আমি দারুণ গ্রীষ্মের সময় অচেতন হ'য়ে প'ড়ে যাই। যখন জ্ঞান হয় তখন দেখি একটি রূপসী কিশোরী আমার শিয়রে ব'সে। আমি তাকে আমার পরিচয় দিই, সেও আমাকে তার পরিচয় দেয়। আমি চ'লে যাবার দিন সে দুছড়া যুঁই ফুলের হার গেঁথে এনে ব'ল্লে "আমি দুটি মালাই তোমার গলায় পরিয়ে দিই, তুমি একটি মালা খুলে আমায় পরিয়ে দিয়ো। আমি তাই ক'র্‌লুম। যাবার সময় সে আমায় ব'ল্‌লে "আমাদের মালা বদল তো হ'য়েই গেল, এবার তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো যে তুমি রাজা হ'লে, আমি হব তোমার রাণী, সোণার সিংহাসনে বস্‌বো আমি তোমার পাশে।" আমি সেই শপথই কর্‌লুম, সে বল্লে "আমার নাম কস্তুরী, ভুলে যেওনা।"

শহরে আমার ভালো না লাগায় বাবার অনুমতি নিয়ে চার পাঁচ কোশ দূরে আমাদের বাগান বাড়ীতে এসে আছি। বাগান বাড়ীটি যে গাঁয়ে তার নাম চন্দনপুর।

সেই গাঁয়ে এসেই, এই বাড়ীতে কস্তুরীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যখন এলুম, তখন দেখলুম বাড়ীর আগাগোড়া বন্ধ, কেউ কোথাও নেই, শুধু সাম্‌নে তুমি দাঁড়িয়েছিলে। তার পরের ঘটনা তুমি সব জানো।

রাখাল ব'ল্লে "কিন্তু"—

কুস্কুম ব'ল্লে "তুমি যে প্রশ্ন কর্‌বে তা আমি জানি। এই ঘরের এইখানে এমনি এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় কস্তুরীর সঙ্গে আমার ও সব কথা হ'য়েছিল। তাই এই ঘরখানির এই জায়গাটি আমি বড় ভালোবাসি। এই বাড়ীর প্রতি ধূলি-কণার প্রতি পুষ্পে পত্রে, প্রতি আলোক ছায়ায় আমার প্রাণের সমস্ত কামনা, বুকের সমস্ত স্নেহ, চোখের সমস্ত দৃষ্টি গাঁথা আছে। তাই আমি তোমার কাছে এখানে আস্‌বার অনুমতি চেয়েছিলুম।

রাখাল ব'ল্লে "যখন তাকে আর পাবার সম্ভাবনা নেই"—

কুস্কুম বাধা দিয়ে ব'ল্লে "ভুল কথা বোলোনা বন্ধু, আমি জানি আমার বুকে লুকানো এই ছোট সোনার সিংহাসন একদিন বড় হবে, একদিন কস্তুরী তা আলো করে ব'সবে, আমার রাণীর কাছে তার গা ছুঁয়ে যে শপথ ক'রেছি, তা বিফল হবে না।"

রাখাল কুস্কুমের গলাটি ধরে ব'ল্লে "ভাই এমন বিশ্বাস যার, ভগবান তার আশা অপূর্ণ রাখবেন না।"

উস্রীনদী *

[শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়]

উস্রী নদীর উঁচু ডাঙা
ঘন ঘন বাঁক
দুইটি তীরে কপাল ভাঙা
বুকে কাটা থাক্।

---

* বিহার অঞ্চলে গিরিডি সহরের বুক চিরে যে ছোট্ট পাহাড়ে নদীটি চলে গেছে তারই নাম "উস্রী নদী"

মুকুল

উশ্রী নদীর উঁচু ডাঙা
শিরে শোভে শাল,
দেহের মাটি ঈষৎ রাঙা
ঝুঁকে পড়া ডাল।

উশ্রী কূলের রুক্ষ পায়ে
শক্ত পাথর আঁটা
রোদের তাপে জলের ঘায়ে
লক্ষ যুগের ফাটা।

উশ্রী কূলের রুক্ষ পায়ে
শুকনো মাটির চাপ
শিকড় ঝোলে ভাঙন গায়ে
কৃষ্ণ যেন সাপ।

রুগ্ন নদী উশ্রীখানি
নুড়ী পাথর কত
বালুর বুকে খুড়লে পানি
ফল্গু নদীর মত।

রুগ্ন নদী উশ্রীখানি
ক্ষীণ জলের ধারা
আলগা বালি কেমন জানি
একটু দিশাহারা।

কতখানে আটক পড়া
কিনার ঘেঁষা জল
ডিমাকারে শরীর গড়া
মুখটি নিরমল।

পুতুলের বুদ্ধি

[শ্রীঅযোধ্যা দেব।]

ডাক্তার বাবুর মেয়ের নাম 'পুতুল'। পুতুলের বয়স আট বৎসর; ভারী সুন্দরী সে। পড়াশুনায় ও 'পুতুল' খুব ভাল। আমাদের এই পুতুল ও 'মুকুলের' গ্রাহিকা।

পুতুলের ছোট ভাই 'ননীর' আজ চার, পাঁচ দিন যাবৎ অসুখ। 'ননীর' বয়স মাত্র তিন বৎসর। সে জ্বরে খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা হয়ত বলিবে, তার বাবা ডাক্তার, আর তারই চিকিৎসা হইতেছে না? কেন হইতেছে না তাই বলিতেছি।

পুতুলের বাবা আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল অন্য এক জায়গায় গিয়াছেন। তার বাবা বাড়ী নাই বলিয়াই---ননীর আজ এই দুর্ভোগ হইতেছে।

'পুতুলের' মা, ননীর অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়া গেলেন। মায়ের চিন্তান্বিত ভাব দেখিয়া পুতুলের ও মুখ কালো হইয়া গেল।

হঠাৎ পুতুলের একটা কথা মনে পড়িল। তার বাবার 'ডিস্‌পেন্‌সারী' ঘরের দরজার উপরে যে একটা 'সাইনবোর্ড' টাঙানো ছিল, তাহাতে লেখা ছিল :—

"দি পারিজাত মেডিকেল ষ্টোর্"

ডাঃ—ডি, সি, রায় (H. M. B.)

স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী

সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া তার মায়ের কাছে গিয়া বলিল. 'মা, তুমি ত শিশু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শি, তুমিই ননীকে ঔষধ দিতেছ না কেন? বাবা বাড়ীতে নাই তাই সেই জন্যই আজ 'ননীর' এত কষ্ট! মা, আমি বলি, তুমিই 'ননীকে' ঔষধ দেও।'

মা তাহার কথা শুনিয়া, এই চিন্তার মাঝেও হাসিয়া অস্থির। মা বলিলেন, 'আরে পাগ্‌লী, আমি যদি ঔষধ দিতে পারিতাম, তবে কি আর এতদিন চুপ করিয়া থাকিতাম, তোর্ পরামর্শের অপেক্ষা রাখিতাম?'

পুতুল বলিল—'তবে বাবা 'স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী এই কথা লিখিলেন কেন?

মা বলিলেন—'এত সব আমি জানি না বাপু; যিনি লিখিয়াছেন, তাঁর কাছ থেকে এর উত্তর নিও।'

পরদিন ডাক্তার বাবু বাড়ী আসিয়াছেন। আজ 'ননীর' অবস্থা কিছু ভাল।

ডাক্তার বাবু বাড়ী আসিলে পর, পুতুলের মা, তাঁহার নিকট ননীর চিকিৎসা সংক্রান্ত পুতুলের সকল কাহিনী বলিলেন। ডাক্তার বাবু শুধু হাসিয়া বলিলেন—'বটে পুতুলের এত বুদ্ধি!'

পুতুল ও ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে তার বাবাকে কহিল—'বাবা মা ত চিকিৎসা করিতে জানে না, তবে তুমি সাইন্‌-বোর্ডে মিথ্যা কথা লিখিলে কেন?'

তার বাবা উত্তর দিবার আগেই তাকে টানিয়া নিয়া কোলে লইয়া, পিঠে ছোট্ট একটি কিল্ দিয়া বলিলেন—'আরে পাগলী' এত বুদ্ধি তোর?'

...পুতুলের বাবা যখন তাকে সকল কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তখন প্রথমে পুতুল হাসিয়াই একেবারে খুন তার পর তার ভুল বোঝার জন্য মুখ এতটুকু করিয়া বসিয়া রহিল।

তার বাবা তাকে কোলে তুলিয়া আদর করিতেই—'পুতুল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল!'

নূতন ধাঁধা

নীচের প্যারাটিতে সাতটি ভৌগলিক নাম লুকানো আছে। বের করতো!—

বাদল সেদিন তেঁতুল খাইয়া 'টক টক' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহার ছোট কাকা শীতল তাহার কাণ মলিয়া দিলেন। তাহার অল্পেতে নালিশ করা চিরদিনের অভ্যাস। সে তাহার বাবার নিকট চট করিয়া নালিশ করিয়া দিল। তাহার বাবা শ্যাম সাহা রাগিয়া তাহার কাকাকে খুব এক চোট বকিলেন আর বলিলেন—"সাবধান বাদলকে আর কখনো কিছু বলিস্ না।"

শ্রীঅমিয়াংশুময় এষ

২। পা আছে হাত নাই, মানুষ পেলে গিলে খাই।

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়; শালিখা।

যাহাদের দুইটি ধাঁধাই ঠিক হইয়াছে—

প্রতিমা বসু, ফরিদপুর, কুমারী সুলতা দেবী, রায়পুর, সি, পি; শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, বর্দ্ধমান; শ্রীঅমিয়রতন, নিমাই রতন, জ্যোতিঃপ্রসাদ, বড়দাদা, নৃপেনদা, বলাই দা, শালিখা; কুমারী শান্তিলতা নিয়োগী, সাকরাইল বালিকা বিদ্যালয়, ময়মনসিং; শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ, বর্দ্ধমান; শ্রীধারা গুপ্ত, কুমারটুলি; অলা, দেদো, কটা, তেওতা হিন্দু হোষ্টেল, ঢাকা, পাল পাড়া গোবিন্দ জীউ এম, ই স্কুলের ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের ছাত্র বৃন্দ, উলুবেড়িয়া; শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন, তিওতা, ঢাকা; কুমারী মায়ালতা ঘোষ, কলিকাতা; মিহির, মণীন্দ্র, অমূল্য, নীহার, নিশীথ, দ্বিজেশ, নিখিল, প্রভাত, কিরণ সুনীল, বিকাশ, অরুণ, কমলা, শচী, উমা, অপরাজিতা, শিবি, অমু, মণিমালা, মুক্তি, বিশ্বনাথ, ও শিশির, পাটনা; কুমারী, ভগবতী, দত্ত, ধুবড়ী; অক্ষয়, মহে, নেপু, সুরে, টুকুন, সুরেন, তেওতা; সোরাজুদ্দিন মিঞা, খাইদাবহর; নীলকণ্ঠ পাল, টাঙ্গাইল; সন্ধ্যা ও সীতা গুপ্ত, কালিঘাট; লালবিহারী, মোহনলাল, প্রতুলময়ী, দেবব্রত পূর্ণচন্দ্র, শিবপুর। রামকৃষ্ণ, নীলাদ্রি, মনোমোহন, কলিকাতা। হরিপ্রসাদ রায়, নৈহাটি। চুনিলাল, রায় ক্যামেলি। অনিল অমিয়, সুশীল, অমরেন্দ্র, কুমার সিংহ, কলিকাতা। ডি, কে বসাক এজেন্সী। শ্রীঅজিতকুমার মিত্র ও শিশিরকুমার মিত্র।

একটি ধাঁধাঁর উত্তর নির্ভুল হইয়াছে :—

কুমারী তরুলতা দে, শিবানী, রেখাময়ী দে ও শান্তি মিত্র, শ্রীপ্রাণনাথ দে, কলিকাতা ; গৌর, নিতাই, রাম্বু, চীলু, গোপাল, দীনেশ, মধুসূদন, ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র, চন্দননগর ; শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জিলা স্কুল বোর্ডিং হাউস, ফরিদপুর ; বিভূতিভূষণ বসু, মেদিনীপুর ; শ্রীরাখালদাস নিয়োগী, শ্রীশান্তিলতা নিয়োগী, শ্রীসুশীলাবালা রায়, সাকরাইল ; যতীন্দ্রনাথ বসু, নৈহাটী ; শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্য, রুড়কী ; শ্রীগোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, রূপপুর ; শ্রীমান দীপ্তিময় ধর ও আহু, হাবুল, টুস্‌কিত বাচ্চা ; সদন ; ঝাক্সৌ ; সুনীল গুপ্ত ও ইন্দুরাণী, কেওত্তা ; সুবর্ণলতা ও কনকলতা দেবী লাহোর ; গোপেশ্বর ভট্টাচার্য্য, লাহোর ; সুবোধ, সুধীর, সুমতী, নয়নতারা জালিয়া হাটি ; অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর, উষাপতি ঘটক, কালিঘাট ; অশোক, গীতা, তরুণ, তপন, মুকুন্দ, উর্ম্মিলা, অন্নপূর্ণা, অশোক, আলোক কালিঘাট, গোলাপ, কালাচাঁদ, অমলা, পূর্ণচন্দ্র, শান্তিলতা, শ্রীমান ফকিরচন্দ্র, কমলা, কলিকাতা।

দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ একসঙ্গে বাহির হইল।
আষাঢ় মাসের "মুকুল" [illegible]লা আষাঢ়
বাহির হইবে।

চৈত্রমাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। ব্রজাঙ্গনা—৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। (কাব্য)
২। বলাকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (কাব্য)
৩। বিষবৃক্ষ—৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (উপন্যাস)
৪। শ্রীকান্ত—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (উপন্যাস)

১।	৩	মহিষ	৫ × ৩ —	১৫৲
	১৬	কবুতর	।০ × ১৬ —	৪৲
	৯৮১	ছাগল		৯৮১
	১০০০			১০০০৲
২।	৬	মহিষ	৬ × ৫ =	৩০৲
	৩২	কবুতর	।০ × ৩২ —	৮৲
	৯৬২	ছাগল		৯৬২৲
	১০০০			১০০০৲

এইরূপ ভাবে কসিলে ৫২টি উত্তর পাওয়া যায়।